দ্য নিউ পার্ল হারবার

ডেভিড রে গ্রিফিন

অনুবাদ : ইফতেখার আমিন

BanglaBook.org

ডেভিড রে গ্রিফিন ৩০টি বই ও ১৬০ টি রচনা লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন। ১৭ বছর সানি (SUNY) সিরিজের সম্পাদনাও করেছেন তিনি। যার কন্সট্রাকটিভ পোস্ট মডার্ন থট-এর ৩১টি ভলিউম প্রকাশিত হয়েছে।

৯/১১ প্রসঙ্গে দুটো বই লিখেছেন গ্রিফিন। 'দ্য নিউ পার্ল হারবার : ডিস্টার্বিং কোয়েশ্চেনস অ্যাবউট দ্য বুশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ৯/১১' (২০০৪), এবং 'দ্য ৯/১১ কমিশন রিপোর্ট–অমিশনস অ্যান্ড ডিসটরশনস' (২০০৫)।

জন বি. কব জুনিয়র, রিচার্ড ফক, জোসেফ সি হগ, মাইকলে মিচার, রোজমেরি রুদার, জন ম্যাকমার্ট্রি, মারকাস রাসকিন, পিটার ডেল স্কট, গেরি স্পেন্স ও হাওয়ার্ড জিন প্রমুখ সত্যায়িত করেছেন তাঁর এই দুটি বই। ডেভিড রে গ্রিফিন বর্তমানে ক্লেয়ারমন্ট স্কুল অব থিওলজির প্রফেসর, এমেরিটাস এবং সেখানকার সেন্টার ফর প্রসেস স্টাডিজের কো-ডিরেক্টর।

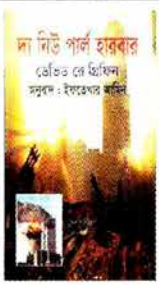

www.BanglaBook.org

The New Pearl Harbour
by David Ray Griffin
Translated by Iftekhar Amin
Cover design by Moshiur Rahman
Published by Alamgir Sikder Loton of **Akash**
ISBN : 978-984-8860-02-1
e-mail : akashpublications@yahoo.com

আকাশ
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৯৫৬০০, ০১৭১৪২৬৯৭০

ISBN : 978-984-8860-02-1

দ্য নিউ পার্ল হারবার

ডেভিড রে গ্রিফিন

অনুবাদ
ইফতেখার আমিন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আকাশ

প্রকাশকাল
প্রথম বাংলা প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০১০
অলিভ ব্র্যানচ প্রেস,
অ্যান ইমপ্রিন্ট অভ ইন্টারলিংক পাবলিশিং গ্রুপ, আইএনসি, ২০০৪
প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক
ডা. সাদত আলী সিকদার
প্রকাশক
আলমগীর সিকদার লোটন
গ্রন্থস্বত্ব
ইফতেখার আমিন
কৃতজ্ঞতায়
মেহের তানিশা
প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

আকাশ

সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্-এর
একটি সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৬৫৬০০, ০১৭১১৫২৬৯৭০
অক্ষর বিন্যাস কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্
৩/৬ জনসন রোড, ঢাকা-১১০০
মূল্য ২০০ টাকা

the good neighbor

প্রতি কপি বই বিক্রির টাকা থেকে আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল ৫ (পাঁচ) টাকা করে অনুদান পাবে।

The Ahsania Misson Cancer Hospital will get a donation of Tk. 5 (Five) from the sale proceeds of each copy of this book.

THE NEW PEARL HARBOR
First Translation in Bengali by Iftekhar Amin
Published by Alamgir Sikder Loton
of **Akash** 2010, 38 Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh
Phone : (880-2) 7165600, 01711526970
e-mail : akashpublications@yahoo.com
First Published by David Ray Griffin by Olive Branch Press,
An imprint of interlink publishing Group, Inc., 2004
USA Distributor Muktodhara, Jackson Hights, New York
UK Distributor Sangeeta Ltd. 22 Bricklane, London
Price Taka **200** .US$ **20** only
ISBN 1-56656-552-9 (pbk.)
ISBN 978-984-8864-02-1

উৎসর্গ

বড় ভাবী (লুৎফা)-কে,
ছেলেবেলায় যার বিরাট খোপার
দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম,
যার বিরল কিন্তু প্রাণখোলা হাসি
আজও কানে বাজে;
ও
টিপা ভাবীকে,
যার অসাধারণ রান্নার স্বাদ
এবং উচ্চারণ নকল করে
কানমলা খাওয়ার স্বাদ
এখন কেবলই স্মৃতি—

এই দুই চিরনিদ্রাবাসিনীকে;

— রেসালাত

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড ৯/১১-এর ঘটনাবলী

ফ্লাইট ১১ ও ১৭৫ : হাইজ্যাকারদের মিশন সফল হলো কিভাবে?
ফ্লাইট ৭৭ : পেন্টাগনে আঘাত হানা 'জিনিসটা' প্লেন ছিল?
ফ্লাইট ৯৩ : গুলি করে ফেলে দেয়া হয়েছে?
প্রেসিডেন্ট বুশ : কেন এই আচরণ?

দ্বিতীয় খণ্ড ৯/১১-এর বৃহত্তর প্রসঙ্গ

বুশ প্রশাসন আগে থেকে জানত?
৯/১১-এর আগে তদন্তে বাধা দেয়া হয়েছে?
৯/১১ ঘটতে দেয়ার কারণ ছিল?
৯/১১-এর বন্দিদের জেরায় বাধা দেয়া হয়েছে?

তৃতীয় খণ্ড উপসংহার

লাভ কার হলো?
৯/১১ সফল হলো কিভাবে?
একটা পূর্ণ তদন্ত প্রয়োজন
৯/১১ সত্যবাদী প্রার্থী

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

ডেভিড রে গ্রিফিনকে ধন্যবাদ

এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল। অহেতুক তর্ক করে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, এমন সব অসাধারণ যুক্তি ও প্রশ্নে ভরা এবং ব্যাপক কৌতূহল জাগানো বই বলে এটি প্রত্যেকের পড়া উচিত। ডেভিড রে গ্রিফিন *দ্য নিউ পার্ল হারবার*-এ ৯/১১ প্রসঙ্গে অজস্র অস্বস্তিকর প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং সেসবের জবাব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। সরকারের তরফ থেকে তার প্রতিটার সত্য জবাব প্রকাশ করা উচিত।

— মারকাস রাসকিন
কো-ফাউন্ডার, ইনস্টিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজ

নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বিল্ডিং এবং পেন্টাগনে ৯/১১-এর হামলার পিছনের নানান রহস্যময় সংযোগ আছে। সেসবের পর্যালোচনা করতে গিয়ে ডেভিড রে গ্রিফিন যে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন এই বইতে, তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। এসব গবেষণা ও পর্যালোচনা সেই ঐতিহাসিক ও অস্বস্তিকর ঘটনার সঙ্গে বুশ প্রশাসনের সরাসরি জড়িত থাকার বিষয়টিকে নতুন করে খতিয়ে দেখারও দাবি রাখে।

— হাওয়ার্ড জিন
এ পিপলস হিস্টরি অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস-এর লেখক

ডেভিড রে গ্রিফিন এই বইতে যা লিখেছেন, গণতান্ত্রিক দেশ আমেরিকার এখন বোধহয় সেটারই প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। ৯/১১-এর হামলা সম্পর্কে বুশ প্রশাসনের অফিশিয়াল ব্যাখ্যায় যে সমস্ত ফাঁক-ফোকর আছে, সেসবের বিপক্ষে সম্পূর্ণ আবেগ বিবর্জিত অথচ ভারসাম্য রক্ষাকারী এবং গবেষণা ও তথ্যনির্ভর একটি অত্যন্ত মূল্যবান বই এটি। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সেই বিভীষিকাময় সকাল থেকে বুশ প্রশাসনের অনবরত প্রচার করতে থাকা নানান 'ষড়যন্ত্র থিয়োরির' দিকে আমেরিকানদের নজর স্থির ছিল বলে ইতিহাসের গতিধারা বদলে দেয়া সেই সন্ত্রাসী হামলার ভেতরে যে আরও কিছু ছিল বা থাকতে পারে, সেই বাস্তবতা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তারা। গ্রিফিন সেই ঘটনার পক্ষের ও বিপক্ষের সমস্ত তথ্য-প্রমাণ

BanglaBook.org

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরে পাঠকদের যেখানে নিয়ে যাওয়ার কথা, ঠিক সেখানেই নিয়ে গেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না *দ্য নিউ পার্ল হারবার* একটি অত্যন্ত সাহসী ও নিখুঁত কাজ। এবং ডেভিড রে গ্রিফিনই প্রথম এই দুঃসাহসটি দেখিয়ে আমাদের সামনে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন।

—জন ম্যাকমার্ট্রি
ভ্যালিউ ওয়ারস: দ্য গ্লোবাল মার্কেট ভার্সাস দ্য লাইফ ইকনমি-এর লেখক; দ্য রয়াল সোসাইটি অব কানাডার ফেলো এবং ইউনিভার্সিটি অব গুয়েলফ-এর ফিলসফির প্রফেসর

সুচিন্তিত এবং গবেষণা করে অনেক যত্নে লেখা এই *দ্য নিউ পার্ল হারবার* বইটির পৃষ্ঠা ওল্টানো হবে বড় বেদনাদায়ক ও অস্বস্তিকর। কিন্তু আমাদের অবশ্যই উল্টে যেতে হবে। কারণ সেই ঘটনায় যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের সম্পর্কে সত্য কথাটা জানতে হবে আমাদেরকে।

—কলিন কেলি
বিল কেলি জুনিয়রের বোন; ৯/১১-এর হামলায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর টাওয়ারে নিহত হন বিল কেলি জুনিয়র, কো ফাউন্ডার, সেপ্টেম্বর ইলেভেনথ ফ্যামিলিজ ফর পিসফুল টুমরোজ

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল। গ্রিফিনের সতর্ক গবেষণা ও বিস্তারিত তথ্যে ভরা এই পর্যবেক্ষণ পড়ে মনে হয়, বুশ প্রশাসন সম্ভবত আগে থেকে ছক সাজিয়ে রাখা তাদের যুদ্ধ পরিকল্পনা সফল করার স্বার্থে ৯/১১-এর দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে জেনেও বাধা দেয়নি। প্রশাসনের আমেরিকান ফরেন পলিসির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য *দ্য নিউ পার্ল হারবার* বইটি অবশ্য পাঠ্য।

—রোজমেরি রাডফোর্ড রুদার
বার্কলি, ক্যালিফোর্নিয়ার গ্রাজুয়েট থিওলজিক্যাল ইউনিয়নের অধীন ফেমিনিস্ট থিওলজির কার্পেন্টার প্রফেসর

আমেরিকায় ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার এই ঘটনাকে ঘিরে যে সীমাহীন নীরবতার ষড়যন্ত্র আর পাহাড় সমান বিভ্রান্তি আছে, সেসবকে যারা পাশ কাটাতে আগ্রহী, তাদের সবাইকে এ বই অবশ্যই পড়তে হবে।

—জন বি, কব জুনিয়র
ক্লেয়ারমন্ট স্কুল অব থিওলজি ও ক্লেয়ারমন্ট গ্রাজুয়েট ইউনিভার্সিটির থিওলজির প্রফেসর, এমেরিটাস

BanglaBook.org

৯/১১ যে আমাদের প্রিয় দেশ ও জাতির ইতিহাসে একটি সীমানা নির্দেশকারী দিনে পরিণত হয়েছে, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু এই দিনটির সত্যিকারের গুরুত্ব লুকিয়ে আছে কিছু জটিল প্রশ্নের এবং তারচেয়েও জটিল জবাবের মধ্যে। যদিও পরের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে বিষয়টা মনে হয় এতদিনে সবার চোখে খুব স্পষ্ট হয়েই ধরা পড়ে গেছে। ডেভিড রে গ্রিফিন সেসবের যে জটিল বিশ্লেষণ তাঁর *দ্য নিউ পার্ল হারবার*-এ দাঁড় করিয়েছেন, তাতে মনে হয় এবং বিশ্বাসও হয় যে, এ ক্ষেত্রে আমেরিকার উঁচু পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই 'দুষ্কর্মে' জড়িত ছিলেন এবং তাঁরা আমেরিকাকে চরম অনিশ্চিত এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দিয়ে চরম দেশবিরোধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন। কাজেই আমি মনে করি গ্রিফিনের এই গবেষণামূলক বইটিতে ৯/১১ কে কেন্দ্র করে যে সমস্ত অখণ্ডনীয় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তার পূর্ণ এবং স্বাধীন তদন্ত অবশ্যই হওয়া উচিত।

— ডগলাস স্ট্রাম
প্রেসিডেনশিয়াল প্রফেসর অব রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স, এমেরিটাস, বাকনেল ইউনিভার্সিটি

ডেভিড রে গ্রিফিন *দ্য নিউ পার্ল হারবার*-এ যে সমস্ত কঠিন কঠিন প্রশ্ন তুলেছেন, সেগুলো অস্বস্তিকর হলেও অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যদি রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের ওপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার কোনো গুরুত্ব আদতেই থাকে, তাহলে সচেতন নাগরিকদের সবারই এসব প্রশ্নের পূর্ণ ও স্বচ্ছ জবাব জানা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

— মাইকেল মিচার
ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য এবং সাবেক পরিবেশ মন্ত্রী

বসন্তকালে মাঠ যেমন ডেইজি ফুলে ভরে থাকে, এই বইটিও তেমনি গবেষণা ও ঐতিহাসিক বিবরণে ভরা। *দ্য নিউ পার্ল হারবার* বইটির লেখক অনেকগুলো ভীতিকর প্রশ্ন তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে, এবং সেগুলো নিশ্চয়ই জবাব কামনা করে। তবে একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে উপসংহার টানতে পারি, তা হলো ৯/১১ কে ঘিরে এবং তার আগের ও পরের ঘটনাপ্রবাহকে আমাদেরকে আর সব গতানুগতিক জ্ঞানের কার্পেটের নিচে গুজে রাখলে চলবে না। *দ্য নিউ পার্ল হারবার* আমাদেরকে এমন সব সত্য অনুসন্ধানের ভিত্তি দেখিয়ে দিয়েছে, যে সত্য আমরা হয়ত শুনতে আগ্রহী নই।

BanglaBook.org

— গেরি স্পেনস
ট্রায়াল লইয়ার এবং হাউ টু আরগিউ অ্যান্ড উইন এভরি টাইম বইয়ের লেখক

আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপারে বুশ প্রশাসনের হাজির করা 'সত্য বর্ণনার' প্রতি যাদের সন্দেহ আছে, ডেভিড গ্রিফিনের *দ্য নিউ পার্ল হারবার* বইটি তাদের বইয়ের শেলফে থাকা উচিত। এ বইয়ে যে সমস্ত সত্য উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো অস্বস্তিকর। হওয়ারই কথা। প্রেসিডেন্ট বুশ ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপারে কী জানতেন? তিনি কখন ঘটনার কথা জেনেছেন? ইত্যাদি প্রশ্নে জবাব খুঁজতে গ্রিফিনের এই বই আমেরিকার রাজনীতির অনেক ভেতরে উঁকি দিয়েছে।

— ওয়েইন ম্যাডসেন
লেখক, সাংবাদিক, সিন্ডিকেটেড কলামিস্ট

যাঁরা গণতন্ত্রকে মূল্য দেন এবং দেশে কোনো না কোনো ধরনের গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে জনসাধারণের আস্থা ধরে রাখার ওপর গুরুত্ব দেন, গ্রিফিনের *দ্য নিউ পার্ল হারবার* সেইসব আমেরিকানের পড়া উচিত।

— জোসেফ সি. হগ
প্রেসিডেন্ট, ইউনিয়ন থিওলজিক্যাল সেমিনারি, নিউ ইয়র্ক

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বই লেখার ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রচুর সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি। সবচেয়ে বড় সহযোগিতা এসেছে সেইসব লেখকের তরফ থেকে, যাদের শরণ নিতে হয়েছে আমাকে। ব্রিটিশ গবেষক নাফিজ মোসাদ্দেক আহমেদের *দ্য ওয়ার অন ফ্রিডম: হাউ অ্যান্ড হোয়াই আমেরিকা ওয়াজ অ্যাটাকড় সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১* এবং পল থম্পসনের ওয়েব সাইট ভিত্তিক *সেপ্টেম্বর ১১, মিনিট-বাই-মিনিট* ও *টাইমলাইন* পড়া না হলে এটার কাজে যেমন হাত দেয়া হতো না, তেমনি থিয়েরি মেইসানের *৯/১১: দ্য বিগ লাই* ও *পেন্টাগেট,* আর মাইকেল চসুদোভস্কির *ওয়ার অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন: দ্য ট্রুথ বাহাইন্ড সেপ্টেম্বর ১১* এবং সেন্টার ফর কো-অপারেটিভ রিসার্চের *ওয়াজ ৯/১১ অ্যালউড টু হ্যাপেন? দ্য কমপ্লিট টাইমলাইন*-এর সহায়তা ছাড়া এ কাজ শেষ করাও সম্ভব হতো না।

এছাড়া সেইসব সাংবাদিক, গবেষক যাঁরা খবরের কাগজে ও ম্যাগাজিনে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেছেন, টেলিভিশন শো করেছেন অথবা ওয়েব সাইটে এমনকি নাফিজ আহমেদ ও পল থম্পসনের আগে থেকেই কাজ করে আসছিলেন, তাঁরাও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন আমাকে। এই সাংবাদিক-গবেষকদের অনেকের কাছেই পরোক্ষভাবে কৃতজ্ঞ আমি, বাকি সবার কাছে প্রত্যক্ষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার নোটে তাঁদের অনেকের সাহায্য-সহযোগিতা সম্পর্কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি। এ বইয়ের মাধ্যমে ৯/১১-এর আসল সত্য উদ্ধারের পদক্ষেপ এবং মিথ্যার পাশ কাটিয়ে সত্যকে আলোয় নিয়ে আসতে পারাটা আমার একার কাজ নয়। এটা আসলে একটা সম্মিলিত প্রয়াসের ফল। একজনের উদ্যোগ ও বলতে গেলে বেশিরভাগই বিনা পারিশ্রমিকে নিয়োজিত, আত্মনিবেদিত শত শত তথ্য-অনুসন্ধানীর পরিশ্রমের ফসল।

এই মহৎ কাজে হাত দিয়ে আরও অনেকের সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছি আমি। তাঁরা হলেন তাল আভিতজার, জন কব, মাইকেল ডিয়েট্রিক, অলিল এলভার, রিচার্ড ফক, অ্যালিসন জাকোয়া, জিয়ানলুইগি গাগলিয়ারমেট্টো, কেলিন কেলি, জন ম্যাকমার্ট্রি, প্যাট প্যাটারসন, রোজমেরি রুদার, পামেলা থম্পসন ও সারাহ রাইট। যাঁরা কষ্ট করে লিখিতভাবে আমার কাজের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন, তাঁদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই।

BanglaBook.org

বইটির ফোরওয়ার্ড বা আগের কথা লেখার ব্যাপারে সদয় আগ্রহ দেখানোর জন্য আমি রিচার্ড ফকের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ রইলাম। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তাঁর অনুপ্রেরণাতেই আমি বিশ্বের রাজনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ে প্রথম কাজে হাত দিয়েছিলাম। এই বই লেখার কাজে তিনিই আমার প্রধান ডিসকাশন পার্টনার বা আলোচনার অংশীদার ছিলেন। এবং তাঁর মাধ্যমেই আমি ইন্টারলিংক পাবলিশিং-এর অলিভ ব্রাঞ্চ প্রেসের সাথে জড়িত হই।

এ জন্য আমি তাঁর প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। অলিভ ব্রাঞ্চে আমি যে দু'জনের সাথে কাজ করেছি, তাঁরা হলেন পামেলা থম্পসন ও মিচেল মোশাবেক। এই দু'জন আমার সদা হাস্যময় সহযোগিই কেবল ছিলেন না; এ বই প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁরা যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা যে কোনো লেখকের কাছে স্বপ্নের মত মনে হবে।

এরপর নিজের কর্মস্থল, ক্লেয়ারমন্ট স্কুল অব থিওলজির কাছেও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। বিশেষ করে স্কুলের প্রেসিডেন্ট, ফিলিপ অ্যামারসন এবং ডিন, জ্যাক ফিৎজমিয়ারের কাছে।

সবশেষে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লাগাতার সহযোগিতা দিয়ে যাওয়ার জন্য আমার স্ত্রী, আনা জাকোয়ার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আগের কথা

ডেভিড রে গ্রিফিন অসাধারণ একটা বই লিখেছেন। মাত্র ৩০ ভাগ খোলা মন নিয়েও যদি বইটি পড়া হয়, তাহলে ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার সরকারী মহলের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্র্যাসি বা সাংবিধানিক গণতন্ত্র যেভাবে কাজ করে বলে এতদিন সবাই জেনে এসেছেন, সে ধারণা বদলে যাবে। এদিক থেকে *দ্য নিউ পার্ল হারবার* একটি অস্বস্তিকর বইও বটে। বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে ক্ষমতাধর সার্বভৌম রাষ্ট্রটির বিদ্যমান রাজনৈতিক বৈধতার গভীর সঙ্কট সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ বইটিতে।

দ্য নিউ পার্ল হারবার যদি মানুষের ও মিডিয়ার দৃষ্টি তেমনভাবে আকর্ষণ করতে পারে, তাহলে দেশবাসীর বিতর্কের গতি দিক বদল করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রশ্নে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ বইটির বিশেষত্ব হলো, অত্যন্ত বেদনাদায়ক ৯/১১-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শেষে এটি লেখা হয়েছে। ঘটনার কারণ এবং প্রমাণ-এর পথ অনুসরণ করে এমন এক গন্তব্যে পৌঁছেছে এ বই, যেখানে আমাদের নেতৃত্বের চারিত্রিক সততা নিয়ে বিশ্ববাসীর মনে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। বিশেষ করে সরকারের সবচেয়ে উঁচু মহলের ব্যাপারে। যাঁরা আমাদের দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, যাঁরা এর গন্তব্য আর জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ করেন—তাঁদের চারিত্রিক সততা, নিষ্ঠা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। যাঁদের কারণে আজ বহির্বিশ্বে আমাদের সৈন্যদের যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজেদেরকে বলি দিতে হচ্ছে, আর দেশের ভেতরে আমাদের স্বাধীনতা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে বসেছে।

৯/১১ কেন এবং কীভাবে ঘটেছিল, অকল্পনীয়ভাবে জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ার পরও কেন জরুরি ভিত্তিতে সে ঘটনার তাৎক্ষণিক পূর্ণ তদন্ত হয়নি, গ্রিফিন এ বইয়ে সেসব বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে বুশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেয়া অফিশিয়াল বক্তব্যে যে সমস্ত ফাঁক আছে, আপাতদৃষ্টিতে সেসবের কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে না। তাই এ বই লিখতে গিয়ে প্রতি পদে অনেক বিভ্রান্ত হতে হয়েছে আমাদেরকে। মনে হয়েছে, সেই দুঃখজনক ঘটনার পিছনের আসল সত্য নিয়ে কারও যেন মাথাব্যথা নেই।

গ্রিফিন তাঁর *দ্য নিউ পার্ল হারবার*-এর সাহায্যে বুশ প্রশাসনের অনেক কুকীর্তির

BanglaBook.org

কথাই প্রকাশ করে দিয়েছেন। টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে চালু আছে এমন অনেক অজানা, অব্যাখ্যাত সত্য ছাড়াও ৯/১১-এর স্বাধীন তদন্তপ্রভাবিত করতে ক্ষমতাসীনদের নানামুখী প্রয়াস এবং ৯/১১-এর আগে বুশ প্রশাসনের ভেতরের লোকদের তৈরি করা ব্লু প্রিন্টের প্রমাণ হাজির করেছেন। হামলার পর প্রশাসনের প্রায় প্রত্যেকে সেই ব্লু প্রিন্ট অনুযায়ীই কাজ করে গেছেন চাবি দেয়া পুতুলের মত।

তাই এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়, লেখকের উত্থাপন করা তথ্য-প্রমাণ বিশ্বাস করতে একশ ভাগ খোলা মনের পাঠকের প্রয়োজন পড়বে না। ৩০ ভাগ খোলা মনের পাঠকই যথেষ্ট। বুশ প্রশাসনের একমাত্র অন্ধ সমর্থক ছাড়া গ্রিফিনের যুক্তি-তর্ক কারও পক্ষে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে পাঠকদের মনে রাখতে হবে, ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত প্রমাণ খুঁজে খুঁজে বের করেছেন গ্রিফিন, সেসবের ব্যাপারে আমেরিকান সরকারের সরবরাহ করা জবাবের মধ্যে অনেক বড় বড় ফাঁক আছে।

তাঁর উদ্ধার করা প্রমাণগুলো যদি সত্যি হয়, তাহলে অবাক মনে প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক—কেন শতাব্দির ভয়াবহতম এই সন্ত্রাসী ঘটনা সম্পর্কে জাতিকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে? কেন ভেতরের সমস্ত ঘটনা খোলাখুলি জানানো হয়নি? কেন আমাদের মিডিয়া ঘুমিয়ে ছিল? আমেরিকার জনগণের নিরাপত্তার বিষয়টাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার পরিবর্তে কংগ্রেস কেন সরকারের ওয়াচডগের দায়িত্ব পালন করতে এত উদগ্রীব ছিল? ঘটনার সাথে বুশ প্রশাসনের জড়িত থাকার গোপন তথ্য ফাঁস হওয়ার পরও যাঁরা সরকারের উঁচু পদে আছেন, তাঁদের মধ্যে নীতিগত কারণে একটা পদত্যাগের ঘটনাও ঘটল না কেন? বিষয়টা নিয়ে এখানে-সেখানে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। হামলার দিন থেকেই এর সঙ্গে প্রশাসনের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে, বিশেষ করে ইওরোপে।

আমার জানামতে গ্রিফিন ছাড়া আর কোনো আমেরিকান এ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস দেখাননি। তাঁর মত অসাধারণ ধৈর্য, তিতিক্ষা ও মেধা নিয়ে বিষয়টার ভেতরে ডুব দেয়ার চেষ্টাও করেননি কেউ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এত সমস্ত টুকরো টুকরো তথ্য উদ্ধার করে একত্রিত করেননি। আর কেউ যদি তা করেও থাকেন, সেগুলো ছিল খাপছাড়া এবং দায়িত্বহীন।

তাই প্রশাসনের তরফ থেকে সহজেই 'প্যারানয়েড' বা 'আউটরেজাস' বলে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে সেগুলোকে। তাদের ঘটনা তদন্তের দাবির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অন্যদিকে গ্রিফিনের কাজ ছিল ধীর-স্থির। তাঁর উত্থাপিত প্রশ্ন ছিল সুচিন্তিত। তাঁর গবেষণার ফল নিয়ে কারও মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়নি।

কিন্তু আমরা কাজ করতে গিয়ে অনেকভাবে সমস্যায় পড়েছি। ৯/১১ প্রশ্নে সত্য জানতে গিয়ে প্রতিকূল শক্তির মুখোমুখি হয়েছি। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আমেরিকান মিডিয়ার মূল স্রোত হ্যান্ড-ইন-গ্লাভ বা চোরের সাক্ষী গাঁটকাটার মত একজোট হয়ে সরকারের সহযোগি হিসেবে কাজ করে গেছে। প্রতিনিয়ত সরকারকে দেশপ্রেমিক প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। দেশের নেতৃত্বে যাঁরা রয়েছে, তাদের ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহ বা অবিশ্বস্ততার আভাস পর্যন্ত ওঠেনি মিডিয়ার পক্ষ থেকে।

মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বিল মাহের এ নিয়ে সাধারণ প্রশ্ন তুললে সরকারের তরফ থেকে

BanglaBook.org

ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল গোলাপি স্লিপে। পরোক্ষ হুমকি দেয়া হয় এ নিয়ে কেউ ভিন্নমত পোষণ করলে পরিণাম শুভ হবে না। মিট দ্য প্রেস বা প্রাসঙ্গিক কোনো অনুষ্ঠানে কঠিন প্রশ্ন করা হলে জবাব দেয়ার বদলে কাগজের তৈরি ছোটো ছোটো আমেরিকান পতাকা দোলানো রীতি হয়ে ওঠে। কোথাও পরিস্থিতি জটিল দেখলে স্লোগান উচ্চারিত হতে থাকে—'ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড!'

বিনা প্রশ্নে সবকিছু মেনে নেয়াই দেশপ্রেম; বুশ প্রশাসনের এই নীতি নিয়ে প্রেসিডেন্টের যে সমস্ত উপদেষ্টা খেলা করেছেন, তাঁরা ৯/১১-এর ঘটনাকে কখনোই জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে দেখেননি। দেখেছেন ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফেল্ডের ভাষায়, 'এ ব্লেসিং ইন ডিজগাইস' বা 'ছদ্মবেশ নিয়ে আসা আশীর্বাদ' হিসেবে। ৯/১১-এর দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে এক টিভি সাক্ষাৎকারে বিষয়টাকে এভাবেই বর্ণনা করেছিলেন ডোনাল্ড রামসফেল্ড।

এক সময় যখন দেশবাসীর চোখে পরিয়ে রাখা 'দেশপ্রেমের' পট্টি খুলে যেতে শুরু করে, তখন বাস্তবতা থেকে তাদের নজর অন্যদিকে সরিয়ে রাখতে আরেক দেশে গিয়ে অমানবিক, নিষ্ঠুর ধ্বংসযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেয়া হয় সেনাবাহিনীকে। তাদের ইরাকে আগ্রাসন চালানোর অস্বস্তিকর বাস্তবতা বেশিরভাগ আমেরিকানই মেনে নিতে পারেনি। ইরাকিদের শিয়াল-কুকুরের মত হত্যা করার বিষয়টাও মেনে নিতে পারেনি। অথচ সাদ্দাম হোসেনই ৯/১১-এর হামলার জন্য দায়ি ঘোষণা করে তরুণ আমেরিকানদের দলে দলে মৃত্যু আর পঙ্গুত্বের মুখে ঠেলে দিয়েছে তাদেরই দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা, এ কথা ভাবতে কষ্ট হয় আমাদের।

এই অস্বস্তিকর ঘটনার ভয়ঙ্করত্ব বহুগুণ বেড়ে যায় যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ৯/১১-এর আসল সত্যের পুরো বিষয়টাকেই মিথ্যার কম্বল দিয়ে যত্নের সাথে মুড়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। আসল ঘটনা বিশ্বের সামনে চেপে রাখার মরিয়া প্রচেষ্টা ছিল বুশ প্রশাসনের বীভৎস সত্যের মুখোমুখি হওয়াকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা ব্যর্থ কসরত। তাদের সম্মিলিত অসত্য ভাষণ আর অস্বীকৃতির কারণে জাতির বিবেক এতদিন ঘুমিয়ে ছিল। ডেভিড রে গ্রিফিনের এই বইটি তার অনেক প্রার্থীত অ্যান্টিডোট বা প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে।

৯/১১-এর ব্যাপারে অনেক প্রশ্নসহ আপনার মনে উদয় হওয়া আরও অনেক প্রশ্নের জবাব দেবে *দ্য নিউ পার্ল হারবার*। দেরিতে হলেও এ নিয়ে একটা জোরাল বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারবে। 'বেটার দ্যান নেভার' বলে একটা কথা আছে—একেবারে কখনো না ওঠার তুলনায় এ বিতর্ক দেরিতে উঠলেও মন্দ হয়নি বলেই আমার ধারণা। অনেক বছর আগে আমেরিকার আরেক প্রেসিডেন্ট, টমাস জেফারসন সতর্ক করেছিলেন এই বলে: 'প্রাইস অব লিবার্টি ইজ ইটারনাল ভিজিলেন্স।' স্বাধীনতার মূল্য হচ্ছে অবিরাম সতর্কতা।

এ ক্ষেত্রে আমেরিকা এতদিন যে রাজনৈতিকভাবে ধোয়া তুলসি পাতার আচরণ করে এসেছে। আমাদের সরকারের যে প্রশ্নাতীত ভাবমূর্তি ছিল, *দ্য নিউ পার্ল হারবার*-এর কারণে সেসবের আর কোনো গ্রহণযোগ্যতাই থাকল না। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস,

BanglaBook.org

নিজের উদ্দেশ্য পূরণে 'সুযোগ সৃষ্টি করে' তা কাজে লাগানোর দীর্ঘ ইতিহাস আছে আমেরিকার। বিশেষ করে যুদ্ধ আর শান্তির ক্ষেত্রে। ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস, নিচে উল্লেখ করা সুযোগগুলোকেও নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করেছিল আমেরিকা :

১. ১৮৯৮ সালে *ইউএসএস মেইন*-এর বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে স্পেনের সাথে আমেরিকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া,

২. পার্ল হারবারে জাপানি হামলার প্রেক্ষিতকে কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে জড়িয়ে পড়া। যদিও আরও আগেই আমেরিকা পরোক্ষ যুদ্ধে জড়িয়েছিল যা সচেতন আমেরিকানদের পছন্দ ছিল না,

৩. ১৯৬৪ সালে গালফ অব টনকিন ঘটনাকে কেন্দ্র করে হোয়াইট হাউজের ভিয়েতনাম যুদ্ধের মেয়াদ নাটকীয়ভাবে বাড়ানো এবং

৪. সাদ্দাম হোসেনের হাতে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে দাবি করে আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘকে উপেক্ষা করে ইরাকে হামলা চালানো।

জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমা ফেলা ও প্রেসিডেন্ট কেনেডির নিহত হওয়া নিয়ে যে সমস্ত অফিশিয়াল ব্যাখ্যা অতীতে দেয়া হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে মানুষ আজও পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে পারেনি। এদিক থেকে দেখতে গেলে আমেরিকার সরকার ও জনসাধারণের মধ্যকার বিশ্বাসভঙ্গের ইতিহাসও অনেক পুরনো। অবিশ্বাসের শেকড় অনেক গভীরে বাসা বেঁধে আছে।

বুশ প্রশাসন সেই তালিকায় আরও একটা যোগ করল। এ ঘটনা সবার জন্য এমন এক মৌলিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, সারাক্ষণ যার মোকাবেলা করতে হবে আমাদেরকে। কেন ৯/১১-এর ঘটনা সম্পর্কে দেয়া অফিশিয়াল ব্যাখ্যাকে সবাই পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নিল? বিশেষ করে যখন প্রমাণ হয়েছে যে গোটা বিশ্বের ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেয়ার মত সবচেয়ে বিপজ্জনক কিছু দায়-দায়িত্ব আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে অপ্রত্যাশিত ৯/১১?

ডেভিড রে গ্রিফিন *দ্য নিউ পার্ল হারবার*-এ দেখিয়ে দিয়েছেন বুশ প্রশাসনের এ সম্পর্কিত বয়ান যে একেবারেই ফালতু, মিথ্যা, তা প্রমাণ করতে সন্দেহজনক প্রতিটা খুঁটিনাটি নিয়ে প্রশ্ন তোলারও কোনো প্রয়োজন পড়ে না। ৯/১১-এর আক্রমণকে কেন্দ্র করে সেদিন যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে বলে সরকারিভাবে দাবি করা হয়েছে, তার মধ্যে থেকে বাছাই করা কিছু বিষয়ের ওপর কাজ করেছেন গ্রিফিন। কাজ করেছেন কিছু স্পর্শকাতর বিষয় নিয়েও।

যেমন ৯/১১-এর পরিপ্রেক্ষিত, টুইন টাওয়ারে হামলাকে কেন্দ্র করে সরকার ও মিডিয়ার প্রচারণা এবং আসলে যা ঘটেছে, তার ওপর পাওয়া স্বাধীন তথ্য-প্রমাণের মধ্যে ব্যাপক গরমিল এবং বেসরকারীভাবে গঠিত তদন্ত কমিটিগুলোকে এ বিষয়ে

BanglaBook.org

সহযোগিতা করতে সরকারের অনীহা ইত্যাদি।

দ্য নিউ পার্ল হারবার-এর যে কোনো অংশ পড়লেই বোঝা যাবে গ্রিফিনের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এটা প্রমাণ করা যে, হামলার পরপরই ঘটনা সম্পর্কে বুশ প্রশাসনের তরফ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে একটি সহজবোধ্য, বিশ্বাসযোগ্য ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করা প্রয়োজন ছিল। যাতে দেশবাসী ও বিশ্ববাসী জানতে পারে ১১ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে আসলে কী ঘটেছিল। কেমন করে ঘটেছিল। কারণ এসব জানার অধিকার তাদের আছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পরিচিতি

৯/১১-এর হামলাকে প্রায় সময়ই পার্ল হারবারে জাপানি আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেমন, অনুসন্ধানী সাংবাদিক জেমস বামফোর্ড প্রেসিডেন্ট বুশের সেদিনের কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে একবার লেখেন: 'ইন দ্য মিডল অভ এ মডার্ন ডে পার্ল হারবার,' বা আধুনিক পার্ল হারবার দিবসের মাঝ বেলায়...। সিবিএস নিউজ রিপোর্ট করেছিল, সে রাতে প্রেসিডেন্ট ঘুমাতে যাওয়ার সময় তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন 'আজ একুশ শতকের পার্ল হারবার ঘটানো হলো।'

তর্কের খাতিরে এই তুলনা প্রায় সময়ই করা হয়ে থাকে যে, পার্ল হারবারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকানরা যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল, ৯/১১-এর দিনেও সেই একই প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত ছিল। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট বুশের ভাষণের পরপরই হেনরি কিসিঞ্জার একটা অনলাইন প্রতিবেদন পোস্ট করেন। যাতে বলা হয়: 'সরকারের উচিত ক্রমানুসারে (সিস্টেমেটিক) এ ঘটনার যথোপযুক্ত জবাব দেয়া। তাহলে পার্ল হারবারের পরিণতি যা হয়েছিল, এ ক্ষেত্রেও সেই পরিণতিই হবে আশা করা যায়—এ জন্য যে ব্যবস্থা (সিস্টেম) দায়ী, তার ধ্বংসের মাধ্যমে।'

কোনো কোনো আলোচনায় দাবি করা হয় যে, ৯/১১-এর হামলার মধ্যে দিয়ে আমেরিকাকে তার সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য উস্কে দেয়া হয়। যেমন হয়েছিল পার্ল হারবারের মধ্যে দিয়ে। ২০০০ সালে বুশ প্রশাসনের উঁচু পদের একজন হবু কর্মকর্তা তো বলেই ফেলেছিলেন, তাঁরা যে পরিবর্তন চাইছেন, 'একটা নতুন পার্ল হারবার' না ঘটা পর্যন্ত সে লক্ষ্য পূরণ করা কঠিন হবে। তার ঠিক এক বছর পরই ঘটল ৯/১১। একজন অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক, জন পিলজার সে কথা মনে করিয়ে দিতে লিখেছিলেন: 'এই হামলা নতুন পার্ল হারবার ঘটিয়ে দিল।'

তাছাড়া ইউ. এস. আর্মির *ইনস্টিটিউট ফর স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ*-এর রিপোর্টে দাবি করা হয়, পার্ল হারবার আক্রমণের পর জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া যেমন ছিল, ৯/১১-এর হামলার প্রতিক্রিয়াও একই রকম ছিল।

৯/১১-এর সাথে পার্ল হারবারে জাপানিদের বিমান আক্রমণের তুলনা করাকে একেবারে অযৌক্তিক বলা যাবে না। ৯/১১-এর হামলার ঘটনা যে আমেরিকা ও বাকি বিশ্বের মধ্যে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা মোটামুটি সবাই স্বীকার করবে। ওই হামলা সাধারণ আমেরিকানদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে একটা বেড়ার মধ্যে

BanglaBook.org

সীমাবদ্ধ করে ফেলে। যেমনটা ঘটেছিল পার্ল হারবারে হামলার পর জাপানি-আমেরিকানদের ভাগ্যে। ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলা ছিল আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী পরিচালিত 'ওয়ার অন টেরর'-এর ভিত্তি, বিশেষ করে আফগানিস্তান আর ইরাকের বিরুদ্ধে।

বুশ প্রশাসনের 'ওয়ার অন টেরর' ছিল আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ। ফিলিস বেনিস এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এর উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের প্রশ্নাতীত আইনের মাধ্যমে বাকি দুনিয়ার বিদেশ নীতির ওপর নিজেদের বিদেশ নীতি চাপিয়ে দেয়া।' কিছুদিন থেকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক দাবি করে আসছিলেন, অনেকদিন থেকেই আমেরিকান নেতাদের স্বপ্ন ছিল সারা পৃথিবীকে নিজেদের দখলে নিয়ে আসার। তবে বেশিরভাগ ফরেন পলিসি ক্রিটিক বা বিদেশ নীতি সমালোচক বিশ্বাস করেন জর্জ ডাব্লিউ বুশের প্রশাসন, বিশেষ করে ৯/১১-এর পর থেকে সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে ছিল খুবই আগ্রাসী।

রিচার্ড ফক একে বর্ণনা করেছেন 'দ্য গ্লোবাল ডমিনেশন প্রজেক্ট' বা বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্বের প্রকল্প বলে। ৯/১১-এর পর আমেরিকার প্রতি বলতে গেলে সারা বিশ্বেরই একটা বিশেষ সহানুভূতি লক্ষ করা গিয়েছিল। অনেক দেশই সেদিনের হামলার ঘটনার পর আমেরিকার পক্ষ নেয়। ফলে মনে হচ্ছিল, যা খুশি তাই করার একটা যেন অলিখিত অনুমোদন পেয়ে গেছে দেশটি। যদিও সে অবস্থা বদলে যেতে সময় লাগেনি।

বর্তমানে সারা দুনিয়ায় আমেরিকার বিদেশ নীতি আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় ব্যাপকভাবে এবং অত্যন্ত তীব্র ভাষায় সমালোচিত হচ্ছে। এমনকি ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়কার সমালোচনার চাইতেও বর্তমানে অনেক অনেক বেশিরকম সমালোচিত হচ্ছে আমেরিকা। কিন্তু সমস্ত সমালোচনার জবাবে আমেরিকানদের কৈফিয়ত একটাই, ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলা।

ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার দায়ে ইওরোপিয়ান সম্প্রদায় যখন বুশ প্রশাসনের সমালোচনায় মেতে ওঠে, তখন যুদ্ধ সমর্থনকারী অনেক আমেরিকান ওপিনিয়ন মেকার; 'ইওরোপিয়ানদেরকে ৯/১১-এর ধকল সামলাতে হয়নি। সামলাতে হয়েছে আমেরিকাকে,' এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এর সোজা অর্থ, পাল্টা আক্রমণ চালানোর অধিকার তাদের আছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রেসের ব্যর্থতা

৯/১১-কে কেন্দ্র করে আফগানিস্তান ও ইরাকে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা যে আগ্রাসন চালায়, হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ হত্যা করে, সে প্রসঙ্গে অনেক বিশিষ্টজন বলেছেন, ঐতিহাসিকেরা একদিন ঠিকই পিছন ফিরে তাকাবেন এবং একুশ শতকের সত্যিকারের শুরুটা কিভাবে হয়েছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইবেন।

সেই বিভীষিকাময় দিনের প্রথম বর্ষপূর্তীতে *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস* লিখেছিল : এক বছর পেরিয়ে গেল, অথচ সাধারণ মানুষ আজও পর্যন্ত জানতে পারেনি সেদিন ম্যানহাটনের পায়ের কাছে কি ঘটেছিল। কেন ২,৮১০ জন নিরীহ মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। অথচ ১৯১২ সালে টাইটানিক ডুবির আসল কারণ জানতে মানুষের কয়েক সপ্তাহের বেশি লাগেনি।

৯/১১-এর বেলায় তা হয়নি কারণ বুশ প্রশাসন সে ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারের যুক্তি ছিল, বিষয়টা এখনই তদন্ত করতে গেলে তাদের পরিচালিত 'ওয়ার অন টেরর'-এর দিকে ঠিকমতো নজর দেয়া যাবে না। এই অজুহাতে সরকার কোনো স্পেশাল কমিশন গঠন করেনি। তবে সাধারণ মানুষের বিস্তারিত জানতে না পারার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল *টাইমস* ও মূল ধারার প্রেসের ব্যর্থতা। ঘটনা নিয়ে কোনো অনুসন্ধানী রিপোর্ট ছাপানোর প্রয়োজনীয় সরকারী অনুমোদন তাদের ছিল না।

আরও একটি বছর কেটে যাওয়ার পরও পরিস্থিতি অনেকটা একই রকম ছিল। ২০০৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর *ফিলাডেলফিয়া ডেইলি নিউজ*-এ এক লেখক প্রশ্ন করেন, 'ঘটনার পর ৭৩০ দিন কেটে যাওয়া সত্ত্বেও ৯/১১-এর সত্যিকারের ঘটনা সম্পর্কে আমাদের জানার দৌড় এত অল্প কেন?'

আমেরিকান প্রেস আজও পর্যন্ত এ বিষয়ে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য কোনো ইন-ডেপথ বা গভীর তথ্যানুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারেনি। বুশ প্রশাসন থেকে ৯/১১ প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, কিছু কিছু খবরের কাগজ ও টেলিভিশনের পক্ষ থেকে সেসব সম্পর্কে অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তাতে প্রকাশ পায়, সরকারের বক্তব্য আর ঘটনার আলামতের মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারের বক্তব্য ও বাস্তবতা বিরোধী। তবু প্রেস সেসব নিয়ে কর্মকর্তাদের মোকাবেলা করেনি।

BanglaBook.org

সাধারণ মানুষ যে সমস্ত অস্বস্তিকর প্রশ্ন সম্পর্কে আগে থেকেই মোটামুটি ওয়াকিবহাল ছিল, তাদের মধ্যে যে কানাঘুষা চলছিল, মূল ধারার মিডিয়া সেসবের বিশ্বাসযোগ্য কোনো জবাবই দিতে পারেনি।

এ নিয়ে সারা বিশ্বে পরিচিত এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার বিজয়ী গ্রেগরি প্যালাস্ট ও কানাডার পুরস্কার বিজয়ী সাংবাদিক ব্যারি জুইকারসহ অনেক সাংবাদিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা রিপোর্ট লিখেছিলেন। সাধারণ মানুষ সেসব পড়ে থাকলেও তাদের বিবেক সেসবের উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে পারেনি। সেগুলো অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী রিপোর্টিং হলেও একান্ত ব্যক্তিগত কাজ বলে সাধারণ পাঠকের কাছে সামগ্রিকভাবে খুব বেশি গুরুত্বও পায়নি।

তাই সেসব থেকে উল্লেখ করার মতো ফলও পাওয়া যায়নি। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ও সবার আস্থাভাজন কিছু ব্যক্তিত্ব ৯/১১-এর হামলা সম্পর্কে দেয়া সরকারী ব্যাখ্যার তীব্র সমালোচনা করলেও দেশের মাস মিডিয়া এ ব্যাপারে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেনি।

সরকারি তদন্ত রিপোর্টের যে সমস্ত সমালোচনা হয়েছে, তার প্রতিটার ভাষা ছিল তীব্র জ্বালাময়ী ও উত্তেজনাকর। সেসব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যার অর্থ ছিল প্রেসিডেন্টসহ অন্যরা যে ভয়াবহ মিথ্যাচার করেছেন, তা সাধারণ মানুষ বুঝে ফেলেছে। বুঝে ফেলেছে সরকার মিথ্যা কাহিনী প্রচার করছে। এটাও বুঝে ফেলেছে যে এ কাজ করা হয়েছে নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে। ৯/১১-এর সরকারি ব্যাখ্যার সমালোচকদের বেশিরভাগের মন্তব্যই নেতিবাচক ছিল।

অতএব 'অত্যন্ত গুরুতর', এই অজুহাতে দেশের ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কোনো অভিযোগ তদন্তে আমাদের মিডিয়া যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে কিভাবে দাবি করা সম্ভব যে আমাদের প্রেস বা ফোর্থ স্টেট স্বাধীন? প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিরুদ্ধে ওঠা ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীও অত্যন্ত গুরুতর ছিল, ইরান-কন্ট্রা বিষয়ে প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের বিরুদ্ধে আনা বিভিন্ন অভিযোগ গুরুতর ছিল, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বিরুদ্ধে আনা নানান অভিযোগও কম গুরুতর ছিল না। সেসবের প্রতিটার বেলায় প্রেস ক্ষীণ স্বরে হলেও কথা বলেছিল। কিন্তু ৯/১১-এর বেলায় তা হয়নি। অথচ এ ধরনের পরিস্থিতিতে কাজ করার জন্যই আমাদের মুক্ত মিডিয়ার প্রয়োজন।

কিন্তু ৯/১১-এর বেলায় আমেরিকান প্রেস তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেনি। অথচ যদি শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয় ৯/১১ সম্পর্কে সরকারী ব্যাখ্যা মিথ্যা ছিল, তার ফলাফল হবে আগের সমস্ত কেলেঙ্কারীর চেয়ে অনেক, অনেক ভয়াবহ। আফগানিস্তান ও ইরাকের যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার কাজে সরকারী ব্যাখ্যাকে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে কেবল হাজার হাজার আমেরিকান সৈন্যকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়নি, ৯/১১-এর হামলায় যারা দুঃখজনক মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের চাইতে অনেক বেশি নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

বুশ প্রশাসনের ইরাকে অভিযান চালানোর 'ন্যায়সঙ্গত' অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে আরও অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে আমেরিকা। বিশ্বের আরও ডজনখানেক জায়গায়

BanglaBook.org

নিজেদের সামরিক অভিযানকে হালাল করার কাজে ব্যবহার করেছে এই অজুহাতকে। যার অনেকগুলোর কথা বেশিরভাগ সাধারণ আমেরিকানের অজানাই রয়ে গেছে। স্বেচ্ছাচারিতা চূড়ান্ত করতে তার সাথে ইউএসএ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট (USA PATRIOT Act.)-কে ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ আমেরিকানদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে কাটছাঁট করার কাজে।

কুখ্যাত গুয়ানতানামো বে কারাগারসহ একই ধরনের আর যত কারাগার আছে, সেগুলোর বন্দিদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানোর বিষয়টাকে হালাল করতেও এই আইন কাজে লাগানো হয়। এতকিছুর পরও মিডিয়া প্রেসিডেন্ট বুশকে ৯/১১ সম্পর্কে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি করতে পারেনি। অথচ এই প্রেসই কয়েক বছর আগে মনিকা লিউইনিস্কিরি সাথে অনৈতিক সম্পর্কের প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল। কি অকল্পনীয় বিচ্যুতি!

আমেরিকান মিডিয়ার এই ব্যর্থতা নিয়ে দেশের ভেতরের কেউ কেউ মুখ খুলেছেন। উদাহরণ হিসেবে এরকম একজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তিনি হলেন সিএনএন ইন্টারন্যাশনালের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল ম্যানেজার, রেনা গোল্ডেন। ২০০২ সালের আগস্ট মাসে ৯/১১ এবং আফগানিস্তান যুদ্ধ সম্পর্কে নিজেদের মতামত আমেরিকান প্রেস কাটছাঁট করেছে দাবি করে তিনি বলেছিলেন, 'যদি কেউ বলে আমেরিকান প্রেস চাপের মুখে নিজের বক্তব্য সংশোধন করে না, তাহলে বুঝবেন আপনাদেরকে বোকা বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা কেবল সিএনএন-এর বেলাতেই সত্যি নয়, যে সমস্ত সাংবাদিক ৯/১১-এর ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাদের প্রত্যেকের বেলাতেই আংশিক হলেও সত্যি।'

এ জন্যই সংবাদ সংস্থা সিবিএস-এর অ্যাঙ্করম্যান হিসেবে পরিচিত ডান রাদার একবার বলেছিলেন, 'একটা সময় ছিল যখন দক্ষিণ আফ্রিকানরা ভিন্নমত পোষণকারীদের গলায় জ্বলন্ত টায়ার ঝুলিয়ে দিত। ৯/১১-এর পরে সেই ভয়টা এ দেশেও দেখা দিয়েছিল—বাড়াবাড়ি করলে গলায় নেকলেস পরিয়ে দেয়া হবে। উপযুক্ত দেশাত্মবোধের অভাবের জ্বলন্ত নেকলেস। এই ভয়েই ৯/১১-এর বিভিন্ন অসামঞ্জস্য সম্পর্কে কঠিন থেকে কঠিনতর প্রশ্ন করতে সাংবাদিকরা বিরত ছিলেন।'

ডান রাদারের এই মন্তব্যই প্রমাণ করে ওই সময় আমেরিকান প্রেসের পক্ষে সরকারী ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা কত কঠিন ছিল। কত অসহায় ছিল প্রেস। 'দেশপ্রেমের অভাব আছে', গায়ে এমন সিল একবার পড়ে গেলে সাংবাদিকদের চাকরি হারানোর ভয় ছিল প্রবল।

৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে সরকার যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তার প্রধান সমালোচকদের অন্যতম ছিলেন থিয়েরি মেইসান। তিনি বলেছেন, বুশ প্রশাসন সে ব্যাখ্যার কোনো সমালোচনাকেই সহ্য করতে পারত না। তারা সেটাকে শুধু অদেশপ্রেমিকসুলভ হিসেবেই দেখত না, ধর্মদ্রোহিতামূলক হিসেবেও দেখত। এ প্রসঙ্গে তিনি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেন, হামলার একদিন পর, ১২ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট বুশ তাঁর উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে ঘোষণা করেন 'তাঁর ইচ্ছে শয়তানের বিরুদ্ধে

BanglaBook.org

"ঈশ্বরের যুদ্ধের" নেতৃত্ব দেয়া। পরদিন ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি ঘোষণা করেন, ১৪ সেপ্টেম্বর হবে সন্ত্রাসী হামলার মৃতদের স্মরণে 'ন্যাশনাল ডে অব প্রেয়ার অ্যান্ড রিমেমব্রান্স' (Remembrance)।

সেদিন বিলি গ্রাহাম নামে এক কার্ডিনাল, এক ইহুদী ধর্মজাযক বা র‍্যাবাই, একজন ইমাম এবং তাঁর আগের চারজন প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের অনেক সদস্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় সারমন বা হিতোপদেশ প্রচার করেন জর্জ বুশ—'ইতিহাসের কাছে আমাদের অঙ্গীকার সুস্পষ্ট, এইসব হামলার জবাব দেয়া এবং পৃথিবীকে শয়তানমুক্ত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য,' বলেন তিনি।

'শঠতা, প্রতারণা এবং হত্যার মাধ্যমে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই জাতি শান্তিপূর্ণ, কিন্তু যখন ক্রুদ্ধ করে তোলা হয় তখন ভয়ঙ্কর... প্রতি প্রজন্মেই মানবতার শত্রুদের জন্ম দিয়ে থাকে পৃথিবী। সেই মানবতার শত্রুরা আমেরিকায় হামলা চালিয়েছে, কারণ এ দেশ শৃঙ্খলহীনদের ও আত্মরক্ষাকারীদের। আমাদেরকে পূর্ব পুরুষদের অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে... আমরা সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের জাতির দিকে দৃষ্টি রাখতে এবং আমাদেরকে ধৈর্য্য ধারণসহ ভবিষ্যতের সকল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার শক্তি জোগাতে... এবং তিনি যেন সব সময় আমাদের দেশকে মঙ্গলের পথ দেখিয়ে যান। গড ব্লেস আমেরিকা।'

এমন অভূতপূর্ব, নজিরবিহীন এক সমাবেশের মধ্যে দিয়ে ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্যাথেড্রালে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন 'অবয়ববিহীন সন্ত্রাসের পিছনের অবয়বের' বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে আমেরিকার বিদেশ নীতির সমালোচক থিয়েরি মেইসান তাঁর প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন 'ঘটনাটিকে সরকার এভাবে "পবিত্র কর্তব্য" বানিয়ে ফেলল।'

ফলে সেই মুহূর্ত থেকে ৯/১১ সম্পর্কিত সরকারী ব্যাখ্যার কোনো অংশ নিয়ে প্রশ্ন তোলাকে ধর্মদ্রোহিতামূলক কাজ হিসেবে দেখা হতে লাগল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৯/১১ এবং বামপন্থী

৯/১১ প্রশ্নে দেয়া সরকারী ব্যাখ্যা নিয়ে কোনো অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলাকে যদি অদেশপ্রেমিকসুলভ আর ধর্মদ্রোহিতামূলক হিসেবেই দেখা হয়ে থাকে, তাহলে সিএনএন-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জিএম রেনা গোল্ডেন ও ডান রাদারম্যান যে দাবি করেছেন—দেশের মেইনলাইন প্রেস তা নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন তোলেনি; তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না।

দেশের ডানপন্থী ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মিডল-অব-দ্য-রোড ভাষ্যকাররা যে এ বিষয়ে কোনোরকম বেফাঁস প্রশ্ন তোলেননি, তাতেও যেমন অবাক হওয়ার মতো কিছু থাকে না—তেমনি সোশ্যাল ও পলিটিক্যাল এথিকস-এর প্রফেসর, জাঁ বেথকে এলশটাইন ৯/১১ প্রসঙ্গে, 'সরকারের বিরুদ্ধে অফিশিয়াল দুষ্কর্মের যে অভিযোগ উঠেছে, তা যে কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যার বাইরে। কাজেই এ ধরনের যে কোনো অভিযোগ স্রেফ উপেক্ষা করতে হবে,' যে ঘোষণা দিয়েছেন, অবাক হওয়ার কিছু তার মধ্যেও থাকে না।

আমেরিকার প্রশাসন ও প্রেসিডেন্ট বুশ যোগসাজশের মাধ্যমে এই হামলা চালিয়েছে ও নিজেদের 'দুষ্কর্ম' ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করছে, এমন ধারণাকে তিনি 'উদ্ভট' দাবি করে বলেন, 'এ ধরনের গা জ্বালানো পাগলামি রাজনৈতিক বিতর্কের দেয়ালের বাইরের জিনিস। এ নিয়ে বিতর্কের কোনো প্রয়োজন নেই।' দৃষ্টিভঙ্গি এরকম হলে ৯/১১-এর সরকারী ব্যাখ্যার সমালোচকরা যে সমস্ত প্রমাণ তুলে ধরেছেন, তা পরীক্ষা করে দেখারও কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

যদিও সেসবের মধ্যে আমেরিকার পাশের দেশ, কানাডার দু'জন সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ, ইকনমিস্টের সমালোচনাও আছে। তাঁরা হলেন মিচেল চসুদোভস্কি ও সোশ্যাল ফিলসফার জন ম্যাকমার্ট্রি। যদিও এলশটাইন এ-ও বলেছেন, 'যদি ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে আমাদের কোনো ভুল ধারণা থাকে, তাহলে আমাদের অ্যানালিসিস ও এথিকসেও ভুল থাকবে।' মহিলার অবস্থান লক্ষ করলে মনে হয়, তাঁর ধারণা ৯/১১-এর সরকারী ব্যাখ্যা সঠিক ছিল না, এমনটা ভাবা অনর্থক। যদিও এই আচরণ হবে দুর্ভাগ্যজনক, বিশেষ করে এসব কথা যখন বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচার করা হবে

তবে এখানে অবাক হওয়ার মত বিষয় হলো, আমেরিকার ফরেন পলিসির লেফটিস্ট ক্রিটিক বা বামপন্থী সমালোচক বলে যাঁরা পরিচিত, অদেশপ্রেমিক ও

BanglaBook.org

ধর্মদ্রোহি বলে তিরস্কৃত হওয়ার ভয় যাঁদের তেমন নেই, তাঁরাও এই ডামাডোলের মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই নীরব দর্শক ছিলেন। প্রায় সবদিক থেকে সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা মূল অভিযোগ; এই দুষ্কর্মে প্রশাসনের সহযোগিতা করার সম্ভাবনা আছে কি নেই, তা নিয়ে জনসাধারণের সামনে মুখ খোলেননি তাঁরা।

আসলে বুশ প্রশাসন ৯/১১-এর প্রশ্নে যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তাতে এই সমালোচকরা জটিল পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলেন। তাঁরা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন, প্রশাসন ৯/১১-এর ঘটনাকে নিজেদের সুবিধামতো কিছু কঠোর আইন চালু করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। একই সাথে এমন সব আয়োজন করেছে, যাতে এই হামলার প্রস্তুতি পর্বের সাথে জড়িতদের শাস্তি তো দূরের কথা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বরং তাদের পদোন্নতির বিষয়টা নিশ্চিত করা হয়েছে।

বামপন্থী সমালোচকরা উল্লেখ করেছেন, এইসব নীতি ও অপারেশনের বেশিরভাগ ৯/১১-এর হামলার আগে থেকেই বুশ প্রশাসনের কর্মসূচীতে ছিল। হামলার কারণেই সেগুলোকে আইনে পরিণত হয়েছে এমন নয়, হামলাটা ছিল সেসব কার্যকর করার অজুহাতমাত্র। তাদের জানা আছে, নতুন করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে আমেরিকান সরকার এরকম 'ঘটনা' আগেও একাধিকবার ঘটিয়েছে। সেসবের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক কয়েকটা হলো মেক্সিকো, কিউবা আর ভিয়েতনামের 'ঘটনা'।

তবে ৯/১১-এর বেলায়ও এমনটা ঘটেছে কি না, তা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি এঁরা। অন্তত প্রকাশ্যে। যদি এ ক্ষেত্রে সেরকম কিছু ঘটে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে বুশ প্রশাসন যে নীতির কড়া সমালোচক ছিলেন, সেটার ভিত্তিকেই দুর্বল করা হয়েছে। তিনি তাঁর পূর্বসুরীদের দেখানো পথেই হেঁটেছেন। তবে সেদিনকার সন্ত্রাসী হামলা যদি সত্যি সত্যি বাইরে থেকে ঘটানো হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে তা ছিল বুশের জন্য 'ঈশ্বর প্রদত্ত' সুযোগ। তাঁর আগের কর্মসূচী পালনের সুযোগ করে দিয়েছে সেটা।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের এক মুখর তবে প্রতিভাবান সমালোচক রাহুল মহাজন। তিনি এর স্বপক্ষে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হাজির করেছেন। বুশ প্রশাসনের যে সমস্ত দলিলে *রিবিল্ডিং আমেরিকা'স ডিফেন্স* বা আমেরিকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য 'নতুন পার্ল হারবার'-এর প্রয়োজন আছে বলে উল্লেখ করা আছে, ৯/১১-এর পরে সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন রাহুল মহাজন। *প্রজেক্ট ফর দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি* নামের এক সংগঠন এ প্রকল্পের স্রষ্টা।

সে দলিলের তিনটি মেজর থিম বা বড় ধরনের বিষয়বস্তুর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন মহাজন। সেগুলো হলো (১) শক্তি প্রয়োগের সুবিধার জন্য বিশ্বব্যাপী আরও অনেক সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে হবে আমেরিকাকে, (২) যে সমস্ত দেশ আমেরিকার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন নয়, সেগুলোর 'সরকার পরিবর্তন' করতে হবে এবং (৩) সামরিক ব্যয় বহুগুণ বাড়াতে হবে, বিশেষ করে 'মিসাইল ডিফেন্স' বা মিসাইল প্রতিরক্ষা খাতে।

দলিলের মতে এই 'মিসাইল ডিফেন্স' শত্রুকে বাধা দেয়ার জন্য স্থাপন করা হবে না। অন্য কোনো দেশ যাতে আমেরিকাকে তার কাজে বাধা দিতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে স্থাপন করা হবে। অর্থাৎ 'আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার অত্যাবশ্যকীয়

BanglaBook.org

শর্ত' হিসেবে করা হবে। রাহুল মহাজন এরপর উল্লেখ করেন, '৯/১১-এর হামলা স্বভাবতই সামরিক বাজেটকে উর্ধ্বমুখী করার একটা চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে।' আরও যে সমস্ত আইডিয়া ছিল সেই দলিলে, সেসব হলো আগে থেকে তেল ব্যবসায় জড়িত জর্জ বুশ ও ডিক চেইনির সামনে ৯/১১-এর এনে দেয়া সুযোগের ফিরিস্তি।

মহাজন উল্লেখ করেন, দলিলে আরও বলা হয়েছে যে সামরিক ক্ষমতার প্রার্থীত রূপান্তর ঘটানো রাজনৈতিকভাবে হয়ত সম্ভব হবে না 'কিছু আকস্মিক বিপর্যয় বা পরিবর্তন সাধনে সহায়ক পরিবেশ-পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে – যেমন পার্ল হারবার ধরনের কিছু একটা'। রাহুল তার সাথে যোগ করেন, 'এক বছরের মধ্যে তাদের (সেই দলিল লেখকদের) ইপ্সিত পার্ল হারবার 'ঘটে যায়' এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী কল্প-কাহিনী বাস্তবে রূপ নেয়।'

তবে ৯/১১ যে দৈব-সংযোগ নয়, সে বিষয়টিও একেবারে উড়িয়ে দেননি তিনি। বলেছেন, 'এ ঘটনা আমেরিকার ফরেন পলিসির ইতিহাসে অন্য অনেক ঘটনার সঙ্গে ফরাসি কেমিস্ট লুই পাস্তুরের বিখ্যাত এক স্বতঃসিদ্ধ উক্তি, 'ফরচুন ফেভার্স দ্য প্রিপেয়ার্ড মাইন্ড'-এর আরেক নমুনা হয়ে থাকবে।

মহাজনের ধারণা সত্যি হলেও হতে পারে। তিনি এমন কেন ভাবছেন, তা ব্যাখ্যা করেননি যদিও। প্রশাসন সহযোগিতা না করলে ৯/১১ কখনোই সফল হতো না, এর পক্ষে যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে; মনে হয় মন্তব্যটা করার আগে তিনি সেসব ঠিকমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেননি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এ বই আত্মপ্রকাশ করল কিভাবে

ভালোভাবে যাচাই না করেই রাহুল মহাজন এ বিষয়ে পাওয়া তথ্য-প্রমাণ বাতিল করেছেন কি না জানি না, তবে আমার ক্ষেত্রে কথাটা সত্যি। ২০০৩ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত আমি ৯/১১ সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য-প্রমাণে চোখই বোলাইনি। যদিও জানতাম অনেকেই ইন্টারনেটে এ নিয়ে তথ্য চালাচালি করছেন। ৯/১১-এর ব্যাপারে আমেরিকান সরকারের পক্ষ থেকে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তার উল্টো তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। তাদের অনেকে এমন দাবিও করেছেন যে, সরকারী কর্মকর্তাদের হাত আছে এই দুষ্কর্মে। কিন্তু আমি সেসব ওয়েবসাইট খোঁজার পিছনে সময় নষ্ট করিনি।

আমি ৯/১১ পাশে সরিয়ে রেখে আমেরিকান সরকারের সম্প্রসারণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস খুঁটিয়ে পড়ছি তখন। আমি জানতাম, দেশটি অতীতে অনেকবার এ ধরনের 'ঘটনা' সৃষ্টি করে যুদ্ধে যাওয়ার অজুহাত তৈরি করে নিয়েছে। আমার মনে যদিও সন্দেহ ছিল ৯/১১ হয়ত সে ধরনেরই কিছু হবে, কিন্তু তাকে খুব একটা গুরুত্বের সঙ্গে নিইনি। কারণ বুশ প্রশাসনের মত মারমুখী প্রশাসনও এমন একটা মহা অপরাধ ঘটিয়ে বসতে পারে, বিষয়টা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

ভাবতাম, যারা এসবের সাথে প্রশাসনের জড়িত থাকার কথা দাবি করছে, তারা নিশ্চয়ই সেই ষড়যন্ত্রের হোতা বা তাত্ত্বিক। সোজা কথায় 'ক্র্যাকপট' বা বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি। তবে এটাও মনে মনে স্বীকার করতাম, যদি তাদের অভিযোগ সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে সেটা অত্যন্ত গুরুতর একটা বিষয়ই হবে।

নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম, তাদের ধারণা ভুল। ৯/১১-এর সাথে আমেরিকান সরকার জড়িত বলে যে সমস্ত লেখালেখি চলছে, তার মধ্যে কোনো পদার্থ নেই। ভিত্তি নেই। অনুমানের ওপর হাজির করা পাগলাটে থিয়োরি ছাড়া ওগুলো আর কিছু নয়। আমি নিশ্চিত ছিলাম, বেশিরভাগ মানুষই তথ্য-প্রমাণ ঠিকমত যাচাই না করেই কথা বলছে। কাজেই সেসব পড়ে দেখার মত সময় বা ইচ্ছা, কোনোটাই ছিল না। জীবন সংক্ষিপ্ত, অথচ ষড়যন্ত্রের থিয়োরির তালিকা অনেক লম্বা। আমাদেরকে তাই বিচার করে দেখতে হবে কোনটার পিছনে সময় নষ্ট করব। ইত্যাদি ভেবে আমি ধরেই নিয়েছিলাম ৯/১১-এর ষড়যন্ত্রের থিয়োরি সত্যি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এমন সময় আমার এক সহযোগি প্রফেসর আমাকে কিছু ই-মেইল মেসেজ পাঠান যাতে ৯/১১ সংশ্লিষ্ট কিছু ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস ছিল। জানতাম মহিলা যথেষ্ট

BanglaBook.org

সুবিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তাই তার নির্দেশ করা কিছু লেখায় চোখ বোলাই। বিশেষ করে পল থম্পসন নামে এক স্বাধীন গবেষকের *৯/১১ ঘটতে দেয়া হয়েছিল?* শিরোনামের লেখাটা পড়লাম। অবাক হলাম দেখে যে, থম্পসন মেইনলাইন সূত্রের ভিত্তিতেই সেটা লিখেছেন। ভাবলাম, কতগুলো প্রমাণ তিনি পেয়েছেন, যাতে মনে হয়েছে বুশ প্রশাসন ইচ্ছে করেই ৯/১১-এর হামলার ঘটনা ঘটতে দিয়েছিল?

ওই সময় ঘটনাক্রমে আমি গোর ভিডালের লেখা *ড্রিমিং ওয়ার: ব্লাড ফর অয়েল অ্যান্ড দ্য চেইনি-বুশ জান্তা* বইটা পড়ছিলাম। ওটা পড়া হতে ৯/১১ সম্পর্কে সবচেয়ে তথ্য বহুল দলিল, *ওয়ার অন ফ্রিডম: হাউ অ্যান্ড হোয়াই আমেরিকা ওয়াজ অ্যাটাকড্ সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১* নামের একটি বইয়ের খোঁজ পাই। ইংল্যান্ডের এক স্বাধীন গবেষক, নাফিজ মোসাদ্দেক আহমেদের লেখা। নাফিজের বইতে ৯/১১ সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক বিতর্ক টেনে আনা হয়েছে, তাতে সরকারী ব্যাখ্যার সত্যতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে দাবি করা হয়েছে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর 'ব্রেক ডাউনের' কারণে এ ঘটনা ঘটেছে।

থম্পসনের মত নাফিজেরও দাবি, সরকারের সর্বোচ্চ মহলের দুরভিসন্ধি ছিল বলেই ৯/১১-এর হামলার ঘটনা ঘটতে পেরেছে। নিম্নস্তরের অযোগ্যতার কারণে ঘটেনি। আহমেদ ও থম্পসনের হাজির করা মাল-মশলা পরীক্ষা করার পর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে সেগুলো যথেষ্ট জোরালো গুরুত্বের অধিকারীই বটে। এত বেশি গুরুত্বের অধিকারী যে ৯/১১ দেশের কমিউনিকেশন ও ইন্টেলিজেন্স ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণে ঘটেছে বলে যাদের ধারণা; সেই আমেরিকান প্রেস, আমেরিকান কংগ্রেস এবং ৯/১১ বিষয়ক ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশনের বিস্তারিত তদন্তের দাবি রাখে সেসব।

এখানে বলে রাখা ভালো, ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার বিষয় তদন্ত করে দেখার জন্য ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্টেলিজেন্স কমিটিজ অব দ্য ইউএস সিনেট ও হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস একটা যৌথ কমিটি গঠন করে। ওই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই তদন্তের রিপোর্ট পেশ করে এই কমিটি, কিন্তু বুশ প্রশাসন সেটাকে দীর্ঘদিন ধরে আটকে রাখে। প্রকাশ করতে রাজি হয়নি। তবে সেটার সামান্য একটা অংশ ব্রিফ সামারি হিসেবে প্রকাশ করা হয়। অবশেষে ২০০৩ সালের জুলাই মাসের শেষদিকে পুরো রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।

কিন্তু তার বড় একটা অংশই তাতে অনুপস্থিত ছিল। জাতীয় নিরাপত্তার নামে রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ ডিলিট করে দেয়া হয়েছিল। জানা যায়, সেসব অংশে অন্য কোনো কোনো দেশের নাম ছিল, বিশেষ করে সউদি আরবের। এ কাজ কেন করা হয়েছে, তার সম্ভাব্য কারণ এ বইয়ের ১০ নাম্বার অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আরেকটা কথা, যদিও এই কমিশনের অফিশিয়াল নাম ন্যাশনাল কমিশন অন টেররিস্ট অ্যাটাকস আপন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, কিন্তু সংক্ষেপে সেটা ৯/১১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন নামেই পরিচিত।

যা হোক, আগের কথায় আসি। আমি বুঝলাম থম্পসন ও নাফিজ আহমেদের অনেক পরিশ্রমের এ কাজগুলো খুব বেশি আমেরিকানের হাতে পৌঁছাবে না।

BanglaBook.org

থম্পসনের *টাইমলাইন* ধৈর্য ও সময় নিয়ে পড়তে পারলে গবেষকদের অনেক সাহায্য হতে পারে। কিন্তু সেটা সাধারণ আমেরিকানদের বেশিরভাগই সহজে পড়তেই পারবে না। এর প্রথম কারণ হলো সেটা কেবলমাত্র অনলাইনে পাওয়া যায়। এবং দ্বিতীয় কারণ, *টাইমলাইন* বলে ঘটনাসমূহকে ক্রনলজিক্যালি বা কালানুক্রম অনুযায়ী না সাজিয়ে পুরো বিষয়টাকে টপিক্যালি বা আলোচ্য বিষয় হিসেবে সাজানো হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আমি আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার এই বইয়ের একটা ব্যর্থতা হচ্ছে, এটায় উল্লেখ করা অনেক ঘটনা-কাহিনী ইত্যাদি কোন তদন্তকারী বা গবেষকের শ্রমের ফসল, কে প্রথমে কোন তথ্য আবিষ্কার করেছেন ও প্রচার করেছেন, তা আমি সব ক্ষেত্রে স্বীকার করিনি। অর্থাৎ তদন্তকারী-গবেষকদেরকে সবসময় তাদের ন্যায্য পাওনা দিইনি। এর একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

আমি অকাতরে পল থম্পসনের *টাইমলাইন*-এর উদ্ধৃতি দিয়ে গেছি, তার সাথে মাইকেল রুপার্টের ওয়েবসাইটেরও যথেচ্ছ ব্যবহার করেছি। যদিও অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু তাদেরকে প্রাপ্য স্বীকৃতি দিইনি। রুপার্ট প্রথমদিকে ৯/১১-এর সরকারী ব্যাখ্যার একজন কড়া সমলোচক ছিলেন। এরকম আরও একজন আছেন জারড ইসরায়েল। ৯/১১-এর সরকারী ব্যাখ্যা প্রকাশ হওয়ার পর সবার আগে ইসরায়েলই সেটাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। আমার মনে হয়েছে, এইসব তদন্তকারী-গবেষকদেরা স্রেফ স্বীকৃতি বা বাহবা পাওয়ার আশায় এত পরিশ্রম করছেন না। করছেন যাতে তাঁদের এই আন্দোলন সফল হয়, সেই আশায়।

যা হোক, *টাইমলাইন*-এ নাফিজ আহমেদের আবিষ্কার করা প্রমাণ ইত্যাদি আছে বই আকারে এবং সেটাও সাজানো হয়েছে আলোচ্য বিষয় হিসেবে। সেটা বেশ দীর্ঘ এবং ৯/১১-এর হামলার সঙ্গে বুশ প্রশাসন জড়িত ছিল, এমন বিতর্ক চালানোর স্বপক্ষে যত প্রমাণ প্রয়োজন, তারচেয়ে অনেক বেশি প্রমাণ ছিল সেটায়। সেসবের বেশিরভাগই আছে বইটির প্রথমদিকের অধ্যায়গুলোতে। যে জন্য সরকারের ব্যাখ্যার বিপরীতে বইটিতে হাজির করা প্রমাণসমূহের মধ্যে সরাসরি পরস্পরবিরোধী কাহিনী আছে কি না, তা জানতে হলে পাঠককে কয়েক অধ্যায় পড়তে হয়। এই দুই লেখকের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলো যদি সবার হাতে পৌঁছাতে পারত, বিশেষ করে সদাব্যস্ত কংগ্রেস সদস্য ও প্রেসের কাছে, তাহলে অন্যকিছুর প্রয়োজন পড়ত না বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রথমে আমি ঠিক করি ম্যাগাজিনে একটা আর্টিকল লিখব, থম্পসন ও নাফিজের হাজির করা মূল তথ্য-প্রমাণের সারাংশের উল্লেখ থাকবে সেটায়। যাতে সাধারণ পাঠক আগ্রহী হয়ে বই দুটি সংগ্রহ করে। কিন্তু সেই আর্টিকল বড় হতে হতে শেষ পর্যন্ত একটা বই-ই হয়ে গেল। কারণ লেখা শুরু করার অল্পদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পারি, যদি এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেসব প্রমাণ আছে, শুধু সেগুলো উল্লেখ করার মধ্যেই আমি নিজের কাজ সীমিত রাখি, তাহলেও সেটাকে কোনোমতেই একটা আর্টিকলের সীমিত কলেবরের মধ্যে পাঠকের বোঝার মতো করে হাজির করতে পারব না। এবং তা করতে গেলে এই দুই গবেষকের প্রতি অন্যায় করা হবে।

BanglaBook.org

এটা লেখার কাজে হাত দেয়ার পর থিয়েরি মেইসান নামে যে ফরাসি গবেষকের কথা উল্লেখ করেছি, তাঁর কাজের ব্যাপারে জানতে পারি। বিশেষ করে তাঁর সেই হাইপোথিসিস সম্পর্কে। যেটায় তিনি দাবি করেছিলেন, পেন্টাগনে আঘাত করা বিমানটি কিছুতেই বোয়িং ৭৫৭ হতে পারে না। সেটা নিঃসন্দেহে গাইডেড মিসাইল ছিল। আমি যখন প্রথম এ সম্পর্কে জানতে পারি, তখন মনে হয়েছে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট। কারণ দৈত্যাকার বোয়িং ৭৫৭-এর তুলনায় একটা গাইডেড মিসাইল অনেক ছোটো। কাজেই আক্রমণ যদি মিসাইলের সাহায্যেই হয়ে থাকে, তাহলে পেন্টাগন কাউকেই প্রভাবিত করতে পারবে না যে কাজটা বোয়িং ৭৫৭-এরই।

আমরা কি দেখিনি পেন্টাগনের যেদিকের দেয়ালে আঘাত লেগেছে, সেদিকে ২০০ ফুট চওড়া এবং পাঁচতলা সমান উঁচু গর্ত হয়ে গিয়েছিল? বোয়িং ৭৫৭ বা ফ্লাইট ৭৭ বলে পরিচিত সেই প্লেনের যাত্রী, একজন টিভির ধারা ভাষ্যকার, বারবারা ওলসেনের মুখ থেকে আমরা কি শুনিনি প্লেনটা ওয়াশিংটনের দিকে যাচ্ছিল? সাক্ষীরা কি সেটাকে শনাক্ত করেনি? প্রায় প্রত্যেকে, এমনকি ৯/১১-এর সরকারী ব্যাখ্যার সমালোচনাকারীরা পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছেন যে ফ্লাইট ৭৭-ই পেন্টাগনে আঘাত করেছে। তাদের সবার ভুল হয় কি করে?

পরে আমি মেইসানের বইগুলো পড়ে বুঝতে পারি, প্রথমবার তার দাবি যেমন এক কথায় উড়িয়ে দিতে পেরেছি, তা আর সম্ভব হচ্ছে না। বরং এক সময় মেইসানের দাবিই সত্যি বলে মেনে নিতে হলো আমাকে। মেইসানের বর্ণনা ও প্রমাণের কাছে বুশ প্রশাসনের ব্যাখ্যা একেবারে ডাহা মিথ্যে মনে হতে লাগল আমার। এই বইয়ে আমি সে সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আর কোনো বইতে এ কাজ করা হয়নি। নাফিজ আহমেদ, পল থম্পসন বা থিয়েরি মেইসান, কারও বইতে এ বিষয় নিয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। মাইকেল চসুদোভস্কির *ওয়ার অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন: দ্য ট্রুথ বাহাইন্ড সেপ্টেম্বর ১১* বইতেও বিষয়টা নেই। সাব টাইটেল অনুযায়ী কেবল ৯/১১-এর পটভূমি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে বইটায়।

এটায় আমি উল্লিখিত বইগুলোর যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-প্রমাণসহ আরও কিছু সূত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

BanglaBook.org

এ বইয়ে যা আছে

৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাবলীর ব্যাপারে বুশ প্রশাসন যে অফিশিয়াল ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছিল, পরে আমার মতে সেটার বিরুদ্ধে বড় ধরনের পাঁচরকম অভিযোগ ওঠে। সেসবের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা ও গ্রহণযোগ্যতার অভাবের অভিযোগই ছিল সবচেয়ে বেশি জোরালো। সেসব নিয়ে আমি এ বইয়ের প্রথম খণ্ডের চারটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে আরও চার ধরনের ব্যাখ্যাবিরোধী প্রমাণ নিয়ে।

সেগুলোকে 'ডিস্টার্বিং কোয়েশ্চেনস' বা অস্বস্তিকর প্রশ্ন হিসেবে সাজানো হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফরাসি সাংবাদিক থিয়েরি মেইসানের লেখা প্রথম বইয়ের ইংরেজি অনুবাদে বুশ প্রশাসনের সেই ব্যাখ্যার নাম দেয়া হয়েছিল *বিগ লাই (big lie)*। সেগুলো আরও এক বিষয়ে অস্বস্তিকর ছিল। কারণ পরে দেখা গেছে, ৯/১১-এর সেই সন্ত্রাসী হামলার পিছনে খোদ বুশ প্রশাসনেরই উঁচু পদের কারও কারও হাত ছিল।

আমি আলোচনা করেছি, বুশ প্রশাসনের কৈফিয়তে যে সমস্ত প্রমাণ ও ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো কতখানি সত্যি, তা নিয়ে। তারপর আলোচনা করেছি এ ঘটনার কি ধরনের তদন্ত হওয়া উচিত।

BanglaBook.org

সম্ভাব্য অফিশিয়াল দুষ্কর্মের তালিকা

৯/১১-এর ঘটনার সাথে সরকারের জড়িত থাকার, অর্থাৎ অফিশিয়াল দুষ্কর্মের অভিযোগ অনেকে তুললেও কেউই স্পষ্ট করে বলেননি যে কথাটা বলতে তারা আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন। তবে আমার বিচারে ৯/১১-এর ক্ষেত্রে অফিশিয়াল দুষ্কর্ম সম্ভবত আটটা ক্ষেত্রে ঘটেছে। পাঠক যাতে সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে পারেন, সে জন্য অভিযোগগুলোকে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজিয়ে নিচে উপস্থাপন করা হলো।

১. *ভুয়া কাহিনী দাঁড় করানো :* একটা সম্ভাব্য ধারণা—সন্ত্রাসীরা যাতে সহজেই হামলা চালাতে পারে, তার পক্ষে অফিশিয়ালরা কোনো ভূমিকা রাখেনি বা রাখবে বলে কেউ ভাবেওনি। তবে বাস্তবে যা ঘটেছে, তাকে আড়াল করতে তারা একটা ভুয়া কাহিনী ফেঁদেছে। সেটা হতে পারে জাতীয় নিরাপত্তার কথা ভেবে, অথবা সম্ভাব্য বিব্রতকর সত্য এড়াতে। নিজেদের এজেন্ডা পূরণে আক্রমণের সুযোগকে কাজে লাগাতে, অথবা আর কোনো কারণে। যদিও এটা খুব মারাত্মক অভিযোগ নয়, তবে জর্জ বুশ যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, অথবা নিজের পূর্ব নির্ধারিত এজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে যেতে; যেমন আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলা ইত্যাদিকে হালাল করতে ৯/১১ নিয়ে মিথ্যা বলে থাকেন, তাহলে তাঁকে ইমপিচ বা অভিসংশন করার জন্য এ অভিযোগ যথেষ্টই মারাত্মক ছিল।

২. *ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো কিছু একটা আশা করছিল :* দ্বিতীয় সম্ভাব্য ধারণা, যদিও আক্রমণ সম্পর্কে তাদের আগে থেকে নির্দিষ্ট কিছু জানা ছিল না—কিন্তু কিছু এজেন্সি; বিশেষ করে এফবিআই, সিআইএ এবং ইউএস মিলিটারির কিছু ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আশা করছিল কোনো এক ধরনের হামলা হবে। যদিও সেই হামলা পরিকল্পনায় তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না, তারপরও তারা সম্ভবত সেটাকে সহজতর করতে সহায়তা করেছে প্রয়োজনের সময় সঠিক পদক্ষেপটি না নিয়ে। অবশেষে (হোয়াইট হাউজের অজান্তে) কাজটা সম্পন্ন হলে তারা হোয়াইট হাউজকে ৯/১১-এর অপরাধ ধামাচাপা দিতে প্ররোচিত ও প্রভাবিত করে একটা ভুয়া কাহিনি দাঁড় করাতে এবং আফগানিস্তান ও ইরাকে আক্রমণ করার এজেন্ডা বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে

BanglaBook.org

৩. *ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো নির্দিষ্ট কিছু আশা করছিল* তৃতীয় সম্ভাব্য ধারণা, ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর কাছে (হোয়াইট হাউজ বাদে) হামলার সময় এবং লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য ছিল।

৪. *ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছিল* চতুর্থ সম্ভাব্য ধারণা, ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো (হোয়াইট হাউজ নয়) আক্রমণের পরিকল্পনার কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল।

৫. *পেন্টাগন পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছিল* পঞ্চম সম্ভাব্য ধারণা, পেন্টাগন (কিন্তু হোয়াইট হাউজ নয়) আক্রমণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে অংশ নেয়।

৬. *হোয়াইট হাউজ কিছু আশা করছিল :* ষষ্ঠ সম্ভাব্য ধারণা, যদিও সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে হোয়াইট হাউজের কাছে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য ছিল না, তবু ওই ধরনের কিছু ঘটার অপেক্ষায় ছিল হোয়াইট হাউজ। সেটাকে সহজতর করার ব্যাপারে তাদের ভূমিকাও ছিল, অন্তত হামলা প্রতিহত করার নির্দেশ না দিয়ে নীরব থাকার মধ্যে দিয়ে সেটাই প্রমাণ হয়। সেদিনের ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা আর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখে হোয়াইট হাউজ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থাকতে পারে, এই ধারণা সেই সম্ভাবনাকে সমর্থন করে।

৭. *হোয়াইট হাউজ ঘটনা জানত :* সপ্তম সম্ভাব্য ধারণা, হোয়াইট হাউজ আগে থেকে নির্দিষ্টভাবে জানত হামলার লক্ষ্যবস্তু এবং কখন হামলা হবে।

৮. *হোয়াইট হাউজ পরিকল্পনায় জড়িত ছিল :* অষ্টম সম্ভাব্য ধারণা, হোয়াইট হাউজ এই হামলার পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছিল।

এসব সম্ভাবনা থেকে ৯/১১-এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা যে সমস্ত 'দুষ্কর্ম' বা 'ষড়যন্ত্র' করেছেন, সেগুলোকে অনেক রকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখা যায়। যার অনেকগুলো পরিকল্পনার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত নয়, এবং সেসবের বেশিরভাগের সাথেই প্রেসিডেন্টের কোনোরকম সংশ্রব ছিল না। এই স্বাতন্ত্র্য একটা বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো অফিশিয়াল দুষ্কর্মের ধারণা নিয়ে। সে দুষ্কর্মের অভিযোগ উত্থাপিত অথবা প্রত্যাখ্যাত, যা-ই হোক; তা নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

এখানে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। জাঁ বেথকে এলশটাইন একটা অভিযোগকে 'প্রিপস্টারাস' বা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। অভিযোগটা ছিল: 'আমেরিকান অফিশিয়ালদের সবাই, এমনকি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত এই হামলা পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছেন নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে।'

এ কথা বলে এলটাইন প্রশাসনের অফিশিয়াল দুষ্কর্মের অভিযোগকে কেবল

BanglaBook.org

উপরের তালিকার অষ্টম, অর্থাৎ সম্ভাব্য সবচেয়ে জোরাল ধারণার সাথে সমান বিবেচ্যই করে তোলেননি, বরং তারা যে বিশেষ উদ্দেশ্যে এর সাথে নিজেদের জড়িয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে; নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়ানো—দুটোকে একাকার করে দিয়েছেন। এমন কঠিন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগকে 'প্রিপস্টারাস' বলে উড়িয়ে দিয়ে মহিলা হয়ত ভাবছেন, প্রশাসনের দুষ্কর্মের অভিযোগকে ধামাচাপা দেয়া গেছে। কিন্তু আরও অনেক সম্ভাবনা আছে এগুলো ছাড়া।

যেমন প্রখ্যাত বামপন্থী চিন্তাবিদ মাইকেল প্যারেনটিও প্রশাসনের বিরুদ্ধে কিছু কিছু দুষ্কর্মের অভিযোগ এনেছেন রাহুল মহাজনের মত। যেমন: হামলাটা এমন কায়দায় চালানো হয়েছে, যাতে সরকারের সংশ্লিষ্টতার সন্দেহ মানুষের মনে আপনাআপনিই জাগে। 'সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা ঘরের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ও বাইরের সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের ক্ষেত্রে এমন এক চমৎকার অজুহাত এনে দিয়েছে, যাতে মানুষের সন্দেহ জাগতেই পারে যে এর পিছনে আমেরিকান সরকারের হাত আছে।'

প্যারেনটি প্রথমে এমন সন্দেহকে মহাজনের মত পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন এই বলে, 'আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে, আফগানিস্তানে আক্রমণ করার ছুতা তৈরি করতে হোয়াইট হাউজ বা সিআইএ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনের ক্ষয়ক্ষতি এবং এত বেশি মানুষ হত্যা করতে পারে।'

সেখানেই থেমে থাকেননি প্যারেনটি। প্যাট্রিক মার্টিন কিছু তথ্যসহ এ ঘটনার সাথে আমেরিকান সরকারের জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করে একটা আর্টিকল লিখেছিলেন। প্যারেনটি সেই আর্টিকলের উপসংহার অনুমোদন করে বলেন, 'সরকার যদিও এ আক্রমণের খুঁটিনাটি পরিকল্পনা ও কয়েক হাজার মানুষ হত্যার সাথে জড়িত ছিল না, কিন্তু *কিছু একটা ঘটবে*, এই আশায় আরেকদিকে তাকিয়ে ছিল।' এভাবে প্যারেনটি এই তালিকার দ্বিতীয় অথবা ষষ্ঠ সম্ভাব্য ধারণার পক্ষে মত দিয়েছেন।

সে যাই হোক, আমার মনে হয়েছে সমালোচকরা একটা জোরাল *প্রাইমা ফেসি* বা প্রথম নজরেই দৃশ্যমান অভিযোগ দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। সেটা হলো, ৯/১১-এর পুরোটার ক্ষেত্রে না হলেও কিছু কিছু ঘটনার সাথে বুশ প্রশাসনের অফিশিয়াল দুষ্কর্মের সংশ্রব আছে। তবে তাদের অভিযোগ সঠিক, এমন দাবি করতে গেলে তাদের উপস্থাপন করা প্রমাণ যে নির্ভরযোগ্য, তারও নিশ্চয়তা থাকতে হবে। আমি যদিও তার পুনরাবৃত্তি করেছি। তবে সেটা সত্যি কি মিথ্যে, তা নিজের পক্ষে যাচাই করে দেখার সুযোগ হয়নি। কারণ এই প্রমাণ এত বেশি বিস্তৃত ও এমন প্রকৃতির যে খুব সংক্ষিপ্ত সময় আর সীমিত সম্পদ নিয়ে কারও একার পক্ষে কাজটা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আশা করি পাঠক নিশ্চয়ই তা বুঝবেন।

এ জন্যই আমি দাবি করছি সংশোধনবাদীরা অফিশিয়াল দুষ্কর্মের একটা জোরাল *প্রাইমা ফেসি* অভিযোগ উপস্থাপন করেছেন। যথেষ্টই জোরাল কেস এটা। যাদের সময় ও পর্যাপ্ত সম্পদ আছে; বিশেষ করে আমেরিকান প্রেস ও কংগ্রেস বিষয়টা তদন্ত করে দেখতে পারে। দেখা উচিত। যদি এখানে আলোচিত প্রমাণের উল্লেখযোগ্য অংশ সত্যি

BanglaBook.org

বলে প্রমাণ হয় শেষ পর্যন্ত, তাহলে ৯/১১-এর হামলার ব্যাপারে যে অফিশিয়াল দুষ্কর্ম জড়িত ছিল, সে অভিযোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া প্রশাসনের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

সে যাই হোক, ৯/১১-এর সাথে অফিশিয়াল দুষ্কর্মের সংশ্লিষ্টতার বিতর্ক হচ্ছে ক্রমবর্ধমান বিতর্ক। যার মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর একটা থেকে অন্যটা পুরোপুরি আলাদা। তবে প্রতিটা নির্দিষ্ট বিতর্কই বাকিগুলোকে সমর্থন করে এগিয়ে গেছে, অসংখ্য সরু তারের সমন্বয়ে তৈরি একটা মোটা কেবলের মতো। প্রতিটা তার মজবুত ও দৃঢ় করেছে কেবলটাকে। চলতে চলতে যদি মনে হয় কিছু তারের প্যাঁচ খুলে গেছে, তবু কেবল শেষ পর্যন্ত তার দৃঢ়তা ধরে রাখতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস।

দ্য নিউ পার্ল হারবার পড়তে বসে পাঠক বুঝবেন, ৯/১১-এর সাথে অফিশিয়াল দুষ্কর্ম জড়িত থাকার অনেক তারের উল্লেখ আছে এটায়। সেগুলোর এক-আধটাকে হয়ত যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মনে হবে না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে জন্য পুরো বিতর্কই অর্থহীন হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে এই ক্রমবর্ধমান বিতর্ক অল্প কয়েকটা তারের উপর নির্ভর করে হলেও এগিয়ে যেতে পারবে।

এবং এ কেবলের কিছু কিছু তার এতই মজবুত যে, যে সমস্ত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে সেগুলো দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলো যদি নিশ্চিত হয়, তাহলে একটা বা দুটো তারের সমর্থনেই এ বিতর্ক অনায়াসে চলতে পারে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ডেভিড রে গ্রিফিনের পরিচিতি

ডেভিড রে গ্রিফিন ৩০টি বই ও ১৬০ টি রচনা লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন। ১৭ বছর সানি (SUNY) সিরিজের সম্পাদনাও করেছেন তিনি, যার কন্সট্রাকটিভ পোস্ট মডার্ন থট-এর ৩১টি ভলিউম প্রকাশিত হয়েছে।

৯/১১ প্রসঙ্গে দুটো বই লিখেছেন গ্রিফিন: দ্য নিউ পার্ল হারবার—ডিস্টার্বিং কোয়েশ্চেনস অ্যাবউট দ্য বুশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ৯১/১১ (২০০৪), এবং দ্য ৯/১১ কমিশন রিপোর্ট—অমিশনস অ্যান্ড ডিসটরশনস (২০০৫)।

জন বি. কব জুনিয়র, রিচার্ড ফক, জোসেফ সি হগ, মাইকলে মিচার, রোজমেরি রুদার, জন ম্যাকমার্ট্রি, মারকাস রাসকিন, পিটার ডেল স্কট, গেরি স্পেন্স ও হাওয়ার্ড জিন প্রমুখ সত্যায়িত করেছেন তাঁর এই দুটি বই।

ডেভিড রে গ্রিফিন, ক্লেয়ারমন্ট স্কুল অব থিওলজির প্রফেসর, এমেরিটাস এবং সেখানকার সেন্টার ফর প্রসেস স্টাডিজের কো-ডিরেক্টর।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রথম খণ্ড

৯/১১

হাইজ্যাকারদের মিশন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১

ফ্লাইট ১১ ও ১৭৫ :
হাইজ্যাকারদের মিশন কিভাবে সফল হলো?

৯ সেপ্টেম্বর, ২০০১। সকাল ৮:৪৬ মিনিট। হাইজ্যাক করা একটা বোয়িং ৭৫৭ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের (WTC) উত্তর টাওয়ারের ওপর আছড়ে পড়ে। ৯:০৩ মিনিটে আরেকটা প্লেন আছড়ে পড়ে দক্ষিণ টাওয়ারে। তারপর ৯:৩৮ মিনিটে পেন্টাগনে আঘাত হানে ফ্লাইট ৭৭ বলে পরিচিত আরেক বোয়িং ৭৫৭।

অথচ তিনটা তো দূরের কথা, আমেরিকায় হাইজ্যাক হওয়া প্লেন মোকাবেলা করার যে পদ্ধতি চালু আছে, তা ঠিকমতো অনুসরণ করা হলে একটা প্লেনও টার্গেটে আঘাত করতে পারত না। এটাও পরিষ্কার নয় যে, সেদিন কিভাবে নিউ ইয়র্কে সন্ত্রাসীদের আক্রমণ সফল হলো এবং একটা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মত আকাশছোঁয়া একজোড়া বিল্ডিংকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে একশভাগ সফল হলো। এরপর আছে অস্বস্তিকর তৃতীয় এয়ারলাইনারের প্রসঙ্গ। পেন্টাগনে যেটা আঘাত করেছিল। সেটা কি সত্যি সত্যি প্লেন ছিল?

চতুর্থ অস্বস্তিকর প্রশ্ন—ওই প্লেনটাকেই কি গুলি করে মাটিতে ফেলে দেয়া হয়েছিল? সবশেষে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেদিনের ওঠা সমস্ত প্রশ্ন পরীক্ষা করার পর আমি নজর দেব প্রেসিডেন্ট বুশের সেদিনকার আচরণের কারণে যে সমস্ত প্রশ্নের উদয় হয়েছে, সেগুলোর দিকে।

তবে এই অধ্যায়ে কেবল ফ্লাইট ১১ ও ১৭৫ এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দুই টাওয়ার ধসে পড়া নিয়ে আলোচনা করা হবে।

BanglaBook.org

আমেরিকান এয়ারলাইনস ফ্লাইট ১১

হাইজ্যাক করা প্রথম প্লেনটি ছিল আমেরিকান এয়ারলাইনস (AA)-এর বোয়িং ৭৫৭। ফ্লাইট নাম্বার ১১। সকাল ৭:৫৯ মিনিটে ৮১ জন যাত্রী নিয়ে বোস্টন থেকে আকাশে ওঠে সেটা। ১৫ মিনিট পর, ৮:১৪ মিনিটের সময় এফএএ বা ফেডারাল এভিয়েশন

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয় ফ্লাইট ১১। ওটার রেডিও আর ট্রান্সপন্ডার নীরব হয়ে যায়।

ট্রান্সপন্ডার হচ্ছে বিশেষ এক ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস। সামরিক বা বেসামরিক, প্রতিটা প্লেনেই থাকে। নিচের গ্রাউন্ড কন্ট্রোলারের রেডার (Radar) স্ক্রিনে প্লেনের অবস্থান, উচ্চতা ইত্যাদি প্রতি মুহূর্ত জানান দিতে থাকে এই যন্ত্র। প্রয়োজনে চার ডিজিটের এমার্জেন্সি হাইজ্যাক কোডও গ্রাউন্ড কান্ট্রোলারকে পাঠাতে পারে।

এই ডিভাইস নীরব হয়ে যাওয়ার অর্থ প্লেনটাকে *হয়ত* হাইজ্যাক করা হয়েছে। ৮:২০ মিনিটে এফএএ গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের রেডারে ধরা পড়ে ফ্লাইট ১১ তার নির্দিষ্ট কোর্স থেকে সরে গেছে। ফলে আর *হয়ত* নয়, গ্রাউন্ড কন্ট্রোল ধরে নিতে বাধ্য হয় যে ওটাকে *সম্ভবত* হাইজ্যাকই করা হয়েছে। ৮:২১ মিনিটে ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টরা গ্রাউন্ড কন্ট্রোলকে টেলিফোনে জানায়, কিছু ছিনতাইকারী প্লেনটাকে ছিনতাই করেছে এবং কয়েকজন যাত্রীকে হত্যাও করেছে। ৮:২৮ মিনিটে প্লেনটা নির্দিষ্ট ফ্লাইট পাথ ছেড়ে নিউ ইয়র্কের দিকে ঘুরে যায়।

৮:৪৪ মিনিট, পেন্টাগন। ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফেল্ড রিপ্রেজেনটেটিভ ক্রিস্টোফার কক্সের সাথে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (AP) ভাষ্য অনুযায়ী ওই সময় কক্সকে বলছিলেন রামসফেল্ড, 'লেট মি টেল ইয়া, আই হ্যাভ বিন অ্যারাউন্ড দ্য ব্লক এ ফিউ টাইমস। দেয়ার উইল বি অ্যানাদার ইভেন্ট। দেয়ার উইল বি অ্যানাদার ইভেন্ট (আমি বলছি তোমাকে, এ পথে অনেকবার চলাফেরা করেছি আমি। আরও একটা ঘটনা ঘটবে। আরও একটা ঘটনা ঘটবে)।'

কথাগুলো যে রামসফেল্ড বলেছেন, রিপ্রেজেনটেটিভ ক্রিস্টোফার কক্স সে কথা নিজেই এপিকে জানিয়েছেন পরদিন, ১২ সেপ্টেম্বর। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। কেননা তার ঠিক দু' মিনিট পর, ৮:৪৬ মিনিটে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর টাওয়ারের ওপর আছড়ে পড়ে এএ ফ্লাইট ১১। সময়টা ছিল গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের মনে প্লেনটা *সম্ভবত হাইজ্যাক হয়েছে* সন্দেহ জাগার ৩২ মিনিট, এবং *নিঃসন্দেহে হাইজ্যাক হয়েছে* বোঝার ২৫ মিনিট পরের।

৯/১১-এর হামলার ব্যাপারে বুশ প্রশাসনের দেয়া ব্যাখ্যার বিরোধীরা মনে করেন, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্লেন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত ঘটনা কিছুতেই সফল হতে পারত না। কারণ এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার প্রচলিত যে নিয়ম-কানুন আছে, তা অনুসরণ করা হলে ফ্লাইট ১১ হাইজ্যাক হয়েছে, এমন *সন্দেহ* জাগার দশ মিনিটের মধ্যে ফাইটার জেট পাঠিয়ে সেটাকে ইন্টারসেপ্ট করা খুবই সম্ভব ছিল। সে সময় ফ্লাইট ১১-এর পাইলট যদি ফাইটার পাইলটের নির্দেশ না মানত, যদি কাছের এয়ারপোর্টে অবতরণ করতে রাজি না হতো, তাহলে সেটাকে গুলি করে ফেলে দেয়া যেত।

এ কাজটা ৮:২৪ মিনিটে, অথবা খুব বেশি দেরি হলে ৮:৩০ মিনিটের মধ্যেই সেরে ফেলা যেতে পারত। সে ক্ষেত্রে নিউ ইয়র্কের বুকে একটা প্লেনকে গুলি করে

BanglaBook.org

মাটিতে ফেলে দেয়া হবে কি হবে না, এমন প্রশ্ন তোলার সুযোগই থাকত না। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, ফেডারাল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FAA)-এর অ্যারোনটিক্যাল ইনফর্মেশন ম্যানুয়াল অফিশিয়াল গাইড টু বেসিক ফ্লাইট ইনফর্মেশন অ্যান্ড এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল প্রসিডিওরে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের প্রতি পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া আছে

> এয়ারক্র্যাফটের ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা দেখা দেবে তখন যখন সেটা রেডার থেকে হারিয়ে যাবে অথবা সেটার সাথে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে... ওই সময় আপনাকে বুঝতে হবে জরুরি পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। তখন এমনভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করবেন যেন সেটা সত্যিকারের জরুরি অবস্থা।

সেই অনুযায়ী ৮:১৪ মিনিটে যখন ফ্লাইট ১১-এর সাথে রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখনই কর্তৃপক্ষের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার পদক্ষেপ নেয়ার কথা ছিল। একই সাথে সেটার ট্রান্সপন্ডারের সিগন্যাল হারিয়ে ফেলার বিষয়টা দ্বিগুণ সন্দেহের কারণ হয়ে ওঠার কথা ছিল। গ্রাউন্ড কন্ট্রোলার যখন দেখতে পেল রেডিওতে প্লেনটার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না, তার উচিত ছিল তৎক্ষণাৎ পেন্টাগনের ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টার (NMCC) ও নর্থ আমেরিকান অ্যারোস্পেস ডিফেন্স কমান্ডকে (NORAD) খবরটা জানিয়ে দেয়া। তাহলে তারা কাছের সামরিক এয়ারবেস থেকে জেট ফাইটার পাঠাতে পারত ওটাকে ঠেকাতে।

নোরাড-এর মুখপাত্রদের মতে ফেডারাল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যখনই সন্দেহ জাগে যে ফ্লাইট ১১-এ কিছু একটা গোলমাল ঘটে গেছে, তখনই যদি পদক্ষেপ নেয়া হত, তাহলে 'মাত্র এক মিনিটের মতো' লাগত তাদের নোরাডের সাথে যোগাযোগ করতে। তাহলে নোরাড 'কয়েক মিনিটের মধ্যে' কাছের এয়ার ফোর্স বেজকে ফাইটার স্ক্র্যাম্বল করার বা হুড়োহুড়ি করে ফাইটার আকাশে পাঠানোর নির্দেশ দিতে পারত—সে আমেরিকার যেখানেই হোক না কেন।

আমেরিকান এয়ার ফোর্সের নিজস্ব ওয়েবসাইটে বলা হয়, সঠিক পন্থা অনুসরণ করে 'স্ক্র্যাম্বল অর্ডার' দেয়া হলে একটা এফ-১৫ মাত্র ২.৫ মিনিটের মধ্যে ২৫,০০০ ফুট উচ্চতায় উঠে যেতে পারে। তারপর ঘণ্টায় ১,৮৫০ নটিক্যাল মাইল গতিতে ছুটতে পারে। এই হিসেবে সেদিন যদি স্বাভাবিক নিয়ম মেনে চলা হতো, তাহলে ৮:২৪ মিনিটেই ফ্লাইট ১১-এর গতিরোধ করা যেত। খুব বেশি হলে না হয় আরও ৬ মিনিট লাগত। তাতেও ৮:৩০ মিনিটের মধ্যে কাজ সেরে ফেলা যেত। প্লেনটা উত্তর টাওয়ারে আছড়ে পড়ার ১৬ মিনিট আগে। তাছাড়া রেডিও সংযোগ ও ট্রান্সপন্ডার সিগন্যাল যদি হারিয়ে না-ও যেত, এবং ৮:২০ মিনিটে প্লেনটা নিজের কোর্স থেকে সামান্য দূরেও সরে যেত, তাহলেও নিয়ম অনুযায়ী এফএএ-এর মিলিটারিকে খবর দেয়ার কথা ছিল।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী প্রতিটা ফ্লাইটেরই নিজস্ব ফ্লাইট প্ল্যান থাকে। কিছু

BanglaBook.org

জিওগ্রাফিক পয়েন্টের পরম্পরা বা 'ফিক্স' থাকে তাতে। এবং সে প্ল্যান সময়মতো নির্দিষ্ট জায়গায় জমা দিয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়ার পরই পাইলটকে আকাশে ওঠার অনুমতি দেয়া হয় এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল থেকে। এ প্রসঙ্গে এমএসএনবিসি (MSNBC)-এর রিপোর্টে বলা আছে

> পাইলটদেরকে প্রতিটা ফিক্সে নির্ভুলভাবে 'হিট' করতে হয়। প্লেন যদি তার নির্দিষ্ট ফ্লাইট পাথ থেকে মাত্র ১৫ ডিগ্রিও এদিক-ওদিক সরে যায়, তাহলেই ফ্লাইট কন্ট্রোলারের 'প্যানিক বাটন' টিপে দিয়ে সেটাকে এই বলে সতর্ক করার কথা 'ফ্লাইট..., তুমি নির্দিষ্ট কোর্স থেকে সরে যাচ্ছ।' এবং তখন বিষয়টাকে সত্যিকারের এমার্জেন্সি হিসেবেই দেখা হয়।

কাজেই ফেডারাল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ৮:২০ মিনিটে ফ্লাইট ১১-এর কোর্স থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করে থাকে, তাহলেও ৮:৩০, বড়জোর ৮:৩৫ মিনিটের মধ্যে সেটাকে ইন্টারসেপ্ট করার কথা ছিল। এখানেও দেখা যাচ্ছে, ওটাকে নিউ ইয়র্কের দিকে যেতে বাধা দেয়ার জন্য যথেষ্টর চেয়েও বেশি সময় ছিল কর্তৃপক্ষের হাতে। এফএএ ম্যানুয়াল অনুযায়ী বিপথে চলতে থাকা প্লেনকে ইন্টারসেপ্ট করার পদ্ধতি কেমন হতো, স্বাধীন গবেষক নাফিজ মোসাদ্দেক আহমেদ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে

> ফাইটার এসে ইন্টারসেপ্ট করা ফ্লাইট ১১-এর নাকের সামনে, একটু ওপরে অবস্থান নিয়ে ডানে-বাঁয়ে ডানা দুলিয়ে সংকেত দিত—'ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছে তোমাকে।' জবাবে একইভাবে ডানা দুলিয়ে সেটাকেও পাল্টা বার্তা পাঠাতে হতো—আমি বুঝতে পেরেছি। এরপর ফাইটার ধীরগতিতে বাঁ দিকে ঘুরে গন্তব্যের দিকে যেত। ইন্টারসেপ্টেড প্লেনকেও সেটার পিছন পিছন যেতে হতো।

এভাবে ইন্টারসেপ্ট করার পরও যদি ফ্লাইট ১১ সাড়া না দিত, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গুলি করে ফেলে দেয়া হতো সেটাকে। এ ব্যাপারে নোরাড-এর মুখপাত্র মেরিন কর্পসের মেজর মাইক সিনডার জানিয়েছেন, ফাইটার প্লেন প্রায় দিনই কমার্শিয়াল প্লেন ইন্টারসেপ্ট করে থাকে।

> ইন্টারসেপ্ট করা প্লেনকে গ্রাজুয়েটেড রেসপন্স বা নমনীয়তার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ফাইটার তার ডানা দোলাতে পারে, অথবা সেটার নাকের সামনে দিয়ে এদিক-ওদিক ছুটে যেতে পারে। ভয় দেখাতে প্রয়োজন হলে কিছু ট্রেসারও ছুড়তে পারে। অথবা বিশেষ পরিস্থিতি দেখা দিলে মিসাইল ছুড়ে সেটাকে ভূপাতিতও করতে পারে।

BanglaBook.org

এ কারণেই সমালোচকরা প্রশ্ন তুলেছেন, কেন ফ্লাইট ১১-এর বেলায় এর কিছুই ঘটেনি? কেন সেটাকে ইন্টারসেপ্ট করা হয়নি?

এ ব্যাপারে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনি। ঘটনার ক'দিন পর, ১৬ সেপ্টেম্বর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা কমার্শিয়াল প্লেন ইন্টারসেপ্ট করব কি করব না, গুলি করে ভূপাতিত করব কি করব না, সেটা "প্রেসিডেন্ট পর্যায়ের সিদ্ধান্তের ওপর" নির্ভর করে।' সেদিন 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেছিলেন।

সমালোচকরা বলেন, তাঁর এ মন্তব্য 'ইন্টারসেপশন ও গুলি করে ফেলে দেয়া,' দুটো বিষয় সম্পর্কেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। ইন্টারসেপশন একটা রুটিন বিষয়, বছরে একশবারের বেশিও ঘটে থাকে। জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ-এর অ্যাকটিং চেয়ারম্যান জেনারেল রিচার্ড মেয়ার্সও এই বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। ১৩ সেপ্টেম্বর সিনেট আর্মস সার্ভিসেস কমিটিতে ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষী দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ডাব্লিউটিসি-এর দ্বিতীয় টাওয়ার আক্রান্ত হতে আমি নোরাডের কমান্ডার, জেনারেল এবারহার্টের সাথে কথা বলি। আমি তখন ভেবেছি আরও প্লেন আকাশে পাঠানো উচিত।'

ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনির মত তিনিও সেদিন দাবি করেন, 'কমার্শিয়াল ফ্লাইট ইন্টারসেপ্ট করতে ফাইটার জেট পাঠানো যায়, যদি সর্বোচ্চ পর্যায়ের কমান্ডারদের নির্দেশ থাকে।'

কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, আমেরিকায় কমার্শিয়াল প্লেন ইন্টারসেপ্ট করার ব্যাপারটা আজকাল প্রায় নিয়মিত একটা ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে গেলে অনেকটাই স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরের মতোই—যদি ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনির দাবি অনুযায়ী একটা প্লেনকে গুলি করে নামানো 'প্রেসিডেন্ট পর্যায়ের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল' হয়েও থাকে। অনেক গবেষক এ বিষয়ে একমত হলেও থিয়েরি মেইসান মিলিটারি রেগুলেশন অনুসারে যে দাবি করছেন, সেটা অন্য কথা বলে। যেমন তাতে বলা আছে

> প্লেন হাইজ্যাক করা হয়েছে বোঝা গেলে ফেডারাল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FAA) তৎক্ষণাৎ পেন্টাগনের ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টার (NMCC)-কে মেসেজ দেবে, তাদের সাহায্য চাইবে। তাতে 'দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ থাকলে' কমান্ড সেন্টার ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্সের (DOD) সহায়তার জন্য ডিফেন্স সেক্রেটারির অনুমোদন চাইবে।

BanglaBook.org

কাজেই দেখা যাচ্ছে হাইজ্যাক হওয়া প্লেন গুলি করে নামানো হবে কি হবে না, তার দায়-দায়িত্ব সেক্রেটারি অব ডিফেন্সের। তাছাড়া 'তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ থাকলে', এবং ডিফেন্স সেক্রেটারিকে ওই মুহূর্তে পাওয়া না গেলে 'দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের'

স্বার্থে অন্যরা তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারবে। ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স অনুসারে মেইসান জানাচ্ছেন

> দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধের মধ্যেই চেইন অব কমান্ডের বিষয় আছে। ভয়াবহ কোনো পরিস্থিতি দেখা দিলে এবং সে সময় সেক্রেটারি অব ডিফেন্স না থাকলে ডিওডি-এর কোনো দায়িত্বশীল অফিসার বা মিলিটারি কমান্ডার যাতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়ে নিরীহ মানুষের ভোগান্তি, সম্পদ বা প্রাণহানি ঠেকাতে পারে। 'দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ থাকলে' কথাটার মধ্যে সেটাই বোঝানো হয়েছে।

সেই অনুযায়ী ডিওডি-এর লাইন অব কমান্ডে অনেকেই আছে যাদের সেদিন নিরীহ মানুষের ভোগান্তি, সম্পদ ও প্রাণহানির শঙ্কা এড়িয়ে যাওয়া কর্তব্য ছিল। কেননা এএ ফ্লাইট ১১ উত্তর টাওয়ারে আছড়ে পড়ায় এর সবকিছুই ঘটেছিল।

ইউনাইটেড এয়ারলাইনস ফ্লাইট ১৭৫

ইউএ ফ্লাইট ১৭৫ বোস্টন থেকে ৫৬ জন যাত্রী নিয়ে সকাল ৮:১৪ মিনিটের সময় আকাশে ওঠে। ঠিক যখন এফএএ জানতে পারে এএ ফ্লাইট ১১ হাইজ্যাক হয়ে গেছে। ৮:৪২ মিনিটের সময় ফ্লাইট ১৭৫-এর রেডিও ও ট্রান্সপন্ডার বন্ধ হয়ে যায় এবং সেটাও নির্দিষ্ট কোর্স ছেড়ে সরে যেতে থাকে। ততক্ষণে জানাজানি হয়ে গেছে আগের ফ্লাইটটা হাইজ্যাক হয়ে গেছে এবং নিউ ইয়র্কের দিকে চলেছে।

এদিকে ফ্লাইট ১৭৫-এর কোর্স ছেড়ে সরে যাওয়ার কথা এক মিনিট পর, ৮:৪৩ মিনিটে নোরাডকে জানায় এফএএ। সেই হিসেবে ৮:৫৩ মিনিটের মধ্যেই প্লেনটাকে ইন্টারসেপ্ট করার কথা ছিল নোরাডের। এর ৭ মিনিট আগে ফ্লাইট ১১ ডাব্লিউটিসি-র উত্তর টাওয়ারে আঘাত করেছে। কাজেই নোরাডের তখন ফাইটার রেডি রাখার কথা ছিল দ্বিতীয় প্লেনটাকে ইন্টারসেপ্ট অথবা ভূপাতিত করার জন্য। কিন্তু ইন্টারসেপ্ট করা হয়নি ইউএ ফ্লাইটকে। ৯:০৩ মিনিটে সেটাও বিনা বাধায় ডাব্লিউটিসি-র দক্ষিণ টাওয়ারে ভেঙে পড়ে।

দ্বিতীয় ক্র্যাশের ঘটনার সাথে একটা ভীষণ অস্বস্তিকর বিষয় জড়িত আছে। বিশেষ করে সেই ঘটনায় নিহতদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বিষয়টা আজও রীতিমতো জবর এক ধাঁধা হয়ে আছে। সেটা হলো ৮:৫৫ মিনিটে দ্বিতীয় টাওয়ারের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে অজ্ঞাত কেউ বারবার ঘোষণা করতে থাকে যে দক্ষিণ টাওয়ার নিরাপদ। ভয়ের কোনো কারণ নেই। সবাই যেন নির্ভয়ে যার যার কাজে যোগ দেয়। জানা যায়, ফ্লাইট ১৭৫ আছড়ে পড়ার কয়েক মিনিট আগে পর্যন্ত এই ঘোষণা চলে। সম্ভবত পরবর্তীতে সরকারী ব্যাখ্যার 'টু দ্য ডেথস অব হান্ড্রেডস অব পিপলস্' কথাটাকে কাজে পরিণত করতে।

BanglaBook.org

পল থম্পসন এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন: আনুমানিক ৮:৪৩ মিনিটে নোরাডকে জানানো হয় ফ্লাইট ১৭৫ হাইজ্যাক হয়েছে এবং সেটা নিউ ইয়র্কের দিকে আসছে। তাহলে দক্ষিণ টাওয়ারের লোকজনকে কেন নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার কথা বলা হয়নি? অস্বস্তিকর প্রশ্ন। থম্পসনের ধারণা, সম্ভবত হাইজ্যাকাররা ছাড়া আরও কেউ এর সাথে জড়িত ছিল। যে বা যারা চাইছিল পরের টাওয়ারের ঘটনায় যেন যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়।

ফ্লাইট ১১-এর ১৭ মিনিট পর ফ্লাইট ১৭৫ দক্ষিণ টাওয়ারে বিধ্বস্ত হয়। অথচ সেটাকে ঠেকানোর জন্য কোনো চেষ্টাই নেয়া হয়নি। এ ক্ষেত্রের স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর কেন এমনভাবে ভেঙে পড়ল, কিছুতেই মাথায় আসে না। এয়ার কন্ট্রোলাররা একজনও সতর্ক ছিল না, আশপাশের মিলিটারি বেজগুলোর একজন পাইলটও সতর্ক ছিল না—কিভাবে সম্ভব তা? ১৭৫-এর লাইন ছেড়ে বেলাইনে চলে যাওয়া দেখেও কি কেউ বুঝতে পারেনি যে ওটা হাইজ্যাক হয়ে থাকতে পারে? ওটাকে ইন্টারসেপ্ট, নয়ত গুলি করতে হবে?

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করার আছে। ওই সময়ে নোরড-এর নর্থইস্ট এয়ার ডিফেন্স সেক্টরের সমস্ত টেকনিশিয়ান 'হেডসেট পরা অবস্থায় ছিল।' বোস্টনের এফএএ-র সঙ্গে সংযোগ ছিল তাদের এবং ফ্লাইট ১১ সম্পর্কে সব খবর ততক্ষণে জানা হয়ে গিয়েছিল সবার। কাজেই প্রায় নিশ্চিতভাবেই ধরে নেয়া যায় পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবহিত ছিল নোরাড। সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর হলো, দক্ষিণ টাওয়ার আক্রান্ত হওয়ার ৩৫ মিনিট পর, ৯:৩৮ মিনিটে পেন্টাগনে হামলা হয় কিভাবে?

তৃতীয় ফ্লাইটের ব্যাপারে আমরা পরের অধ্যায়ে জানার চেষ্টা করব। আমাদের এখনকার কাজ হলো প্রথম দুই ফ্লাইটের হামলা সম্পর্কে সরকারী ব্যাখ্যা ও সমালোচকদের জবাব নিয়ে আলোচনা করা।

কেন ইন্টারসেপ্ট করা হয়নি ফ্লাইট ১১ ও ১৭৫?

অফিশিয়াল ব্যাখ্যার সমালোচকরা বলছেন, ৯/১১-এর ব্যাপারে সরকারী ব্যাখ্যার সবচেয়ে আজব দিক হলো, সেটার একাধিক ভার্শন বা সংস্করণ আছে। ১৩ সেপ্টেম্বর সিনেট আর্মড সার্ভিসেস কমিটিতে সাক্ষী দিতে গিয়ে জেনারেল মেয়ার্স বলেন হুমকির স্বরূপ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ামাত্র আমরা ফাইটার ক্র্যাম্বল-এর নির্দেশ দিই।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, নির্দেশটা কি পেন্টাগনে হামলা হওয়ার আগে দেয়া হয়েছিল, না পরে?

তিনি জবাব দেন আমি যতদূর জানি পেন্টাগনে হামলা হওয়ার পরে নির্দেশটা দেয়া হয়েছিল। সমালোচকরা এই স্টেটমেন্টের ব্যাপারে একটা গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন তা হলো, এনএমসিসি-র অফিশিয়ালরা ৯:৩৮ মিনিটে পেন্টাগনে তৃতীয় প্লেন হামলা চালানোর অনেক আগেই জেনেছিলেন 'হুমকিটা কতখানি মারাত্মক।' তারপরও কেন

BanglaBook.org

ব্যবস্থা নেয়া হয়নি?

বিষয়টা ৮:৪৬ মিনিটেই স্পষ্ট হয়ে যায়। যখন প্রথম এএ ফ্লাইট ১১ ডাব্লিউটিসির উত্তর টাওয়ারের ওপর বিধ্বস্ত হয় এবং আরও একটা প্লেন; ফ্লাইট ১৭৫-ও একইদিকে যাচ্ছে বলে জানা যায়। আরেক সমস্যা হলো, এনএমসিসি ও নোরাড-এর কর্মকর্তাদের 'হুমকিটা কতখানি মারাত্মক', তা পুরোপুরি বোঝার জন্য সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজনও ছিল না। কেননা ততক্ষণে ফ্লাইট ১১ ও ১৭৫-কে ইন্টারসেপ্ট করার জন্য আকাশে জেট ফাইটারের থাকার কথা ছিল। এবং সেগুলোর দায়িত্ব ছিল ওয়াশিংটনমুখী যে কোনো অননুমোদিত ফ্লাইটকে বাধা দেয়া। স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরই যথেষ্ট ছিল সে জন্য।

বুশ প্রশাসনের ব্যাখ্যা অন্য দুই অফিশিয়ালের মুখ থেকেও উচ্চারিত হয়েছে ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর। ১৫ সেপ্টেম্বর *বোস্টন গ্লোব*-এ নোরাড মুখপাত্র মেজর মাইক সিন্ডারের বক্তব্য ছাপা হয়। তিনি জানান, পেন্টাগনে হামলা না হওয়া পর্যন্ত কোনো ফাইটার স্ক্র্যাম্বল করেনি। এছাড়া ১৬ সেপ্টেম্বর ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনির সাথে উল্লিখিত সংবাদ সম্মেলনে টিম রাসেট বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা প্রথম হাইজ্যাকের খবর ৮:২০ মিনিটে জানতে পারা সত্ত্বেও পেন্টাগনের ওপর হামলা ঠেকাতে সময়মতো জেট ফাইটার স্ক্র্যাম্বল করার ব্যবস্থা নিতে পারিনি। ডিক চেইনি তার এ মন্তব্যের সাথে দ্বিমত করেননি।

১৫ তারিখের *বোস্টন গ্লোবে* সে খবরের হেডিং ছিল ওটিস ফাইটার জেটস স্ক্র্যাম্বলড্ টু লেট টু হল্ট দ্য অ্যাটাকস।

মাইক সিন্ডারের কথায় যে বিষয়টা ফুটে উঠেছে, তা হলো সেদিনকার 'মিলিটারি বিহেভিয়ার' ছিল স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওরের সম্পূর্ণ বিপরীত। একটা প্লেন হাইজ্যাক হয়েছে সন্দেহ হওয়ামাত্র সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছিল, কিন্তু তারপরও জেট স্ক্র্যাম্বল করেনি। ডিক চেইনি আর মেয়ার্স যা-ই বলে থাকুন না কেন, জেট ফাইটার স্ক্র্যাম্বল করাতে উপর মহলের নির্দেশের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। বরং পরিস্থিতি বিচার করে মনে হয়, উপর মহল থেকে স্ক্র্যাম্বল *না* করার নির্দেশই দেয়া হয়েছিল।

এ সন্দেহের স্বপক্ষের প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, সাংবাদিক ইলারিয়ন বাইকভ ও জারড্ ইসরায়েল এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ১১ সেপ্টেম্বর স্ট্যান্ডার্ড এমার্জেন্সি সিস্টেম সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। তাঁরা নিজেদের লেখা *গিল্টি ফর ৯-১১* বইতে মন্তব্য করেন 'এরকম হতে পারে তখন, খুব উঁচু পর্যায়ের কর্মকর্তারা যখন গোপনে, একজোট হয়ে স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর ব্যর্থ করতে কলকাঠি নাড়েন।'

ঘটনার কয়েকদিন পর নোরাড বলতে শুরু করে তারা প্লেন আকাশে উঠিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য যে সমালোচকদের কাছে এই অজুহাত প্রথমটার মতই পরম বিস্ময়কর ঠেকে।

এই বক্তব্যের বিপরীতে বলা যায়, ৮:৪০ মিনিটের আগে এফএএ ফ্লাইট ১১ হাইজ্যাক হওয়া সম্পর্কে নোরাডকে কিছু জানায়নি। প্লেনটার রেডিও আর ট্রান্সপন্ডার অফ হয়ে যাওয়ার ২৬ মিনিট পরের এবং সেটার নির্দিষ্ট কোর্স থেকে সরে যাওয়ার দীর্ঘ

BanglaBook.org

২০ মিনিট পরের কথা এটা। এ প্রসঙ্গে অ্যালান উড ও পল থম্পসন লিখেছেন

> নোরাড-এর এই দাবি কি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হওয়ার কোনো কারণ আছে? কথাটা সত্যি হলে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের নিঃসন্দেহে বরখাস্ত করা হতো। নির্দেশ পালন না করার অভিযোগে ক্রিমিন্যাল চার্জ আনা হতো তাদের বিরুদ্ধে। সেদিন সংশ্লিষ্ট প্রায় সবাই তাদের দায়িত্ব পালনে ফাঁকি দিয়েছে... নোরাড-এর দাবি যদি মিথ্যে হয়, এফএএ-এর রেগুলেশনে বেঁধে দেয়া টাইম ফ্রেম অনুযায়ী তাদেরকে যদি সময়মতোই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে তারা প্রায় ত্রিশ মিনিট হাত গুটিয়ে বসে ছিল এবং একটা কমার্শিয়াল ফ্লাইট নিজের কোর্স ছেড়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ভিড়াক্রান্ত এয়ারস্পেস অতিক্রম করে নিজের লক্ষ্যের দিকে ধেয়ে গেছে। এর ফলে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ গঠন করা যেতে পারত এফএএ ও নোরাড-এর কর্তাদের বিরুদ্ধে। শাস্তি হতে পারত। কিন্তু কিছুই ঘটেনি।

এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেয়া এটাই প্রমাণ করে, হয় এসব বানানো কেচ্ছা, নয়ত এফএএ আর নোরাড উপরের নির্দেশেই হাত গুটিয়ে বসে থেকেছে।

এ প্রসঙ্গে আরও কথা আছে। নোরাড প্লেন হাইজ্যাকিঙের খবর পাওয়ার পর পুরো ছয় মিনিট নিশ্চুপ ছিল। ৮:৪৬ মিনিটের আগে ফাইটার স্ক্র্যাম্বল করার নির্দেশ দেয়নি। আরও আছে, নোরাড ফাইটার 'স্ক্র্যাম্বল করার নির্দেশ' দেয় ১৮০ মাইল দূরের কেপ কড ওটিস এয়ার ন্যাশনাল গার্ড বেজকে। অথচ মাত্র ৭০ মাইল দূরেই ছিল নিউ জার্সির এয়ার ফোর্স বেজ।

কেন এমন নির্দেশ সেদিন দেয়া হয়েছিল, সেটাও আরেক জবর রহস্য। তবে ওটিস বেজ থেকে জেট ফাইটার স্ক্র্যাম্বল করলেও কিছু আসত-যেত না। যা ঘটেছে, তা কিছুতেই ঠেকানো সম্ভব হতো না। কেননা তারা স্ক্র্যাম্বল করার নির্দেশ যদি পেয়ে থাকেও, পেয়েছে ৮:৪৬ মিনিটের সময়। ঠিক সেই সময়ই উত্তর টাওয়ারে আঘাত হানে ফ্লাইট ১১। নোরাড জানায়, এফএএ তাদেরকে ফ্লাইট ১৭৫ হাইজ্যাক হওয়ার খবর দিয়েছে ৮:৪৩ মিনিটের সময়। তাই ৮:৪৬ মিনিটে যে দুটো এফ-১৫ স্ক্র্যাম্বল করে, সে দুটোকে ১৭৫-কে ইন্টারসেপ্ট করতে পাঠানো হয়। কিন্তু ব্যাখ্যাতীত কোনো কারণে নির্দেশ পাওয়ার পরও ছয় মিনিট দেরি করে, ৮:৫২ মিনিটে আকাশে ওঠে এফ-১৫ দুটো।

সে যাই হোক, সমালোচকদের দৃষ্টিতে এই উপাখ্যানের সবচেয়ে অদ্ভুত দিক হচ্ছে নিজেদের ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেও কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা। যেমন, কেন নোরাড-এর 'নির্দেশ' পালনে দেরি হলো জেট ফাইটারের? ফ্লাইট ১৭৫ দক্ষিণ টাওয়ারে বিধ্বস্ত হয় ৯:০৩ মিনিটে। ফাইটারগুলো যদি ৮:৫২ মিনিটে স্ক্র্যাম্বল করেও থাকে, তাহলে পুরো ১১ মিনিট সময় ছিল হাতে। তারপরও এই সামান্য পথ পাড়ি দিতে কেন ব্যর্থ হলো শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বলে পরিচিত এফ-১৫? এর কি জবাব আছে?

BanglaBook.org

দুটোর মধ্যে একটা ফাইটারের পাইলট, লেফটেন্যান্ট কর্নেল টিমোথি ডাফি পরে সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন, নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত পুরোটা পথ তিনি 'ফুল ব্লোয়ারে' প্লেন ছুটিয়েছেন। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ১,৮৭৫ নটিক্যাল মাইল বেগে ধেয়ে গেছেন তিনি ফ্লাইট ১৭৫-এর পথরোধ করতে। এই গতিতে চললে এফ-১৫ জেট ফাইটার মিনিটে ৩০ মাইলেরও বেশি অতিক্রম করতে পারে। কাজেই স্ক্র্যাম্বল করার অর্ডার পাওয়া থেকে আকাশে ওঠা পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড সময় যদি ২.৫ মিনিট হয়, এবং তারপর যদি জেট ওই গতিতে ছোটে, তাহলে ৮ মিনিটের মধ্যে তাদের ম্যানহাটনের আকাশে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল। সে ক্ষেত্রে তাদের হাতে ফ্লাইট ১৭৫-কে ভূপাতিত করার জন্য পুরো ৩ মিনিট সময় থাকত।

অথচ বুশ প্রশাসনের ৯/১১ সংক্রান্ত অফিশিয়াল ব্যাখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে আমরা জানতে পারি, ফ্লাইট ১৭৫ যখন দক্ষিণ টাওয়ারে বিধ্বস্ত হয়, তখন সেগুলো ঘটনাস্থল থেকে ৭০ মাইল দূরে ছিল। এ বিষয়ে নোরাড যে টাইমলাইন দিয়েছে, তাতে দেখা যায় জেটগুলোর নিউ ইয়র্ক পৌঁছতে সময় লাগে ১৯ মিনিট। কাজেই ওটিস থেকে ছুটে আসার গল্প যদি সত্যি হয়, তাহলে বুঝতে হবে ফুল ব্লোয়ারে নয়, অনেক ধীর গতিতে এসেছে সেগুলো। সর্বোচ্চ গতিসীমা যতই হোক, সেদিন তার অর্ধেক গতিতে, অর্থাৎ ৭০০ মাইলের চেয়ে কিছু বেশি গতিতে এসেছে সেগুলো।

তাছাড়া যদি ধরে নেয়া হয় কোনো কারণে সত্যি সত্যি ফাইটার প্লেনের পৌঁছতে দেরি হয়ে গেছে, তাহলে প্রশ্ন উঠবে ৭০ মাইল দূরের নিউ জার্সি এয়ার বেজ রেখে ১৮০ মাইল দূরের ওটিস এয়ার বেজকে কেন স্ক্র্যাম্বল করার নির্দেশ দেয়া হলো? এ প্রসঙ্গে নাফিজ আহমেদ বলেন, এফ-১৫ যদি নিজেদের স্বাভাবিক গতিতে ছুটত, তাহলে নিউ জার্সি থেকে ৩ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে নিউ ইয়র্কের আকাশে পৌঁছে যেতে পারত। তাহলে দ্বিতীয় প্লেনটাকে ঠেকিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কোনো সমস্যাই হতো না। কাজেই সমালোচকরা সমাপ্তি টেনেছেন এই বলে, যদি দ্বিতীয় কাহিনীকে সত্যি বল ধরে নেয়া হয়, তাহলে ডাব্লিউটিসি-র দক্ষিণ টাওয়ার অক্ষতই থেকে যেত। সবশেষে, দ্বিতীয় প্লেনটাকে প্রতিহত করতে জেট ফাইটার স্ক্র্যাম্বল করেছিল বলে যে দাবি করা হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে প্রথমটার বেলায় কেন প্রচলিত রীতি অনুসরণ করা হয়নি?

তাছাড়া অফিশিয়াল ব্যাখ্যার এই দ্বিতীয় সংস্করণকে সত্যি ধরে নিলেও ধাঁধা একটা থেকে যায়। সেটা হলো ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনি, জেনারেল মেয়ার্স ও নোরাড-এর মুখপাত্র মেজর মাইক সিন্ডার প্রথমে কেন দাবি করেছিলেন পেন্টাগন আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো জেট স্ক্র্যাম্বল করেনি?

সমালোচকদের মধ্যে যাদের সামরিক অভিজ্ঞতা আছে, তাদের অনেকে মনে করেন ব্যাখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ ভুয়া। বানোয়াট। বিশেষ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। অবসরে যাওয়া মাস্টার সার্জেন্ট, স্টান গফ ওয়েস্ট পয়েন্টে মিলিটারি সায়েন্স শেখান। তিনি জোর দিয়ে দাবি করেছেন, পেন্টাগন আক্রান্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত কোনো ফাইটার স্ক্র্যাম্বল করেনি। জার্মান ডিফেন্স মিনিস্ট্রির সাবেক স্টেট সেক্রেটারি আন্দ্রিয়াস

BanglaBook.org

ফন বিউলো বলেছেন 'মিলিটারি ও ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো সেদিন একান্ত জরুরি প্রয়োজনের সময় ফাইটারগুলোকে পুরো ৬০ মিনিট মাটিতে বসিয়ে রেখেছিল।'

হামলা সম্পর্কে দুই অফিশিয়াল ব্যাখ্যার যেটাকেই সত্যি বলে ধরে নেয়া হোক না কেন, স্বাভাবিক পরিস্থিতি বহাল থাকলে এর কোনোটারই সফল হওয়ার কথা ছিল না। রাশিয়ান এয়ার ফোর্সের কমান্ডার-ইন-চিফ, আনাতোলি করনুকভ এই ধারণা সমর্থন করেছেন। ৯/১১-এর হামলার পরদিন করনুকভ মন্তব্য করেন 'গতকাল আমেরিকায় যে অচিন্তনীয় সন্ত্রাসী হামলা ঘটেছে, সাধারণ পরিস্থিতিতে তা কিছুতেই ঘটতে পারত না। আমার দেশে তেমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে টের পাওয়ামাত্র আমাকে জানানো হতো এবং এক মিনিটের মধ্যে আমি সবাইকে নিয়ে স্ক্র্যাম্বল করতাম। প্রাভদার অনলাইন সংস্করণে ১৩ সেপ্টেম্বর আনাতোলি করনুকভের এই মন্তব্য প্রকাশ করা হয়।

করনুকভের মন্তব্যের বিষয়টি উল্লেখ করে নাফিজ আহমেদ বলেন 'সবাই জানে রাশিয়ান এয়ার ফোর্সের তুলনায় ইউএস এয়ার ফোর্স অনেক বেশি আধুনিক।' কাজেই এ কথা থেকে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়, সর্বোচ্চ মহলের হস্তক্ষেপ ছাড়া এমন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতেই পারে না। প্রচলিত অপারেটিং প্রসিডিওর স্থগিত রাখা হলেই কেবল এমন কিছু ঘটা সম্ভব।

> ১১ সেপ্টেম্বর স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (SOP) কমপ্লিটলি অ্যান্ড ইনেক্সপ্লিকেবলি, সম্পূর্ণভাবে এবং অমার্জনীয়ভাবে রহিত করা হয়েছিল। এমন কাণ্ড এর আগে কখনোই ঘটেনি। এরপর স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পৃক্ত এরকম রুটিন এমার্জেন্সি রেসপন্স রুলস সেদিন নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল কার নির্দেশে?

কার নির্দেশে, তা নিয়ে বাইকভ ও জারড্ ইসরায়েলের তেমন সন্দেহ নেই। তাঁরা বলেন

> রুটিন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখানো সর্বোচ্চ মহলের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছুতেই সফল হতে পারে না। গোটা বিষয়টার মধ্যে সুপ্রিম ইউএস মিলিটারি কমান্ডের দৃশ্যত নিষ্ক্রিয় থাকার তো প্রশ্নই আসে না। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ডোনাল্ড রামসফেল্ড এবং এয়ার ফোর্স জেনারেল রিচার্ড বি. মেয়ার্স এই কমান্ডের অন্তর্ভুক্ত।

এ ক্ষেত্রে যে গুরুতর প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে আসে, তার মুখোমুখি না হয়ে উপায় নেই। জর্জ বুশ, রামসফেল্ড আর মেয়ার্সের 'স্ট্যান্ড ডাউন' অবস্থায় থাকার নির্দেশ ছাড়া আমেরিকার এয়ার ফোর্স কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারত? ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় কোনো হাইজ্যাক করা প্লেন হামলা চালাতে পারত?

সবকিছু মিলিয়ে ফ্লাইট ১১ ও ফ্লাইট ১৭৫ প্রশ্নে সমালোচকরা যে উপসংহার টেনেছেন, তাতে অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্নই উঠে আসে। আরও অস্বস্তিকর প্রশ্ন ওঠে

BanglaBook.org

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দুই টাওয়ারের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়া নিয়ে। তবে এটাও ঠিক যে আমি অনেক প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছি। তার একটা হলো এই দুই ফ্লাইট কারা পাইলট করেছিল? হাইজ্যাকাররা, নাকি রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে গাইড করা হয়েছিল সেগুলোকে—সম্ভবত গ্লোবাল হক (Hawk) টেকনোলজির ব্যবহার করে? আমেরিকান ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট গত এক দশকে এই ব্যবস্থার অনেক উন্নতি করেছে। ১৯৯৭ সাল থেকে তাদের গাইডেড প্লেন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়; বিশেষ করে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় দায়িত্ব পালন করছে। বিনা পাইলটে উড়ছে, ল্যান্ড করছে। রকেট লঞ্চার ছুড়ছে।

থিয়েরি মেইসানের দৃঢ় বিশ্বাস পরেরটাই ঠিক। কারণ বুশ প্রশাসনের অফিশিয়াল ব্যাখ্যার দাবি অনুযায়ী ওগুলোর পাইলটরা যদি অ্যামেচারই হয়ে থাকে, তাহলে তাদের পক্ষে বিশাল আকারের বোয়িং এয়ারলাইনার নিয়ে এত নিচে এসে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মত অপেক্ষাকৃত সরু টার্গেটের উপর নির্ভুলভাবে আঘাত হানা সম্ভব হতো না। তা-ও আবার যখন তাদেরকে 'বাধ্য করা হয় বাতাসের বিপরীতে অত্যন্ত কঠিন বাঁক নিতে।'

অনেক পেশাদার, অভিজ্ঞ পাইলটের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, বেশি অভিজ্ঞ কেউ কেউ চেষ্টা করলে হয়ত ওরকম টার্ন নিতেও পারবেন। কিন্তু অ্যামেচারদের ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই। এদিকে পল থম্পসন নতুন কিছু তথ্য হাজির করে বলছেন এএ ফ্লাইট ১১, ইউএ ফ্লাইট ১৭৫ এবং এএ ফ্লাইট ৭৭, তিনটাই ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল বা আন্তঃমহাদেশীয় ফ্লাইট ছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে ওইদিন তিন ফ্লাইটেই যাত্রী ছিল বিস্ময়কর রকম অল্প। যথাক্রমে ৮১ জন, ৫৬ জন এবং ৫৮ জন।

আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, তিন ফ্লাইটেই অন্তত একজন করে রেথিয়ন'স ডিভিশন অব ইলেক্ট্রনিকস ওয়ারফেয়ার-এর সিনিয়র অফিশিয়াল ছিল। গ্লোবাল হক টেকনোলজি উন্নতির কাজ এই প্রতিষ্ঠানই করেছিল। ধরে নেয়া যায়, তারা ইচ্ছে করে নিজেদের জীবন কোরবানী করেননি। এই কৌতূহল জাগানো সত্য সম্ভবত একটা বিষয়কেই নির্দেশ করে, তা হলো ফ্লাইট ১১ ও ১৭৫ টুইন টাওয়ারে হামলা করেনি। যেগুলো করেছে, সেগুলো হয়ত মিলিটারি প্লেন ছিল।

মূলত ভিডিও ফুটেজের উপর নির্ভর করে আরও অনেকেই এই মত দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে নতুন একটা প্রশ্ন উঠবে, তাহলে ফ্লাইট ১১ ও ১৭৫-এর যাত্রীদের পরিণতি আসলে কি হয়েছিল?

পরে জানা গেছে পেন্টাগনে বিধ্বস্ত হওয়া এয়ার ক্র্যাফট আসলে ফ্লাইট ৭৭ ছিল না; ফলে সেই ফ্লাইট এবং সেটার যাত্রীদের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে—সেরকম কিছু ঘটেছে ফ্লাইট ১১ ও ১৭৫-এর বেলায় (২নং অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে)? এই থিয়োরি অনুযায়ী বোঝা যায়, অভিযুক্ত হাইজ্যাকাররাই ফ্লাইট ট্রেইনিং দিয়েছিল একটা গ্রহণযোগ্য কাহিনী দাঁড় করানোর স্বার্থে (এ নিয়ে অধ্যায় ৬ ও ৮-এ আলোচনা করা হয়েছে)।

BanglaBook.org

টাওয়ারগুলোর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়া

অফিশিয়াল ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ডাব্লিউটিসি-র উত্তর ও দক্ষিণ টাওয়ার (টুইন টাওয়ার) বিধ্বস্ত হয়েছে প্লেনের ধাক্কায় এবং তীব্র আগুনের ভয়াবহ তাপে ভবনের কাঠামো গলে যাওয়ায়। 'অফিশিয়াল ব্যাখ্যা' বলা হলেও আমি তার সাথে যোগ করতে চাইব, কথাটার অর্থ এই নয় যে সেই ব্যাখ্যাকে কোনো অফিশিয়াল বডি সত্যায়ন বা অনুমোদন করেছে।

ফেডারাল এমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (FAMA)-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ডাব্লিউটিসি বিল্ডিং বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করার। ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে ২০০২ সালের মে মাসে এফএএমএ তার অনুসন্ধানের রিপোর্ট পেশ করে। তাতে বলা হয়েছিল 'কি কারণে ভবনগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।'

তবে এফএএমএ-র রিপোর্টে অনেক অনুমান নির্ভর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল, যেগুলো পরোক্ষভাবে অফিশিয়াল ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। যারা ভেতরের খবরাখবর রাখেন, তাদের প্রায় সবাই এফএএমএ-র ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিল ম্যানিং 'সেলিং আউট দ্য ইনভেস্টিগেশন' শিরোনামের এক আর্টিকলের মাধ্যমে সে রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেন। নিউ ইয়র্ক ফায়ার ডিপার্টমেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ম্যাগাজিন, *ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং*-এ তার লেখাটি ছাপা হয়।

ম্যানিং দাবি করেন, ইঞ্জিনিয়াররা বিশ্বাস করেন, 'প্লেনের আঘাতে ভবনের কাঠামোর ক্ষতি হয়েছে আর বিস্ফোরণের ফলে জেট ফিউয়েলে ভয়াবহ আগুন ধরে গেছে বলে ডাব্লিউটিসি-র টাওয়ার ভূপাতিত হয়েছে, কথাটা মোটেই ঠিক নয়।' এবং এই লাইনের বিশ্বাসীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এরমধ্যে আরও অনেক আপত্তি এসেছে 'অফিশিয়াল থিয়োরির' ব্যাপারে। এসব আপত্তির বেশিরভাগই একটা বিশেষ সমস্যা নিয়ে। সেটা হলো কমপ্লেক্সের তিন নম্বর, ডাব্লিউটিসি ভবন ৭ নামে পরিচিত বিল্ডিং বিধ্বস্ত হওয়া নিয়ে।

এইসব আপত্তি পুনর্মূল্যায়ন করতে হলে কিছু বাস্তব ঘটনা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে। ফ্লাইট ১১ উত্তর টাওয়ারে (ডাব্লিউটিসি-১) আছড়ে পড়ে ৮:৪৬ মিনিটের সময়। কিন্তু টাওয়ার ধসে পড়ে ১০:২৮ মিনিটে; এক ঘণ্টা ৪২ মিনিট পর। ফ্লাইট ১৭৫ দক্ষিণ টাওয়ারে আঘাত হানে ৯:০৩ মিনিটে, কিন্তু টাওয়ার ধসে পড়ে ৫৬ মিনিট পর। ৯:৫৯ মিনিটে। ডাব্লিউটিসি-৭ নামে পরিচিত তৃতীয় টাওয়ারে কোনো আঘাত লাগেনি। অথচ তারপরও বিকেল ৫:২০ মিনিটে সেটাও ধসে পড়ে। এই সত্যগুলো তাৎক্ষণিকভাবে দুটো প্রশ্নের সৃষ্টি করে।

উত্তর টাওয়ারের ১৭ মিনিট পরে আক্রান্ত হওয়া দক্ষিণ টাওয়ার কেন প্রথমটার ২৯ মিনিট আগেই ধসে পড়ল? অন্যদিকে ডাব্লিউটিসি-৭ কোনো আঘাত না লাগার পরও কেমন করে বিধ্বস্ত হলো? এই তিন ভবনের বিধ্বস্ত হওয়া সম্পর্কে যে সমস্ত

BanglaBook.org

অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে আরও বেশি প্রশ্নের জন্ম হয়। প্রথম দুই টাওয়ারকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠেছে, আগে আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তারপর নজর দেব ডাব্লিউটিসি-৭ নম্বর ভবনের দিকে।

৯/১১-এর হামলার পর এক নোভা প্রোগ্রামে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাপক প্রচারণা চালানোর ফলে ডাব্লিউটিসি-১ ও ডাব্লিউটিসি-২ ভবনের নাম রাতারাতি টুইন টাওয়ার হয়ে যায়। দাবি করা হয়েছিল জ্বলন্ত জেট ফিউয়েলের প্রচণ্ড তাপে ইস্পাতের কলাম গলে যাওয়ায় ভবন দুটো ধসে পড়েছে। কিন্তু আজ সারা পৃথিবী জানে কথাটা ঠিক নয়। কারণ বুশ প্রশাসনের অফিশিয়াল ব্যাখ্যায় যতটা দাবি করা হয়েছিল, সে আগুন ততখানি তীব্র মোটেই ছিল না।

ভবনগুলোর স্টিলের কাঠামোর উত্তাপ সহ্য করার ক্ষমতা ছিল অনেক। অন্তত ২,৭৭০° ডিগ্রি ফারেনহাইটের (১,৫০০ °সি) উত্তাপ প্রয়োজন ছিল সেগুলোকে গলাতে। তা-ও সেটাকে বিশেষ ধরনের ডিভাইস; যেমন লোহা গলানোর অক্সিঅ্যাসিটিলিন টর্চের সূত্র থেকে সৃষ্ট উত্তাপ হতে হবে এবং যে আগুন সরাসরি তার লক্ষ্যবস্তুর নির্দিষ্ট একটা জায়গার ওপরে স্থির থাকবে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে না। রিফাইনড্ কেরোসিনের আরেক নাম জেট ফিউয়েল। জেট ফিউয়েলে আগুন লাগলে সেটা হয় হাইড্রোকার্বন আগুন। কিন্তু মজবুত স্টিলের কাঠামো গলানোর মত প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সেই আগুনের কখনই থাকে না।

এমআইটি-এর ম্যাটেরিয়ালস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেমস-এর প্রফেসর থমাস ইগার বলেছেন, খোলামেলা জায়গায় হাইড্রোকার্বন আগুনের উত্তাপ হয় বড়জোর ১,৬০০° থেকে ১,৭০০° ডিগ্রি ফারেনহাইটের মত। তার উপর সে আগুন ছিল ফিউয়েল থেকে সৃষ্ট আগুন। প্রচুর কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি হচ্ছিল তা থেকে। ওই আগুনে হাইড্রোকার্বন আগুনের মত যথেষ্ট উত্তাপ থাকে না। বড়জোর ১,২০০° বা ১,৩০০° ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপ ছিল সে আগুনের। অতএব তাতে স্টিলের কাঠামো সম্পূর্ণ গলিয়ে ফেলার মত প্রয়োজনীয় তেজ বা ক্ষমতা, কোনোটাই ছিল না।

এবার অন্য কিছু ফ্যাক্টস-এর দিকে নজর দেব আমরা। টাওয়ার দু'টোর উচ্চতা ছিল ১,৩০০ ফুট করে। এত লম্বা ভবন খাড়া রাখতে দু'টোরই সেন্ট্রাল কোরে বা ঠিক মাঝখানে ৪৭ টা করে স্টিলের কলাম ছিল। প্রতিটা ভবনের পেরিমিটার ঘিরে ছিল ২৪০ টা করে স্টিলের কলাম। সেগুলোর মাথারদিকের তুলনায় গোড়ারদিকের বেড় ছিল অনেক বেশি। এই পেরিমিটার কলামগুলো কংক্রিটের মেঝের সাথে অত্যন্ত মজবুত স্টিলের বার-জয়েস্ট ট্রাস (bar-joist truss) দিয়ে আটকানো ছিল। বড় বড় সেতু ঝুলিয়ে রাখার মত শক্তিধর মজবুত স্টিলের বার-জয়েস্ট ছিল সেগুলো। পরে অবশ্য সেগুলোকে 'ফ্লিমজি' বা ঠুনকো দাবি করা হয়েছিল অফিশিয়াল ব্যাখ্যায়।

কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট ম্যাকনামারা এ প্রসঙ্গে বলেছেন 'আজকালকার নতুন ভবনগুলো ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মতো এত বেশি মজবুত করে নির্মাণ করা হয় না।'

তার এ উদ্ধৃতি ছাপা হয় *সায়েন্টিফিক আমেরিকান* পত্রিকায়। ইঞ্জিনিয়ার ম্যাকনামারা এ কথা বলেছিলেন বিশেষ করে বার-জয়েস্ট ট্রাস সম্পর্কে। এফইএমএ-

BanglaBook.org

এর আরেক রিপোর্টে বলা হয়েছে এই দুই ভবনের ফ্লোরের ফ্রেমিং সিস্টেম বা নির্মাণ পদ্ধতি বেশ জটিল এবং সাধারণ বার-জয়েস্ট ফ্লোরের তুলনায় তা প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি সুদৃঢ় ছিল।

আগুনের কবল থেকে রেহাই পাওয়া কলামের অংশ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি মজবুত ছিল। এইসব বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে আমরা অফিশিয়াল ব্যাখ্যায় যেমন ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে 'প্লেনের ধাক্কায় টাওয়ারগুলোর দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল,' এক কথায় সেই দাবি নাকচ করে দিতে পারি। থমাস ইগার বলেছেন, প্লেনের ধাক্কার ফলাফল ততটা মারাত্মক ছিল না। কারণ 'সংঘর্ষে যে সমস্ত পিলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলোর ওপর ভবনের ভর খুব বেশি নির্ভরশীল ছিল না। তাছাড়া ওগুলো ভেঙে পড়ামাত্র প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি মজবুত করে নির্মিত এই দুই ভবনের ভর স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অবশিষ্ট পিলারগুলোর ওপর স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।'

এ প্রসঙ্গে এরিক হাফশমিড বলেন 'প্লেন ক্র্যাশ করার ধাক্কা কেটে যাওয়ার পর নর্থ টাওয়ার ছিল সুদৃঢ় এবং অনড়।'

হামশফিল্ড একজন ফোটোগ্রাফার। প্লেন ক্র্যাশের ঘটনার সময় তিনি অনেক ছবি তুলেছিলেন। তিনি টুইন টাওয়ারের আগুন প্রসঙ্গে বলেন 'জেট ফিউয়েল এত দ্রুত পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল, যাতে মনে হলো মুহূর্তের জন্য ওঠা গরম বাতাসের ঝলক ছিল সেটা। সেই ঝলকে সহজ দাহ্য জিনিসপত্র পুড়েছে, কিছু মানুষও মরেছে, জানালার কাচ ভেঙেছে, কিন্তু ওরকম মজবুত স্টিলের কাঠামো গলিয়ে দেয়ার মত উত্তাপ তাতে একেবারেই ছিল না। স্টিল যদি দীর্ঘ সময় ধরে আগুনের মধ্যে না থাকে, তাহলে তার কোনো ক্ষতি হয় না।'

হামশফিল্ড দক্ষিণ টাওয়ারের আগুন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন 'যে আগুনের জ্বলে ওঠার জায়গা থেকে বেশি দূর পর্যন্ত ছড়ানোর ক্ষমতা থাকে না, সে আগুন কেমন করে ওরকম ভয়াবহ কুণ্ডের সৃষ্টি করে যাতে অতবড় স্টিলের ভবন ধসে পড়তে পারে?' তিনি আরও বলেন, 'তাছাড়া যে আগুন মাত্র এক ফ্লোর উপরের কাগজপত্র, প্লাস্টিক সামগ্রীরও কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, সেই আগুনের পক্ষে এ কাজ কেমন করে সম্ভব?... দেখা গেছে, আগুনে জানালার অনেক কাচে চিড় পর্যন্ত ধরেনি!... তারা কিভাবে দাবি করে এরকম অল্প উত্তাপের আগুনে দক্ষিণ টাওয়ার পড়ে গেছে?'

অথচ থমাস ইগার ছিলেন অফিশিয়াল ব্যাখ্যা সমর্থনকারীদের অন্যতম। তিনি বলেন, ডাব্লিউটিসি-র ধসে পড়ার বিষয়টাকে দেখতে হবে টার্মস অব হিট বা উত্তাপের তেজ কেমন ছিল, সেই বিচারে। তাঁর মতে—'সত্যিকারের ক্ষতি সেই কারণে হয়েছে। ভবনগুলোয় ব্যবহার করা স্টিলের পিলার স্বাভাবিকের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি ভার বহন করতে সক্ষম হলেও ১৩০০° ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি উত্তাপের আগুনে সেগুলো ৮০ ভাগ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।'

এ ক্ষেত্রে টেম্পারেচার (তাপমাত্রা) এবং হিট বা এনার্জি (উত্তাপ বা ক্ষমতা), এই দুটোর পার্থক্য মাথায় রাখতে হবে। একটা জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি বা লাইট বাল্ব অনেক

BanglaBook.org

তাপমাত্রা সৃষ্টি করতে পারলেও বেশি শক্তি বা এনার্জি উৎপন্ন করতে পারবে না। কিন্তু ১৩০০° ডিগ্রির আগুন দুটোই পারবে। তবে সে ক্ষেত্রে আগুনের স্থায়িত্বকালও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

টুইন টাওয়ারে হামলা ও আগুন লাগাকে 'টাওয়ারিং ইনফার্নো' আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ আখ্যা সত্যি হয়েছে উত্তর টাওয়ার থেকে অসহায় মানুষের লাফিয়ে পড়ার মাধ্যমে। সেটার ৯৬ তলায় আঘাত করে ফ্লাইট ১১। ফলে তার উপরের কয়েক ফ্লোরের মানুষ বিপুল কালো ধোঁয়া আর চামড়া-মাংস ঝলসানো উত্তাপের হাত থেকে রেহাই পেতে নিরুপায় হয়ে নিচে ঝাঁপ দেয়। সন্দেহ নেই, উত্তাপ প্রচণ্ড না হলে মানুষ জেনেশুনে আত্মহত্যা করত না।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে এটাও মনে রাখতে হবে, মানুষের চামড়া-মাংস আর স্টিলের উত্তাপ সহ্য করার ক্ষমতার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। প্লেন আছড়ে পড়ার পর উত্তর টাওয়ারের যে সমস্ত ছবি তোলা হয়েছে, তাতে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে আগুন অবিশ্বাস্যরকম ভয়াবহ, নারকীয় ছিল বলেই স্টিলের পিলারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আক্রান্ত হওয়ার ১৬ মিনিট পর তোলা (তখনও দক্ষিণ টাওয়ার আক্রান্ত হয়নি) একটা ছবিতে দেখা গেছে, যেখানে ফ্লাইট ১১ আঘাত করেছে, সেখানটায় বড়, অন্ধকার একটা গর্ত। ভেতর থেকে ঘন কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। কোনো আগুনের শিখা ছিল না তখন।

হামশফিল্ড বলেছেন 'আগুনের শিখা চোখে না পড়ার বিষয়টাই প্রমাণ করে আগুন তেমন মারাত্মক ছিল না। তাছাড়া কালো ধোঁয়ার কারণে আগুন বাড়তেও পারছিল না। দক্ষিণ টাওয়ার আক্রান্ত হওয়ার পর তোলা আরেকটা ছবিতে দেখা গেছে, যে তলায় ফ্লাইট ১৭৫ আঘাত হেনেছে, তার ঠিক উপরের কয়েকটা ফ্লোরে আগুনের শিখা দেখা গেছে। আর কোথাও ছিল না আগুন। তাছাড়া প্রথম কয়েক মিনিটই আগুন ছিল; মারাত্মক হোক আর যা-ই হোক। জেট ফিউয়েল ফুরিয়ে যেতেই তা নিভু নিভু হয়ে যায়। কাজেই আক্রান্ত হওয়ার ১৬ মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর ওটা আর টাওয়ারিং ইনফার্নো ছিল না।

দক্ষিণ টাওয়ার আক্রান্ত হওয়ার পর যে বিশাল আগুনের গোলার সৃষ্টি হয়, তার ছবি আমরা সবাই দেখেছি। উত্তর টাওয়ারেও আগুনের বলের সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলো সৃষ্টি হয় প্লেনের ট্যাংক ফেটে জেট ফিউয়েল বাইরে গড়িয়ে পড়ার কারণে। দক্ষিণ টাওয়ারের আগুনের গোলা ছিল বিশাল, কারণ ফ্লাইট ১৭৫ আঘাত হেনেছে সেটার এক কোনায়। কাজেই অনেক বেশি ফিউয়েল গড়িয়ে পড়েছিল সেটা থেকে। সেগুলো প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি করেছিল ঠিকই, কিন্তু তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। ফিউয়েল দ্রুত পুড়ে গেছে, আগুনও কমে গেছে।

দক্ষিণ টাওয়ারের অগ্নিকাণ্ড প্রথম দৃষ্টিতে বড় দেখালেও তার অর্থ এই নয় যে, সেটা ভয়াবহ ছিল। বরং তার উল্টোটা ছিল। কারণ প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যে এত বেশি জেট ফিউয়েল পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় যে টাওয়ারের ভিতরে আগুন তেমন ছড়াতে পারেনি। হামশফিল্ড এ প্রসঙ্গে বলেন 'প্রথম চোটে আগুন দর্শনীয় ছিল বটে,

BanglaBook.org

কিন্তু খুব দ্রুতই স্তিমিত হয়ে আসে। তারপর নিভে যায়।'

সরকারের প্রচার করা আগুন থিয়োরির বিপরীতে আরেক অভিমত হচ্ছে যদি সর্বগ্রাসী আগুন টুইন টাওয়ারকে পুরোপুরি গ্রাস করেও থাকে, তারপরও ওগুলো ধসে পড়ত না। ৯/১১-এর আগে কখনো কোনো স্টিল ফ্রেমের ভবন শুধু আগুনে পোড়ার কারণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে, এমন কোনো রেকর্ড নেই। এফইএমএর-এর রিপোর্টে জানা যায়, ১৯৯১ সালে ফিলাডেলফিয়ার এক বিল্ডিঙে ভয়াবহ আগুন লেগেছিল। সে আগুনের তেজ এত বেশি ছিল যে, ভবনের বিম ও গার্ডার সব গলে নরম ও বাঁকা হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও কলামগুলো খাড়া ছিল, আগের মতই ভবন খাড়া রাখার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিল।

সরকারের আগুন থিয়োরির পক্ষের সবার দাবি, টুইন টাওয়ারের স্পেশাল বৈশিষ্ট্যই এ জন্য দায়ী। তারা বলেন, আগুন সারা ফ্লোরে ছড়িয়ে স্টিলের সবকিছুকে তাতিয়ে তুলবে, ব্যাপারটা সেরকম নয়। একটা ফ্লোরকে উত্তপ্ত করে তুলতে পারলেই এরকম ঘটতে পারে। থমাস ইগারের মতে সমস্যা হয়েছে অ্যাঙ্গেল ডিপ (angle dip) নিয়ে।

জিনিসটা পেরিমিটার ওয়ালের কলাম ও কোর কাঠামোর মধ্যে ফ্লোর জয়েস্টকে ধরে রাখে। এটাকে স্বাভাবিকের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি ওজন ধরে রাখার মতো করে তৈরি করা হয় না। সমালোচকরা এটাকে ট্রাস থিয়োরির 'যিপার' সংস্করণ বলছেন। ইগারের মতে এক জায়গায় অ্যাঙ্গেল ক্লিপ ফেইল করলে বা কাজ করতে ব্যর্থ হলে সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের অ্যাঙ্গেল ক্লিপগুলোর ওপর বাড়তি চাপ পড়বে। এর প্রতিক্রিয়া হবে অনেকটা চেইন খোলার মত। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাকি সব অ্যাঙ্গেল ক্লিপ ঝপাঝপ্ খুলে যাবে। এবং ফ্লোর চারদিক থেকে প্রায় একই সঙ্গে 'আনযিপড্' হয়ে যাবে। তারপর

> আগুনে বেশিরকম ক্ষতিগ্রস্ত ফ্লোরের একটা-দুটো জয়েস্ট অকেজো হয়ে যেতেই বাইরের বক্স কলাম ঝুঁকে পড়ে এবং উপরের ফ্লোরগুলো ধসে পড়তে শুরু করে। তার নিচের ফ্লোর (১৩০০ টন ডিজাইন ক্ষমতা নিয়ে) আনুমানিক ৪৫ হাজার টন ওজনের দশটা অথবা আরও বেশি ফ্লোরের আছড়ে পড়ার ধাক্কা সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে শুরু হয় ডোমিনো ইফেক্ট এবং তারপর দশ সেকেন্ডের মধ্যে গোটা ভবন বিধ্বস্ত হয়।

এফইএমএ-র এক রিপোর্টে এ জাতীয় এক থিয়োরিকে সমর্থন করা হয়েছে। যাতে একটার উপর আরেকটা ফ্লোর ধসে পড়ার বিষয়টিকে 'প্যান কেক টাইপ অব কোলাপস অব সাকসেসিভ ফ্লোরস' বলা হয়েছে।

এই বক্তব্যের মধ্যে অনেক গরমিল আছে। যেমন এক নম্বর যে পরিমাণের স্টিল 'খুব গরম হলে' এমনটা ঘটতে পারে বলে দাবি করা হয়েছে এফইএমএ-র রিপোর্টে, টুইন টাওয়ারের স্টিলের কলামগুলো সেই পরিমাণ গরম সেদিন হয়নি। বিশেষ করে

BanglaBook.org

দক্ষিণ টাওয়ারের স্টিলের কাঠামো।

দুই নম্বর হামশফিল্ড বলেছেন, ২৩৬ টা এক্সটেরিয়র কলাম ও ৪৭টা কোর কলামের শত শত বার-জয়েস্ট জয়েন্ট একযোগে খুলে পড়লে একটা ফ্লোর ধসে পড়তে পারে।

তিন নম্বর 'দশ সেকেন্ডের মধ্যে গোটা ভবন ধসে পড়েছে' কথাটার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে থমাস ইগার এই থিয়োরির কথা বলেছেন। কিন্তু ১৩০০ ফুট উঁচু একটা স্কাইস্ক্র্যাপারের মাত্র দশ সেকেন্ডের মধ্যে মাটিতে শুয়ে পড়া হচ্ছে অনেকটা ফ্রি-ফল বা 'বাধাবিঘ্নবিহীন ঝোড়োগতির পতনের' মতো। অথচ পতনের সময় প্রতিটা ফ্লোর যদি ক্ষণিকের জন্যও থমকায়, বা একটু বাধা দেয়, তাহলে ৮০ বা ৯৫ টা ফ্লোরের পতন সম্পূর্ণ হতে অংকের হিসেবেই ৪০ থেকে ৪৭ সেকেন্ড সময় লাগবে। আমাদের কি তারপরও এ কথা বিশ্বাস করতে হবে, দুই টাওয়ারের আগার দিক ভেঙে পড়ার সময় গোড়ার অপেক্ষাকৃত মজবুত অংশের দিক থেকে একটুও বাধার সৃষ্টি করা হয়নি?

উত্তর টাওয়ারের বেলায় এ সমস্যা আরও অনেক জটিল। সেটা একেবারে ফ্রি-ফল গতিতে; অর্থাৎ আট সেকেন্ডেই ধসে পড়েছে জেনে হামশফিল্ড প্রশ্ন করেন 'প্লেন আছড়ে পড়ায় টাওয়ারের উপরের ফ্লোরগুলো থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসা এটা-সেটা স্বাভাবিক মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে পড়ছে; তখনও মাটি ছুঁতে পারেনি, তার আগেই ১০০ টা স্টিল ও কংক্রিটের ফ্লোর মাটিতে বসে পড়ল, এটা কেমন করে সম্ভব হলো?

চার নম্বর প্রশাসনের ব্যাখ্যার সমর্থনে থমাস ইগারের টাওয়ারগুলোর পতন *সম্পূর্ণ* ছিল; এবং তাঁর মতে ওগুলোর গোড়ার কাছে জমে ওটা ধ্বংসাবশেষ 'মাত্র কয়েক তলা সমান উঁচু' ছিল তত্ত্ব বাস্তবতার সাথে খাপ খায় না। পিটার মেয়ার এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন টাওয়ারের সবগুলো ফ্লোর ও কলাম ধসে পড়েছে ঠিক আছে। কিন্তু একেবারে গোড়ার কলামগুলোও শুয়ে পড়ল কেন?

> টাওয়ার বিধ্বস্ত হওয়ার পর গোড়ার দিকে স্টিলের যে বিশাল বিশাল সাপোর্টিং কলামগুলো ছিল, সেগুলোও শুয়ে পড়ল কেন? যদি সরকারের ব্যাখ্যাই সত্যি হয়, যদি আগুনের প্রচণ্ড তাপেই ভবন দুটোর ক্ষতি হয়ে থাকে, তাহলে তা হয়েছে উপরের কিছু ফ্লোরের। সেসবের কয়েকটা যদি প্যান কেক হয়েও থাকে, তাহলেও অন্তত সেন্ট্রাল কোরের কলামগুলোর তো খাড়া থাকার কথা ছিল। নিচের ২০/৩০ তলার তো দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল।

ভয়াবহ আগুনে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার কারণেই টাওয়ার বিধ্বস্ত হয়েছে বলে যে দাবি করা হয়েছে, তার বিপরীতে আরও কথা আছে। আমরা এতক্ষণের আলোচনায় মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছি যে, স্টিলকে উত্তপ্ত করে তুলতে সাধারণ আগুনের চেয়ে বহুগুণ জোরাল আগুনেরও অনেক বেশি সময় লাগে। উত্তর টাওয়ারে আগে হামলা চালানোর হলেও আগে বিধ্বস্ত হয় দক্ষিণ টাওয়ার। এবার আসা যাক আসল কথায়।

BanglaBook.org

আগে যে টাওয়ার আক্রান্ত হয়েছে, স্বাভাবিকভাবে সেটারই আগে পড়ার কথা ছিল।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটেছে অন্য কিছু। উত্তর টাওয়ারের ১৭ মিনিট পর হামলা হয় দক্ষিণ টাওয়ারে, অথচ সেই দক্ষিণ টাওয়ারের পতন হয়েছে আগে। উত্তর টাওয়ারের চেয়ে ২৯ মিনিট আগে পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয় সেটা। দক্ষিণ টাওয়ারের আগুন যদি খুব বেশি ভয়াবহ হতো, তাহলে এই বিস্ময়কর সত্যটি কোনো সমস্যার সৃষ্টি করত না। কিন্তু হয়েছে বরং উল্টোটাই। আমরা দেখেছি, দক্ষিণ টাওয়ারের আগুন ছিল অনেক ছোটো আর দুর্বল।

দুটো টাওয়ারের একটা বিধ্বস্ত হতে সময় নিয়েছে অন্যটার চেয়ে দ্বিগুণ। কাজেই জানা না থাকলে যে কেউ ধরে নেবে যেটায় প্রথমে হামলা হয়েছে, সেটাই আগে বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ঘটেছে উল্টো–পরে আক্রান্ত হওয়া টাওয়ার আগে ধ্বংস হয়েছে। এই বিপরীতমুখী ব্যতিক্রম ইঙ্গিত করে টুইন টাওয়ারের বিধ্বস্ত হওয়ার পিছনে অন্য কোনো কারণ ছিল। সেটা আগুন নয়।

সমালোচকরাও এই ধারণাই পোষণ করেন। তাদের বিকল্প ব্যাখ্যা এটা ছিল কন্ট্রোলড্ ডিমোলিশন বা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে ধ্বংস করার একটি প্রকৃষ্ট নমুনা। ভবনগুলোর বিভিন্ন সুবিধাজনক জায়গায় বোমা পেতে রেখে পরে সময়মত সেগুলো ফাটিয়ে কাজটি করা হয়েছে। এতক্ষণের আলোচনা-পর্যালোচনার পর ঘটনার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ এরকমই দাঁড়ায়। এত দ্রুত এবং এমন সম্পূর্ণভাবে ভবন দুটোর পতন হলো কেন, মেয়ার সে প্রসঙ্গে বলেন :

> স্টিল কলামগুলোর একেবারে গোড়ার দিকে বোমা পেতে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়ার ফলেই এটা ঘটেছে। টুইন টাওয়ারে বিভিন্ন স্তরে পেতে রাখা সমস্ত বোমা একযোগে ফাটিয়ে দেয়ায় টাওয়ারগুলো ভিত্তি হারিয়ে দশ সেকেন্ডের মধ্যে মাটিতে ধসে পড়েছে।

ফিনটান ডিউন এই বিষয়ের ওপরই জোর দিয়েছেন তাঁর *দ্য স্প্লিট সেকেন্ড এরর এক্সপোজিং দ্য ডাব্লিউটিসি বম্ব প্লট* বইয়ের *দ্য রং টাওয়ার ফেল ফার্স্ট* বা ভুল টাওয়ারের পতন আগে হয়েছে শিরোনামের অংশে। সরকারী ব্যাখ্যা সমর্থনকারীদের বক্তব্য হচ্ছে, উত্তর টাওয়ারের ১৫ ফ্লোর নীচে, ৮১তম ফ্লোরে আঘাত লাগায় দক্ষিণ টাওয়ার আগে বিধ্বস্ত হয়েছে। কারণ উত্তরেরটার তুলনায় এটার ভেঙে পড়া মাথা অনেক বেশি ভারী ছিল। এই বাড়তি ওজনের কারণেই আগে বিধ্বস্ত হয় দক্ষিণ টাওয়ার। তবে হামশফিল্ড এই থিয়োরির সাথে একমত হতে পারেননি। তাঁর মতে দুটো টাওয়ারের ক্র্যাশ জোনের কলামই এ ধরনের ভার বহনে পুরোপুরি সক্ষম।

টুইন টাওয়ারের পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর ব্যাখ্যা কেবল ডিমোলিশন থিয়োরিতেই পাওয়া যায়। সেসবের একটা ব্যাখ্যা হলো, প্রতিটা টাওয়ারের পতন প্রচুর মিহি ধুলো বা পাউডারের সৃষ্টি করেছে। পরীক্ষা করে তার মধ্যে জিপসাম ও কংক্রীট পাওয়া গেছে। জেফ কিং ঘটনার ভিডিও চিত্র

BanglaBook.org

দেখে মন্তব্য করেছিলেন :

> সবচেয়ে বড় এবং সুনিশ্চিত সমস্যা হচ্ছে, টাওয়ারগুলো ধসে পড়ার সময় অকস্মাৎ ধুলোর যে বিশাল মেঘের সৃষ্টি হলো... রিইনফোর্সড কংক্রিটকে ধুলোয় পরিণত করার মতো এনার্জি ওখানে কোত্থেকে এলো?

এর সাথে হামশফিল্ড যোগ করেছেন, 'ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কংক্রিটের সামান্য কিছু টুকরো পাওয়া গেছে।' যার অর্থ, বলতে গেলে কংক্রিটের টুকরোগুলো সব ধুলোয় পরিণত হয়েছে। দুই টাওয়ারের আনুমানিক এক লক্ষ টন করে কংক্রিট ধুলো হয়ে গেছে। এ জন্য প্রয়োজন প্রচুর এনার্জির। জেফ কিং বলেন

> টাওয়ারগুলো ধসে পড়ার শুরুর দিকে কি পরিমাণ অতি মিহি ধুলোর সৃষ্টি হয়েছে, সেটা একটা সমস্যা। মাধ্যাকর্ষণের টানে প্রতি সেকেন্ডে ৩২ ফুটের কাছাকাছি গতিতে মাটির দিকে নামার কথা ছিল সেগুলোর, কিন্তু তা হয়নি। প্রথমদিকে পতনের গতি ছিল বেশ ধীর... কংক্রিটের স্ল্যাবগুলো মিনিটে ২০/৩০ মাইল গতিতে মাটির দিকে ছোটার সময় পরস্পরের সাথে বাড়ি খেয়ে ধুলোয় পরিণত হয়েছে, এমনটা কল্পনা করা কঠিন।

হামশফিল্ডের মতে, 'কংক্রিটের স্ল্যাবগুলো যদি ফ্রি-ফল গতিতে মাটিতে পড়েও থাকে, তবু এভাবে সম্পূর্ণ গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে না। কাজেই টুকরোগুলোকে পাউডারে পরিণত করতে অবশ্যই বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে।'

অন্য একটা কারণ আরও জোরালোভাবে নির্দেশ করে যে, টাওয়ারের পতন নিঃসন্দেহে *ঘটানো হয়েছিল*। সেটা হলো কিং-এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। যখন টাওয়ার বসে পড়তে শুরু করে, তখন সরাসরি পড়েনি যেমনটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্যান কেক থিয়োরিতে। হয়েছে এভাবে প্রথমে ভবনগুলো বিস্ফোরিত হয়, ভিতর থেকে প্রচুর পাউডার বের হয় হরাইজন্টালি বা আড়াআড়িভাবে। ভবন যত চওড়া, সম্ভবত তার তিন গুণ চওড়া ধুলোর মেঘে ঢাকা পড়ে যায় টাওয়ার।

হামশফিল্ডের তোলা অনেক ছবিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বিস্ফোরক ছাড়া এমন কি আছে যা কংক্রিটকে ধুলোয় পরিণত করতে পারে? এবং সেই পাউডারকে ১৫০ ফুট বা তারও বেশি দূরে আনুভূমিকভাবে নিক্ষেপ করতে পারে? যদি ধরে নেয়া হয় ব্যাপারটা তাই ছিল, তাহলে অনেক ছবিতে যেমন দেখা গেছে টাওয়ারের বড় বড় অংশও ছিটকে গিয়ে ১৫০ ফুট বা তারও বেশি দূরে পড়েছে, তার কি ব্যাখ্যা?

হতবাক করার মতো আরও একটি বিষয় আছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাউডার ছাড়া অন্য একটা জিনিসও ছিল। সেটা হলো স্টিল। স্টিল আর কংক্রিটের তৈরি ভবন ধ্বংস হলে স্তূপের মধ্যে দুটোই থাকবে জানা কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটে এক ব্যতিক্রমী

BanglaBook.org

ঘটনা। স্টিলের প্রতিটা খণ্ড ছিল ছোটো ছোটো। 'প্রায় প্রতিটা জয়েন্ট পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল সেগুলোর।'

এই কন্ট্রোলড্ ডেমোলিশন বা নিয়ন্ত্রিতভাবে ধ্বংসের সমর্থনে আরও কিছু মানুষের সমর্থন পাওয়া গেছে। অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর যে সমস্ত সদস্য ওই সময় সেখানে ছিল, তাদের কেউ কেউ বলেছেন তাঁরা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছেন। মাটির কম্পন অনুভব করেছেন। অথবা টাওয়ারের বিভিন্ন ফ্লোর ও সাব-বেজমেন্টে এমন সব নমুনা দেখেছেন, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না যে সেসব বিস্ফোরণের কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

সাইজমিক এভিডেন্স (seismic evidence) বা ভূ-কম্পনঘটিত প্রমাণও পাওয়া গেছে এর স্বপক্ষে। যাতে দেখা যায় টাওয়ার পতনের সময় ওই জায়গায় দু' বার ভূমিকম্প হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ২১ মাইল উত্তরের পালিসেডস-এ কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ল্যামন্ট-ডহার্টি আর্থ অবজার্ভেটরি। ওই দিন সেখানকার সাইজমোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ে সকাল ৯:৫৯:০৪ টায় ২.১ ম্যাগনিচিউডের ভূমিকম্প শুরু হয় সেখানে। ১০:২৮:৩১ টায় শুরু হয় ২.৩ ম্যাগনিচিউডের দ্বিতীয় দফার ভূমিকম্প। দুবারই প্রথম ৫ সেকেন্ড ধরে মাটির কাঁপন ক্রমে বাড়তে থাকে, তারপর কমে গিয়ে ৩ সকেন্ডের মত স্থায়ী হয়, সবশেষে ধীরগতিতে থেমে যায়।

হামশফিল্ডের মতে ভূমিকম্পের এই প্রকৃতি থেকে বোঝা যায় টাওয়ারগুলোর চূড়ার কাছে, যেখানে স্টিল কলাম অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সেখানে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। পদ্ধতিটা এমন ছিল, যাতে কম্পনের মাত্রা ক্রমে বাড়তে থাকে। এসব অবশ্যই কম্পিউটার কন্ট্রোলড্ ছিল।

তারপর ১০০ মিলিমিটারের পুরু স্টিলের কলামের জোড়া ভাঙতে টাওয়ারের গোড়ায় আর বেজমেন্টে ঘটানো হয় চূড়ান্ত বিস্ফোরণ। যখন বেজমেন্টে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, সাইজমিক ডেটা তখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে ওঠে। এরপর বিস্ফোরণ থেমে যায়, ধ্বংসাবশেষ মাটিতে পড়ার সময় কয়েক সেকেন্ডের জন্য সাইজমিক কম্পন অনুভূত হয়। ডেমোলিশন থিয়োরির সমর্থনে আরও সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে। তার একটা হলো, গলে যাওয়া স্টিল পাওয়া গেছে সাব-বেসমেন্ট লেভেলে।

ফিনিক্স, মেরিল্যান্ডের কন্ট্রোলড্ ডেমোলিশন ইনকর্পোরেটেডের প্রেসিডেন্ট, মার্ক লইজিয়ক্স ডাব্লিউটিসি ভবনের ধ্বংসাবশেষের ক্লিন-আপ বা অপসারণ পরিকল্পনার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বলেছেন বলে উল্লেখ করা হয় : ক্লিন-আপ অপারেশনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সপ্তাহে গলে যাওয়া স্টিলের কিছু 'হট স্পট' খুঁজে পেয়েছি তার ক্রুরা... মেইন টাওয়ারের এলিভেটর শ্যাফটের একেবারে গোড়ায়, বেজমেন্টের সপ্তম লেভেলে।

প্রতিটা 'হট স্পটে' কয়েক সপ্তাহ ধরে ধিকিধিকি আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। টাওয়ার ধসে পড়ার পর ঘটনার কোনো ধরনের তদন্ত হওয়ার আগেই স্টিলসহ সমস্ত ধ্বংসাবশেষ সেখান থেকে দ্রুত সরিয়ে ফেলা হয়।

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এ নিয়ে মন্তব্য করে '৯/১১-এর কয়েকদিনের মধ্যেই

BanglaBook.org

ডাব্লিউটিসি-র ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা স্টিলের কলাম, বিম ও ট্রাস প্রভৃতি রিসাইকল করার অর্থ এই সত্যই প্রমাণ করে, ঘটনা সম্পর্কে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে, সম্ভবত সেসবের জবাব কোনোদিনই পাওয়া যাবে না।' তার পরের সপ্তাহে *ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং* পত্রিকায় দাবি করা হয় 'ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে নিয়ে সমস্ত প্রমাণ বিনষ্ট করা অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।'

তারপরও সে কাজ পূর্ণ গতিতে চলতে থাকে। এর সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেয়ার বলেন

> পরিকল্পিত বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত টুইন টাওয়ারের সাপোর্টিং স্টিল কলাম পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পেলে মেটালার্জিস্টরা (ধাতুবিজ্ঞানী) হয়ত 'টুইনিং (twinning)'-এর প্রমাণ পেতেন। তাই ফরেনসিক পরীক্ষার কোনো সুযোগ না দিয়ে কর্তৃপক্ষ সেসব দ্রুত সরিয়ে ফেলেছে। প্রায় ৩ লাখ টন স্টিল বিক্রি করে দিয়েছে নিউ ইয়র্কের স্ক্র্যাপ ডিলারদের কাছে। তারা সেগুলো জাহাজ বোঝাই করতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ায় রফতানি করে সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলেছে।

সমালোচকদের সন্দেহ, এ নিয়ে কেন হুড়োহুড়ি করা হলো যদি সরকারের গোপন করার মতো কিছু না-ই থাকবে?

ডাব্লিউটিসি-৭ বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ কি?

টুইন টাওয়ারে হামলা, ধ্বংস ইত্যাদির ডামাডোলের মধ্যে একই দিনে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের অখ্যাত ৭ নম্বর ভবন বিধ্বস্ত হলেও সেটার কথা বলতে গেলে প্রায় চাপাই পড়ে গেছে। তা নিয়ে সরকার উচ্চবাচ্য করেনি। কারণ টুইন টাওয়ার নিয়ে হই-চই করার যে সমস্ত গরম গরম উপাদান বুশ প্রশাসনের হাতে ছিল, ৭ নম্বর ভবনের বেলায় সেরকম কিছুই ছিল না বলে ওটার ব্যাপারে কোনো অফিশিয়াল ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি।

সেটার উপর কোনো প্লেন ভেঙে পড়েনি। তবু কেন সেটা ধসে পড়ল, সে ব্যাপারে এফইএমএ-র রিপোর্টে অনেক আনুমানিক কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হলেও কোনো নির্দিষ্ট কারণ তাতে পাওয়া যায়নি।

হাউস সায়েন্স কমিটির রিপোর্টেও এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে মিডিয়ায় যে থিয়োরির কথা ব্যাপকভাবে প্রচার পেয়েছে, সেটা এরকম ৭ নম্বর ডাব্লিউটিসি বিল্ডিং উত্তর টাওয়ার থেকে ৩৫৫ ফুট দূরে; দক্ষিণ টাওয়ার থেকে আরও দূরে। সেটা যে ওই দুই ভবনের পতনশীল ধ্বংসাবশেষের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে আগুন ধরে গিয়েছিল ভবনটিতে। কেন, তা-ও জানা যায়নি। তবে নিউ ইয়র্কের ফায়ার চিফ অজ্ঞাত কারণে তার ক্রুদের ওই ভবনে ঢুকতে দেননি। স্বয়ংক্রিয় পানি ছিটানোর যে স্প্রিঙ্কলার (sprinkler) ব্যবস্থা ছিল, তা-ও আগুন আয়ত্তে

BanglaBook.org

আনতে ব্যর্থ হয়। যদিও তা সামান্যই ছিল।

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে সে আগুনের তেজ বাড়তে থাকে। স্প্রিঙ্কলার পানি ছিটানোর কাজ শুরু করেওছিল, কিন্তু পরে অজ্ঞাত কারণে স্প্রিঙ্কলারের পাইপ লাইন ব্যবস্থার সাথে কিভাবে যেন সংযোগ ঘটে যায় ভবনের আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাংকে সংরক্ষণ করা হাজার হাজার গ্যালন ডিজেল ফিউয়েলের সাথে। পানির বদলে আগুনে ডিজেল ছিটাতে শুরু করে সেটা। ফলে ভবনের সমস্ত রিইনফোর্সড্ স্টিল সারাদিন আগুনে পুড়ে গলে যায় এবং বিকেল ৫:২০ মিনিটে ভবন ধসে পড়ে।

এই থিয়োরির সামনেও অনেক সমস্যা আছে। প্রথমত, ওই ভবনে 'রেজিং ফায়ার' বা যাকে বলে দাউ দাউ করে আগুন ধরে যাওয়া, সেরকম কিছু ঘটেছিল বলে প্রমাণ নেই। বরং ফোটোগ্রাফার হামশফিল্ডের মতে, '৭ নম্বর ভবনের যে সব ছবি তোলা হয়েছে, তার প্রতিটায় স্পষ্ট দেখা গেছে যে ৭ম ও ১২তম ফ্লোরের কয়েকটা জানালা দিয়ে আগুন দেখা গিয়েছিল। তবে সে আগুনের তেজ তেমন বেশি ছিল না।'

দ্বিতীয়ত, হাইড্রোকার্বন আগুন যে কোনো ভবনের সম্পূর্ণ ধসে পড়ার কারণ হতে পারে না। সে বিষয়ে আমরা আগেই নিশ্চিত হয়েছি। এর আরও জ্বলন্ত প্রমাণ হলো, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ৪, ৫ এবং ৬ নম্বর ভবনও দাউ দাউ আগুনে পুড়েছে, অথচ একটাও ধসে যায়নি। কাজেই প্লেনের ফিউয়েলের আগুনে ভবন ভূপাতিত হবে, আর কোনো আগুনে হবে না, এটা কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হতে পারে না। সেই দৃষ্টিতে ৭ নম্বর ভবনই ইতিহাসের একমাত্র স্টিল ফ্রেমের ভবন, যেটা শুধু আগুনে পোড়ার কারণেই ধসে গেছে।

সেরকম ঘটনা যদি ১১ সেপ্টেম্বর সত্যিই ঘটত, সমালোচকদের মতে সেটা হত অসাধারণ একটি বিষয়। আর্কিটেক্ট ও বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়াররা স্টিলের গুণাগুণ, স্থায়িত্বকাল ইত্যাদি সম্পর্কে বহুকাল থেকে যা জেনে এসেছেন, সে ধারণা মিথ্যে হয়ে যেত। তাহলে আবার নতুন করে ধাতুবিদ্যা পড়ার প্রয়োজন হতো তাঁদের। তাছাড়া সাধারণ আগুনেই ভবন ধসে পড়ে, এমন পিলে চমকানো তথ্য পেলে সারা দুনিয়ার ইনশিওরেন্স কোম্পানিগুলো মক্কেলদের প্রিমিয়ামের দর নতুন করে হিসেব কষতে বসে পড়ত। তারপরও ৭ নম্বর ভবনের ধসে পড়ার কারণ হিসেবে আগুনকেই দায়ি করা হয়েছে, যেন এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

'ডাব্লিউটিসি-৭: দ্য ইমপ্রোব্যাবল কোলাপস' শিরোনামের এক ব্যাখ্যায় স্কট লগারি বলেছেন

> ডাব্লিউটিসি-৭ ধসে পড়ার প্রশ্নে এফইএমএ-এর কুছ পরোয়া নেই ধরনের আচরণে রীতিমত স্তম্ভিত হতে হয়। সাধারণভাবে স্ট্রাকচারাল ফেইলিওর বা কাঠামোগত ব্যর্থতার কোনো কারণ ঘটেনি সেটার ক্ষেত্রে... আমরা কি এমন এক যুগে বাস করি, যে যুগে বড় বড় শহরে স্টিলের কাঠামোর তৈরি উঁচু ভবনগুলো বোধগম্য কোনো কারণ ছাড়াই কেন ধসে পড়ল তা নিয়ে মত বিনিময় করা যাবে না?

BanglaBook.org

তৃতীয়ত, ওটার পতনের সম্ভাব্য কারণ নিয়ে বেশ কিছু ফিচার ছাপা হয়েছে যাতে দূরনিয়ন্ত্রিত (রিমোট কন্ট্রোলড) বিস্ফোরণকে এ জন্য দায়ি করা হয়েছে। তাই অফিশিয়াল থিয়োরি প্রমাণ করা প্রশাসনের জন্য বেশ কঠিন হবে। আসলেই তাই। কারণ হামশফিল্ড জোর দিয়ে বলেছেন, ওই ভবনটি যে প্রক্রিয়ায় ধসানো হয়েছে, তা টুইন টাওয়ারের বিপরীত। প্রচলিত পদ্ধতিতে গোড়ায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলা হয়েছে সেটাকে।

> ডাব্লিউটিসি-৭ ধসে পড়ার সময় ভেতরের অংশ আগে পড়েছে। ফলে বাইরের চার দেয়াল সাপোর্ট হারিয়ে ভিতরের দিকে ভেঙে পড়ে। প্রচলিত রীতিতে এভাবেই ডেমোলিশন সম্পন্ন করা হয়ে থাকে... ধ্বংসস্তূপের পরিমাণ সেটার তাই অনেক কম ছিল।

ওটা থেকেও পাউডারের মত কিছু ধুলোর সৃষ্টি হয়েছিল, তবে তার পরিমাণ উল্লেখ করার মতো নয়। তাছাড়া সেগুলো গোড়ায় সীমিত ছিল, যেখান থেকে ডেমোলিশন প্রক্রিয়া শুরু হয়। আগের দুটোর ধুলো যেমন আকাশ অন্ধকার করে বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছে, এটার বেলায় তা হয়নি। ভবন ধসে পড়ার সময় সাইজমিক কম্পনের রেকর্ডে দেখা গেছে, তা আগের দুটোর দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। তবে সেটার ধ্বংসস্তূপের নিচে দুটো হট স্পট পাওয়া গেছে। যার একটা ছিল খুবই উত্তপ্ত।

সেখানে গলে যাওয়া স্টিলের সন্ধানও পাওয়া যায়। সেটার যাবতীয় স্টিলও খুব দ্রুত সরিয়ে ফেলা হয়। ডাব্লিউটিসি-৭ সম্পর্কে উল্লেখ করার মতো আরেকটা বিষয় হচ্ছে, ভবনটা অনেকদিন থেকেই পরিত্যক্ত ছিল। তাই টুইন টাওয়ারের মত 'বেঁচে যাওয়া' মানুষদের খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হয়নি ফায়ার কর্মীদের। তারপরও সেটার সমস্ত স্টিল স্ট্রাকচার হুড়োহুড়ি করে সরিয়ে ফেলার সম্ভাব্য কারণ কি থাকতে পারে?

পরিশেষে আমি আবার এফইএমএ-এর রিপোর্টের কথায় ফিরে যেতে চাই, যাতে সত্যিকারের কোনোরকম ব্যাখ্যাই আসলে দেয়া হয়নি। তার বদলে কথা এভাবে ঘুরিয়ে বলা হয়েছে

> ডাব্লিউটিসি-৭ ভবনে আগুন লাগার এবং সেটার ধসে পড়ার সুনির্দিষ্ট কারণ কি ছিল, তা আজও পর্যন্ত অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। সেটার আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাংকে থাকা বিপুল পরিমাণ ডিজেল ফিউয়েল সেই আগুন লাগার আসল কারণ হতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করলেও তাতেই ভবনটি পুরোপুরি ধসে পড়ছে, তদন্তে তেমন জোরাল কোনো প্রমাণ মেলেনি।

BanglaBook.org

এ কথা স্বীকার করতেই হবে অফিশিয়াল থিয়োরির ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে থাকা এফএএমএ-এর কাঁধে ডাব্লিউটিসি-৭ ধসে পড়ার 'আসল' কারণ ব্যাখ্যা করার অসম্ভব কঠিন একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তাদের পক্ষে দূরনিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের

সম্ভাবনার কথা মুখে আনা সম্ভব হয়নি। 'ডিজেল ফিউয়েল আগুন লাগার কারণ হতে পারে বলে আশঙ্কা থাকলেও তা তেমন জোরাল নয়,' বলেই দায়িত্ব সারতে হয়েছে তাদেরকে।

থমাস ইগারসহ অন্য যেসব বিশেষজ্ঞ টুইন টাওয়ারের বিধ্বস্ত হওয়ার প্রশ্নে রাজ্যের সব অদ্ভুত, অসম্ভব থিয়োরি মানুষকে গেলানোর চেষ্টা করেছেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তাদেরকেও বোধহয় একই রকম আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা 'বোঝাপড়ার' অধীনে কাজ করতে হয়েছে। তাঁরা দেখেও দেখেন না, জেনেও জানেন না যে, এ কাজ অবশ্যই কন্ট্রোলড্ ডেমোলিশনের।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ম্যাথায়াস লেভি টুইন টাওয়ারের পতনের কারণ স্টিল গলে যাওয়া বলে উল্লেখ করে এ কথাও বলেছেন 'ভালো করে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে এটা খুব সম্ভব কন্ট্রোলড্ ডেমোলিশন ওয়ার্ক। যদি তাই হয়, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় 'সন্ত্রাসীরা তাদের মিশন পুরো করতে পেরেছে, টুইন টাওয়ারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পেরেছে এই জন্য যে, এটা আগাগোড়াই একটা ইনসাইড জব ছিল।'

***

ফ্লাইট ৭৭ ও ফ্লাইট ১৭৫ এবং ১, ২ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভবন বিধ্বস্ত হওয়া সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠেছে, তার সবই যে প্রেসিডেনশিয়াল দুষ্কর্মের কারণে হয়েছে, তা নয়। তবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে মনে হয় এসবের সাথে অফিশিয়াল দুষ্কর্মের একটা যোগসূত্র আছে।

যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের তিনটা ভবন ধ্বংস হওয়ার ঘটনা ইনসাইড জবই ছিল। গোটা বিষয়টার পরিকল্পনা হয়ত কিছু **প্রাইভেট পার্টি** করেছে। তবে ফেডারাল সরকার যে সমস্ত ফরেনসিক প্রমাণ ইত্যাদি রাতারাতি সরিয়ে ফেলার কাজে তাদের সহযোগিতা করেছে, সেটাও স্পষ্ট। এটাকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টাও করা হয়েছে।

তারপরই প্রমাণ হয়, আমেরিকান হাই অফিশিয়ালরা এই সন্ত্রাসী হামলাকে সফল করার কাজে সহযোগিতা করেছে—অন্তত পেন্টাগনের এএমসিসি আর নোরাড। একই সাথে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এই হামলার ব্যাপারে আগে থেকে কিছুই জানত না বলে যে প্রচারণা ছিল, তা ছিল ডাহা মিথ্যে কথা। তারা আগে থেকেই এ বিষয়ে খুব ভালো করে জানত। এবং ৯/১১-এর হামলা কিছুতেই সফল হতে পারত না, যদি ইউএস হাই অফিশিয়ালরা সেদিন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরকে নিষ্ক্রিয় থাকার জন্য 'স্ট্যান্ড ডাউন' নির্দেশ না দিত।

বিচার-বিশ্লেষণ করে মনে সন্দেহ জাগে, এসব নির্দেশ সরাসরি পেন্টাগন থেকে এসেছিল। কাজেই এ কথাও মেনে নেয়া কঠিন যে এসবের পিছনে হোয়াইট হাউজের অনুমোদন ছিল না। এ জন্যই আরও অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। সেসব নিয়ে আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

ফ্লাইট ৭৭ :
পেন্টাগনে আঘাত হানা 'জিনিসটা' প্লেন ছিল?

আমেরিকান এয়ারলাইনসের (AA) ফ্লাইট ৭৭ ওয়াশিংটন ডিসি-র ডালেস এয়ারপোর্ট থেকে আকাশে ওঠে সকাল ৮:২০ মিনিটের সময়। ৫৮ জন যাত্রী নিয়ে। ৮:৪৬ মিনিটের পর কয়েক মিনিটের জন্য সেটা নিজের ফ্লাইট পাথ থেকে সরে যায়। রিপোর্টে বলা হয়, এরপর নাকি কিছু জেট ফাইটার স্ক্র্যাম্বল করলে ৮:৫০ মিনিটে আবার নিজের কোর্সে ফিরে যায় প্লেন।

কিন্তু সেটার সাথে রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ৮:৫৬ মিনিটে ট্রান্সপন্ডারও অফ হয়ে যায়। এরপর ইনডিয়ানাপোলিসের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের রেডার স্ক্রিন থেকে হারিয়ে যায় ফ্লাইট ৭৭। কিন্তু সেবার কোনো জেট ফাইটার স্ক্র্যাম্বল করেনি সেটাকে ইন্টারসেপ্ট করতে। ৯:০৯ মিনিটে এয়ার কন্ট্রোলার সতর্কতামূলক বার্তা পাঠায়, ফ্লাইট ৭৭ খুব সম্ভব ওহায়ও (Ohio) রাজ্যে বিধ্বস্ত হয়েছে।

ইউএসএ টুডে এ ব্যাপারে পরে এক রিপোর্ট ছাপে এবং তার সাথে এক বিবরণে জানায় 'আরও একটা প্লেন রেডার থেকে হারিয়ে গেছে এবং সম্ভবত কেন্টাকিতে বিধ্বস্ত হয়েছে। রিপোর্টগুলোকে এত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় যে এফএএ প্রধান জেন গারভি তৎক্ষণাৎ হোয়াইট হাউজের সাথে যোগাযোগ করে জানান আরও একটা প্লেন বিধ্বস্ত হয়েছে।

সে যাই হোক, অফিশিয়াল ব্যাখ্যা অনুযায়ী ৯:২৫ মিনিট পর্যন্ত ফ্লাইট ৭৭ সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। উধাও হয়ে যাওয়ার ২৯ মিনিট পর, ৯:২৫-এ ডালেস এয়ারপোর্ট এয়ার কন্ট্রোলার রিপোর্ট করে, একটা দ্রুতগামী প্লেন দেখতে পেয়েছে তারা। সম্ভবত হোয়াইট হাউজের দিকে যাচ্ছে সেটা। রিপোর্ট অনুযায়ী ৯:২৭ মিনিটে ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনি ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর, কন্ডোলিৎসা রাইসকে হোয়াইট হাউজের নিচের বাংকারে জানানো হয়, রেডার একটা অজ্ঞাত পরিচয় প্লেনকে ট্র্যাক করেছে ওয়াশিংটনের ৫৫ মাইল বাইরে আছে সেটা। সম্ভবত এদিকেই আসছে।

৯:৩৩ মিনিটে রেডারের ডেটায় দেখানো হয়, প্লেনটা ক্যাপিটল বেল্টওয়ে

BanglaBook.org

অতিক্রম করে পেন্টাগনের দিকে যাচ্ছে। প্লেনটা ৯:৩৫ মিনিটে পেন্টাগনের আকাশে পৌঁছায়, এবং গ্রাউন্ড লেভেলের ৭ হাজার ফুট উপর থেকে মাটির দিকে নাক সই করে কঠিন এক ডাইভ শুরু করে। পাক খেতে খেতে আড়াই মিনিটের মধ্যে এই উচ্চতা পেরিয়ে আসে সেটা। সরকারী ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফেল্ডকে তখনও প্লেনটার কথা জানানো হয়নি। তখনও রিপ্রেজেনটেটিভ কক্সের সাথে ছিলেন তিনি, টিভিতে ডাব্লিউটিসি ভবনের ঘটনার লাইভ কভারেজ দেখছিলেন। রিপোর্ট অনুযায়ী তখনও নাকি রামসফেল্ড আরেক ভবিষ্যদ্বাণী করেন এই বলে—'বিলিভ মি, ঘটনা এখনও শেষ হয়নি। আরও একটা হামলা হতে যাচ্ছে। এবার 'বোধহয়' আমরা তার লক্ষ্য হবো।'

এর কয়েক মুহূর্ত পর, ৯:৩৮ মিনিটের সময় পেন্টাগনে হামলা হয়। ফলে নিহত হয় ১২৫ জন সাধারণ শ্রমিক।

পরে যদিও দাবি করা হয়েছিল যে, পেন্টাগনের উপর বিধ্বস্ত হওয়া প্লেনটা ছিল ফ্লাইট ৭৭। কিন্তু সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। একটা বিশালাকার বোয়িং ৭৫৭ ছিল সেটা। অথচ ডালেস এয়ারপোর্টের ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের মধ্যে যে প্রথম সেটাকে রেডর স্ক্রিনে দেখেছে, সেই ড্যানিয়েল ও'ব্রায়ান বলেছেন, 'প্লেনটার গতি, অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত বাঁক নেয়া ইত্যাদি দেখে রেডার রুমের আমরা সবাই ভেবেছি ওটা সম্ভবত মিলিটারি প্লেন হবে।'

পেন্টাগন শহরের এক বাসিন্দা তার ১৪ তলা অ্যাপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে প্লেনটা দেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'ওটার আকার দেখে মনে হচ্ছিল, বড়জোর ৮ থেকে ১২ জন প্যাসেঞ্জার ধরবে ওটায়।' এবং সেটা 'ফাইটার প্লেনের মত কানে তালা লাগানো তীক্ষ্ণ শব্দ করে উড়ে গেল।'

স্পেস নিউজ-এর সম্পাদক লন রেইনস। তিনিও প্লেনটার আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী। রেইনস বলেছেন, 'আমি ভাবলাম ওটা হয়ত মিসাইল হবে। তীব্র গতিতে ছুটে আসছিল। শব্দ শুনে সেটাকে মোটেও এয়ারপ্লেনের মতো লাগেনি।' আরেক প্রত্যক্ষদর্শী গাড়ি ড্রাইভ করা অবস্থায় জিনিসটাকে দেখতে পান। রিপোর্ট অনুযায়ী তিনি বলেছেন, 'জিনিসটাকে তার ডানাওয়ালা ক্রুজ মিসাইল মনে হয়েছে।' কিন্তু অফিশিয়াল ব্যাখ্যায় দাবি করা হয়, ওটা নাকি অনেক বড় একটা এয়ার ক্র্যাফট ছিল। বোয়িং ৭৫৭ ছিল—ফ্লাইট ৭৭।

সেদিন ১০:৩২ মিনিটে এবিসি নিউজ রিপোর্ট করে ফ্লাইট ৭৭ হাইজ্যাক হয়েছে। কিন্তু সে খবরে এমন কোনো আভাস ছিল না যে, সেটা ওয়াশিংটনে ফিরে এসে পেন্টাগনের উপর বিধ্বস্ত হয়েছে। তার একটু পর ফক্স টিভির খবরে বলা হয়, পেন্টাগনে একটা ইউএস এয়ার ফোর্স ফ্লাইট আঘাত হেনেছে। দুপুরের পর কোনো এক সময় সাধারণভাবে মেনে নেয়া হয় ওটা ফ্লাইট ৭৭ ছিল।

কিন্তু কিছু কিছু সমালোচক সরকারী ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেন। প্লেনটার পরিচিতি মানতে রাজি হননি তাঁরা। তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ফরাসি গবেষক থিয়েরি মেইসান। ভল্টেয়ার নেটওয়ার্কের প্রেসিডেন্ট তিনি। *গার্ডিয়ান* পত্রিকা ২০০২ সালের

BanglaBook.org

এপ্রিল মাসে ছাপা হওয়া এক নিবন্ধে সংস্থাটিকে সম্মানিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিংক ট্যাংক বলে বর্ণনা করে। মেইসানের বিরোধীতার জবাবে পরে পেন্টাগনের অফিশিয়ালরাও পাল্টা বিরোধীতা করেছিলেন অবশ্য।

২০০২ সালের ২৫ জুন ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স-এ নিউজ ব্রিফিঙের সময় স্পোকপারসন ভিক্টোরিয়া ক্লার্ককে সাংবাদিকরা মেইসানের থিয়োরি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন 'সেদিন কি ঘটেছিল তা নিয়ে কারও মনে সন্দেহ নেই। আমার ধারণা, কারও এ ধরনের বানোয়াট কাহিনী প্রচার করা ঠিক হবে না। ওই ধরনের মানুষদের কথা নিয়ে লেখালেখি করা উচিত হবে না।'

বোঝাই যায় ভেতরের সত্যি যা-ই হোক না কেন, পেন্টাগন চাইছিল সাংবাদিকদের নিরাশ করতে এবং মেইসানের থিয়োরিকে বানোয়াট কাহিনী বলে প্রচার করতে। কেউ যাতে সেটা পড়তে আগ্রহী না হয়। মেইসানও প্রায় একই ভাষায় বুশ প্রশাসনের অফিশিয়াল ব্যাখ্যাকে আক্রমণ করে বলেন 'ওগুলো হচ্ছে দ্য অ্যাপালিং ফ্রড বা মর্মন্তুদ জালিয়াতি।'

তবে দু' পক্ষ পরস্পরকে যা ইচ্ছে বলুক না কেন, তাতে সমস্যা মিটবে না। প্রশ্ন হলো প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা কোনটাকে সত্যি বলে মেনে নেবো?

সূত্র নির্ভরযোগ্য?

মেইসান বলেন, পেন্টাগনে হামলা চালানো প্লেনটা বোয়িং ৭৫৭ ছিল, নাকি কোনো মিলিটারি প্লেন ছিল, সে ব্যাপারে এক মিলিটারি পার্সোনেলের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়েছেন তিনি। পেন্টাগনের ওয়েবসাইটে প্রথমে দাবি করা হয় 'একটা কমার্শিয়াল এয়ারলাইনার, সম্ভবত হাইজ্যাক করা' বিধ্বস্ত হয়েছে পেন্টাগনের উপর। তারপর সেদিনই দুপুরের দিকে মিডিয়ার মাধ্যমে খুব দ্রুত প্রচার হয়ে যায় যে ওটাই ছিল এএ ফ্লাইট ৭৭।

মিডিয়া সেই ফ্লাইটের খবর প্রচার করে, রেডার স্ক্রিন থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে প্লেনটা ইউ-টার্ন নিয়ে ওয়াশিংটনের দিকে যেতে থাকে। কিন্তু মেইসান দাবি করেন, অফিশিয়াল বক্তব্যেই বলা হয়েছে সিভিলিয়ান এয়ার কন্ট্রোলাররা ফ্লাইট ৭৭ সম্পর্কে রেডার বা ট্রান্সপন্ডারের মাধ্যমে কোনো তথ্যই পাচ্ছিলেন না। কাজেই এ দাবি বানোয়াট। মেইসান জোর দিয়ে দাবি করেছেন, 'এ তথ্য নিশ্চয়ই মিলিটারি সূত্র থেকে এসেছে।'

অন্য একজনের ব্যাখ্যাকে ফ্লাইট ৭৭-এর সাথে পেন্টাগনে হামলা চালানো এয়ার ক্র্যাফটকে এক করে দেখানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। কাজটা করেন ইউএস জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের সলিসিটর জেনারেল থিওডর (টেড) ওলসেন। তিনি বলেছেন তাঁর স্ত্রী, বারবারা ওলসেন ফ্লাইট ৭৭ থেকে ৯:২৫ মিনিট ও ৯:৩০ মিনিটে দু'বার টেলিফোন করেছিলেন তাঁকে। বারবারা ওলসেন একজন বহুল পরিচিত লেখক ও টিভি ভাষ্যকার। টেলিফোনে বারবারা অবশ্য বলেননি তাঁদের প্লেন সেই মুহূর্তে কোথায় ছিল

BanglaBook.org

বা কোনদিকে যাচ্ছিল। তবে এর ফলে একটা বিষয় বোঝা গেছে, ফ্লাইট ৭৭ ওই সময় পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়নি।

সমালোচকরা বলেন, টেড ওলসেনের বিপক্ষে অন্তত চারটা দিক আছে যেগুলো নিয়ে সন্দেহ করা যায়। এক নম্বর কারণ হচ্ছে তিনি বুশ প্রশাসনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মানুষ। ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বুশের জয় নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে তিনি সুপ্রিম কোর্টে বুশের পক্ষে ওকালতি করেন। তাছাড়া এনরন (Enron) কেলেঙ্কারীর কথা ফাঁস হয়ে গেলে তদন্ত কমিটি যখন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনির জ্বালানি বিষয়ক কাজকর্মের দলিল পরীক্ষা করে দেখার উদ্যোগ নেয়, ওলসেন তখন চেইনির পক্ষে আইনি লড়াই করে জয়ী হন।

দু' নম্বর, ওলসেন একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'সরকারী কর্মকর্তারা প্রয়োজন মনে করলে আইনসিদ্ধভাবেই মিথ্যে তথ্য সরবরাহ করতে পারেন।' তিন নম্বর, ওলসেন তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা হওয়ার যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে বেশ ফাঁক ছিল। চার নম্বর, অন্য সব ফ্লাইট থেকে একাধিক প্যাসেঞ্জার ও ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট ফোন করেছে বলে জানা গেলেও ফ্লাইট ৭৭-এর বেলায় একমাত্র বারবারা ওলসেনই টেলিফোন করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

ওলসেনের শেষের এই দাবিটি বিশেষ করে রহস্যজনক। কারণ সরকারী ব্যাখ্যা অনুযায়ী ৯:৩০ মিনিটে ফ্লাইট ৭৭-এর হাইজ্যাকাররা নাকি যাত্রীদেরকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল যে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের সবাইকে মরতে হবে। তাই তারা যেন যার যার পরিবার-পরিজনের সাথে কথা বলে নেয়। থম্পসন প্রশ্ন তুলেছেন এরকম ঘোষণা দেয়ার পরও যাত্রীদের মধ্যে থেকে আর কেউ তাদের আপনজনদের কাছে ফোন করল না কেন? একমাত্র বারবারা ওলসেনই কেন করল? আরও অনেক যাত্রীই তো ছিল সেটায়।

এর মধ্যে পল থম্পসনের অনুচ্চারিত যে প্রশ্নটি ছিল, তা হলো বারবারা ওলসেন সত্যিই কি তাঁর স্বামীকে কল করেছিলেন ফ্লাইট থেকে? এসব প্রশ্নের জবাব মিলতে পারে আদালত যদি বারবারা ওলসেনের সেল ফোন কোম্পানির কাছে তাঁর কল রেকর্ড চেক করে দেখতে চায়। অথবা যদি আমেরিকান এয়ারলাইনস ও জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে তলব করে।

এর সঙ্গে আরও যে সব প্রসঙ্গ জড়িত আছে; যেমন বারবারা ওলসেনের শেষ পরিণতি কি হয়েছিল, বুশ প্রশাসনের ৯/১১-এর মহাপরিকল্পনার সাথে টেড ওলসেন কোনোভাবে জড়িত ছিলেন কি না, তিনি সেটার বলি হয়েছেন কি না, এসব প্রশ্নের জবাবও আমাদেরকে জানতে হবে। বিষয়টা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ৯ নম্বর অধ্যায়ে।

BanglaBook.org

পেন্টাগনে বোয়িং ৭৫৭ বিধ্বস্ত হয়নি

পেন্টাগনে যে এয়ার ক্র্যাফট হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে এবং সেটার সাথে ফ্লাইট ৭৭ কে জড়ানোর চেষ্টাকে কেন্দ্র করে পরে যে বিতর্ক ওঠে, তার উৎস ছিল একটা সন্দেহজনক সূত্র। মেইসান এ বিষয়ে দ্বিতীয় বিতর্ক শুরু করেন এই বলে যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখে বোঝা যায় বিধ্বস্ত হওয়া প্লেনটা ফ্লাইট ৭৭ বা বোয়িং ৭৫৭, কেনোটাই ছিল না।

এর স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যাবে এয়ার ক্র্যাফটটা বিধ্বস্ত হওয়ার পর পরই তোলা ছবিগুলোয় ভালো করে চোখ বোলালে। এ ধরনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ছবি তুলেছিলেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের টম হোরান। হামলা ঘটার পর সবে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি পেন্টাগনে পৌঁছেছে, ফায়ার ক্রুরা তখনও কাজ শুরু করতে পারেনি, এমন সময় টম হোরান সেই ছবিটা তুলেছিলেন। মেইসানের লেখা *পেন্টাগেট* এবং *৯/১১ দ্য বিগ লাই* বইয়ের প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে সেটা। ওই ছবি যখন তোলা হয়, তখন ওয়েস্ট উইং-এর সামনের অংশ অক্ষত ছিল।

একটু পর তোলা আরেক ছবিতে দেখা যায় একই জায়গায় ১৫ থেকে ১৮ ফুট ব্যাসের একটা গর্ত হয়ে আছে। অথচ একটা খবরের কাগজে লেখা হয় গর্তটা 'পাঁচ তলা সমান উঁচু আর ২০০ ফুট চওড়া' ছিল। একই ছবিতে দেখা গেছে সেটার উপরে বা আশেপাশে আর কোনো ক্ষতি হয়নি। কোনো বিধ্বস্ত প্লেনের চিহ্নও ছিল না তাতে—এয়ার ক্র্যাফটের ফিউজিলাজ, টেইল, উইং বা ইঞ্জিন, কিছুই নেই। সেখানকার লনও ছিল পরিষ্কার। অর্থাৎ যা-ই আঘাত করে থাকুক সেখানে, সোজা আকাশ থেকে পড়েছে সেটা এবং পেন্টাগনের ভেতরে ঢুকে গেছে।

ঠিক কতখানি ভিতরে ঢুকেছে এয়ার ক্র্যাফট, পেন্টাগনের প্রকাশ করা একটা ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। ছবিটা মেইসানের *পেন্টাগেট*-এর প্রচ্ছদেও ব্যবহার করা হয়েছে। সেটায় দেখা গেছে পেন্টাগনের পাঁচটা নিরাপত্তা দেয়াল বা ফাইভ রিংস-এর সি রিং নামে পরিচিত তিন নম্বর দেয়ালে সাত ফুট ব্যাসের একটা ছিদ্র হয়ে গেছে। অর্থাৎ সেটা যা-ই হোক না কেন, ছয়টা রিইনফোর্সড দেয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ার মত প্রচণ্ড ক্ষমতা ছিল সেটার।

বুশ প্রশাসনের অফিশিয়াল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রকট এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে ছবিটা। কারণ ওটায় পেন্টাগনের ক্ষয়ক্ষতির যে চিত্র ফুটেছে, তাতেই প্রমাণ হয় জিনিসটা আর যা-ই হোক, বোয়িং ৭৫৭ কখনই হতে পারে না। সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে ওঠে ছিদ্রের ব্যাস। সেখানে যে মাপের ব্যাস দেখা গেছে, তা যদি ৭৫৭-এরই হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে সেটার বড়জোর নাকের কিছু অংশ ভেতরে ঢুকতে পেরেছে।

তাহলে এতবড় প্লেনটার মূল দেহ, অর্থাৎ ফিউজিলাজ, বিশাল দুই ডানা, ইঞ্জিন, লেজ, এইসব তাহলে গেল কোথায়? সেগুলোর তো বাইরের লনে পড়ে থাকার কথা।

BanglaBook.org

মেইসান এ প্রশ্ন তুলে বলেন :

> প্লেনের নাক ধাতুর তৈরি হয় না, হয় কার্বন ফাইবারের তৈরি। ডানার সাথে ফিট করা থাকে ফিউয়েল ট্যাংক; সংঘর্ষ ঘটলে যেটায় আগুন ধরে যাওয়ার কথা। এছাড়া ফিউজিলাজ হয় অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি এবং ইঞ্জিন হয় স্টিলের। কাজেই সংঘর্ষ ঘটলে প্লেনে আগুন ধরে যেত এবং পেন্টাগনের লনে আমাদের সেটার পোড়া ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু টম হোরান বা আর কোনো ক্যামেরাম্যানের তোলা ডজন ডজন ছবির একটাতেও আগুনে পোড়া কোনো ধ্বংসাবশেষের চিহ্নও ছিল না। এই সমস্যার কথা চিন্তা করেই হয়ত অফিশিয়াল ব্যাখ্যায় দাবি করা হয় কেবল নাকই নয়, আস্ত প্লেনটাই ভেতরে ঢুকে গেছে। এই জন্যই ওটাকে কোনো ছবিতে দেখা যায়নি। কিন্তু ছবিগুলো দেখলে যে কেউ নিশ্চিতভাবে বুঝবে কর্তৃপক্ষের ওরকম দাবির কোনো ভিত্তি নেই।

কারণ কথিত প্লেনের ধাক্কায় পেন্টাগনের রিঙে যে ছিদ্র হয়েছে, সেটার ব্যাস বড়জোর ১৮ ফুট হবে। একটা বৃহদাকার বোয়িং ৭৫৭-এর ধাক্কায় ওই গর্তের সৃষ্টি হয়েছে এবং বোয়িংটা সেই ছোটো গর্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে দাবি করা কি অস্বাভাবিক নয়? ওটা দিয়ে বড়জোর প্লেনের প্যাসেঞ্জার কেবিন ঢুকতে পারে, কিন্তু ওটার ডানার বেড় তো ১২৫ ফুট। সেটার কি হলো? এমন দাবি কোন পাগলে বিশ্বাস করবে যে, ২০ ফুটেরও কম ব্যাসের একটা গর্ত দিয়ে ১২৫ ফুট চওড়া ডানার একটা বোয়িং ঢুকে গেছে?

চালাকি ধরা পড়ে যেতে অফিশিয়াল ব্যাখ্যা সমর্থনকারীদের কেউ কেউ কথা ঘুরিয়ে ফেলেন। তারা দাবি করতে থাকেন, প্লেনটা যখন রিইনফোর্সড্ কংক্রিটের মজবুত পশ্চিম উইং ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে, তখন সেটার ডানা দুটো ঝাঁকিতে পিছনদিকে ভাঁজ হয়ে গেছে এবং 'সম্ভবত' প্লেনের সাথে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তাদের একজনের বক্তব্য এরকম

> বোয়িং ৭৫৭ যখন পেন্টাগনের দেয়ালের উপর এসে পড়ে, তখন সম্ভবত ডানা দুটো পিছনদিকে ভেঙে ফিউজিলাজের সাথে সেঁটে যায় এবং প্লেনের সাথে ভিতরে ঢুকে পড়ে। পরে তা বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যায় অথবা আগুনে পুড়ে যায়।

এই ব্যাখ্যাতেও বড় ধরনের গড়বড় ধরা পড়েছে মেইসানের দাবি অনুযায়ী। তিনি সে দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, প্লেনের নাক পেন্টাগনের দেয়ালে যদি আছড়ে পড়েই থাকে, তাহলে সেগুলোর পিছনদিকে ভাঁজ হয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ কাইনেটিক বা গতিবিদ্যার সূত্র তা বলে না। সে সূত্র বলে, একটা প্লেন প্রচণ্ড বেগে চলার সময় তার গতি হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে পড়লে ডানা পিছন দিকে নয়, বরং ঝাঁকি খেয়ে সামনের দিকে ভাঁজ হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

তাছাড়া বোয়িং ৭৫৭ প্যাসেঞ্জার লাইনারের স্টিলের তৈরি বিশাল বিশাল ইঞ্জিন ডানায় ফিট করা থাকে। ধাক্কা লাগলে সেগুলো প্রচণ্ড গতিতে পেন্টাগনের দেয়ালে আছড়ে পড়বে এবং দেয়ালের অনেক ক্ষতি হবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো ছবিতেই সেরকম কোনো আলামত দেখা যায়নি। ১৮ ফুটের গর্ত ছাড়া দেয়ালে আর কোনো ধরনের আঘাতের চিহ্ন ছিল না।

এরপরও যদি কেউ দাবি করে ওটা বোয়িং ৭৫৭-ই ছিল, তাহলে সেটার টেইলের প্রসঙ্গ তোলা যায়। বোয়িং ৭৫৭-এর লেজ হয় বিশাল। চল্লিশ ফুট দীর্ঘ হয় লেজ, প্রায় চারতলা বিল্ডিঙের সমান উঁচু। গর্ত দিয়ে প্লেন ঢুকলে সেটার লেজও ঢুকবে, অথবা বাড়ি খেয়ে ভেঙে যাবে। কিন্তু গর্তের উপরের দেয়াল একদম পরিষ্কার। সেখানে কোনো ধরনের আঘাতের চিহ্নও নেই। থিয়েরি মেইসান ফরাসি অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেটর ফ্রাঁসোয়া গ্রেইঞ্জারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'ছবিতেই স্পষ্ট প্রমাণ আছে, কোনো প্লেনের ওই পথ দিয়ে ভিতরে ঢোকার প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর।'

এ ক্ষেত্রে আরও একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেটা হলো, পেন্টাগনে যা-ই আঘাত করে থাকুক না কেন, অফিশিয়াল ব্যাখ্যার সাথে ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে সেটা যে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারলে প্রশাসনের মুখ রক্ষা হতে পারত, তা-ও সেটা করতে পারেনি। বোয়িং ৭৫৭-এর দেহ লম্বা আর ডানা দীর্ঘই শুধু নয়, সব মিলিয়ে প্লেনটার ওজন হয় ১০০ টনেরও বেশি। ওরকম দানবীয় আকৃতির একটা আকাশযান যখন ঘণ্টায় ২৫০ থেকে ৪০০ মাইল গতিতে এসে কিছুর উপর আছড়ে পড়ে, তখন সেটার ক্ষতিটাও হয় সেই রকম ভয়াবহ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হয়নি।

তারপরও ইউ. এস. ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্সের তরফ থেকে সাংবাদিকদের মাঝে বিতরণ করা ছবিতে দেখা গেছে, প্লেনটা পেন্টাগনের প্রথম নিরাপত্তা রিংটাকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে পেরেছে। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিঙে মাত্র ৭ ফুট ব্যাসের একটা ছিদ্রের সৃষ্টি করতে পেরেছে, যা দিয়ে একটা ছোটো এয়ার ক্র্যাফট ভেতরে ঢুকে থাকতে পারে বলে ধরে নেয়া যায়। এ প্রসঙ্গে মেইসান আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। সেটা হলো বোয়িং বিমানের নাক ধাতুর নয়, কার্বন ফাইবারের তৈরি হয়। তার ভিতরে থাকে প্লেনের ইলেক্ট্রনিক নেভিগেশন সিস্টেমের যাবতীয় যন্ত্রপাতি। কাজেই বাকি অংশ প্রায় ফাঁপাই থাকে বলতে গেলে।

বোয়িঙের ওই অংশটা হয় 'এক্সট্রিমলি ফ্রাজাইল' বা সম্পূর্ণ ভঙ্গুর। ওরকম একটা নাকের পক্ষে পেন্টাগনের তিনটা দেয়াল ভেদ করে ঢুকে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। বোয়িঙের নাক কিছু ছিদ্র করে ভিতরে ঢোকার বদলে বরং আঘাত লাগামাত্র চুরমার হয়ে যাবে। যে ছিদ্র পেন্টাগনের দেয়ালে দেখা গেছে, সেরকম ছিদ্র কোনো ৭৫৭-এর দ্বারা কখনই তৈরি করা সম্ভব হতে পারে না। কাজটা একমাত্র কোনো মিসাইলের মাথার পক্ষেই সম্ভব।

বিশেষ ধরনের কিছু ওজনদার মিসাইল আছে যেগুলোর এরকম ছিদ্র করার মতো প্রচণ্ড শক্তি আছে। এসব তৈরি করা হয় ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম দিয়ে।

BanglaBook.org

অত্যন্ত ঘন ধাতব সেটা, সামান্যতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং অনায়াসে যে কোনো বাধা পেরিয়ে যেতে পারে। এ ধরনের মিসাইল বাংকার বা পরিখা উড়িয়ে দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। একটা প্লেন বিধ্বস্ত হলে চুরমার হয়ে যায়, কিন্তু এ ধরনের মিসাইল নিজে বিধ্বস্ত না হয়ে পথে পড়া সবকিছুকে বিধ্বস্ত করে।

প্লেনের পরিবর্তে কোনো মিসাইলই যে এ কাজটি করেছে, বিভিন্ন ছবিতে তার স্বপক্ষে নমুনাও পাওয়া গেছে হাইড্রোকার্বন আগুনের মধ্যে। টুইন টাওয়ারে জেট ফিউয়েলের কারণে যে আগুন লাগে, তাতে কালো ধোঁয়ার সাথে আগুনের হলুদ শিখাও দেখা গেছে। কিন্তু পেন্টাগনের আগুনে দেখা গেছে কেবল লাল শিখা। যার অর্থ দাঁড়ায়, ওগুলো যে ধরনের মিসাইল হতে পারে বলে একটু আগেই আলোচনা করা হলো, তারই সৃষ্ট আগুন ছিল সেটা।

তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি উত্তপ্ত এবং তাৎক্ষণিকভাবে আগুন ধরে যেতে সক্ষম ধরনের। এর ফলে ধরে নেয়া যেতে পারে, পেন্টাগনে আঘাত করেছিল লেটেস্ট জেনারেশনের এজিএম-টাইপ মিসাইল। থিয়েরি মেইসানের মতে, এ ধরনের মিসাইল তাৎক্ষণিকভাবে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। তার উত্তাপ এমনকি ৩,৬০০° ফারেনহাইটের চেয়ে বেশিও হতে পারে।

পেন্টাগনের প্রথম রিং ভেদ করতে এয়ার ক্র্যাফট (মিসাইল) আগুন সৃষ্টি করে, যেমন বিশাল তেমনি তাৎক্ষণিক। ভবনের ভিতর থেকে উঁচু আগুনের শিখা ছোঁড়ার ব্যবস্থা করা হয়, পেন্টাগনের সদরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে সে আগুন। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় চারদিক।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্সের তরফ থেকে সাংবাদিকদের সরবরাহ করা ছবিতে প্রশাসনের ব্যাখ্যার বিপরীতে আরেকটা বাড়তি প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেটা হলো পেন্টাগনের দিকে ধাবিত মিসাইলটিকে তাৎক্ষণিকভাবে অন-সাইট মিসাইল ছুড়ে ঘায়েল করেনি কর্তৃপক্ষ। কোনো কোনো রিপোর্টে যদিও দাবি করা হয়েছে যে, হোয়াইট হাউজের মতো মিসাইল নিরাপত্তা ব্যবস্থা পেন্টাগনের নেই। কিন্তু থিয়েরি মেইসানের মতে পেন্টাগনের একটা-দুটো নয়, পাঁচটা 'এক্সট্রিমলি সফিস্টিকেটেড অ্যান্টি মিসাইল ব্যাটারি' আছে।

তাছাড়া পেন্টাগনের অফিশিয়ালরা 'কোনো এয়ার ক্র্যাফট তাদের দিকে ধেয়ে আসছে বলে তাদের জানা ছিল না' বলে যে কৈফিয়ত দিয়েছে, মেইসান তারও জবাব দিয়েছেন। সকাল ৯:২৫ মিনিটের সময় ওয়াশিংটন ডিসি-র ডালেস এয়ারপোর্টের এয়ার কন্ট্রোলার জেনারেল ওয়ার্নিং বা সাধারণ সতর্কবাণী প্রচার করে যে, একটা দ্রুতগামী প্লেন দেখতে পেয়েছে তারা। কন্ট্রোলার সতর্ক করে, সেটা সম্ভবত হোয়াইট হাউজের দিকে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

পেন্টাগনের দাবির উল্টোটাই আসলে ঠিক, মিলিটারি খুব ভালো করেই জানত যে একটা অজ্ঞাত পরিচয় উড়ন্ত যান সরাসরি ক্যাপিটল হিলের দিকে যাচ্ছে। তবু তারা তৎপর হয়নি বা পেন্টাগনের অ্যান্টি-মিসাইল ব্যাটারিগুলো কিছুই করেনি। কেন? তাদের ক্লোজ রেঞ্জ অ্যান্টি-এয়ার ক্র্যাফট ডিফেন্স কেন এগিয়ে আসতে থাকা মিসাইলকে সময়মতো ধ্বংস করেনি? সাধারণত যেখানে কোনো মিসাইলেরই পেন্টাগনের দিকে আসতে পারার কথা নয়, সেখানে একটা বোয়িং ৭৫৭-২০০ বিমানের তো প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই এর ব্যাখ্যা খুঁজে দেখা প্রয়োজন।

থিয়েরি মেইসান এই অস্বাভাবিক ঘটনার অন্য একটা হাইপোথিসিস হাজির করেছেন। সেটা এরকম

মিলিটারি এয়ার ক্র্যাফটের ট্রান্সপন্ডার বিশেষ ধরনের হয়ে থাকে। অন্য এয়ার ক্র্যাফট দেখলে বলে দিতে পারে সেটা *ফ্রেন্ডলি*, নাকি *হস্টাইল*। বন্ধুত্বপূর্ণ, নাকি শত্রুভাবাপন্ন। *ফ্রেন্ডলি* হলে অ্যান্টি-মিসাইল ব্যাটারি স্বভাবতই নীরব থাকে। তাই এটা অসম্ভব নয় যে সেদিন পেন্টাগনে একটা ফ্রেন্ডলি মিসাইল এসে পড়েছিল বলেই তাদের ক্লোজ রেঞ্জ অ্যান্টি-এয়ার ক্র্যাফট ডিফেন্স সেটাকে বাধা দেয়নি।

এয়ার ক্র্যাফটটা বাঁক নিয়ে পেন্টাগনের দিকে যাওয়ার সময় হোয়াইট হাউজের অনেক কাছে চলে এসেছিল। তখন হোয়াইট হাউজের মিসাইল ব্যবস্থা কেন ওটাকে ফেলে দিল না? বিভিন্ন রিপোর্টে এ ব্যাপারে যে প্রশ্ন উঠেছে, মেইসানের হাইপোথিসিস তার জবাবও দিয়েছে সবদিক বিচার-বিশ্লেষণ শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, পেন্টাগন বা হোয়াইট হাউজ উড়ন্ত ক্র্যাফটটাকে বাধা দেয়ার ব্যাপারে তৎপর হয়নি কারণ কর্তৃপক্ষ নিশ্চিভাবেই জানত মুখে তারা যা-ই দাবি করুক না কেন, বাস্তবে ওটা ছিল অন্য কিছু।

সাধারণ একটা ফ্যাক্ট-এর মধ্যে আরও প্রমাণ আছে। তা হলো, ঘটনাস্থলে বিধ্বস্ত হওয়া বোয়িং বিমানের কোনো ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়নি। কেন দেখা যায়নি? প্রশাসনের দাবি, গোটা প্লেন ভিতরে ঢুকে গেছে। তর্ক বাদ দিয়ে যদি সেটাকে সত্যি বলে ধরেও নিই, পেন্টাগনের লনে সেটার পোড়া কিছু ধ্বংসাবশেষ তো থাকা উচিত ছিল। অথবা চেনা যায়, প্লেনের এমন কিছু অংশ। কিছু পাওয়া গিয়েছিল বটে, পেন্টাগনের ভিতরে। আগুন নিভে যাওয়ার পর। কিন্তু সেগুলো তো আসলে সাজানো।

৯/১১-এর পর পেন্টাগন ব্রিফিঙের সময় কাউন্টি ফায়ার চিফ এড প্লগারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এয়ার প্লেনের কোনো টুকরো ইত্যাদি পাওয়া গেছে কি না। তিনি জবাব দেন, 'কিছু ছোটোখাটো টুকরো... তবে বড় কিছু না... ফিউজিলাজের কোনো অংশ বা

BanglaBook.org

জেট ইঞ্জিন বা ওই ধরনের কিছু না।' তার বক্তব্য সমর্থন করে ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স। জানায়, ফ্লাইট ৭৭-এর ছোটোখাটো এটা-সেটা পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটা বিকন এবং দুটো ব্ল্যাক বক্স ছিল। কিন্তু মেইসান বলেন, সেগুলো খুব সম্ভব অন্য কিছুর অংশ হবে।

দাবি করা হয়, প্লেনটার ব্ল্যাক বক্স ভোর ৪:০০ টার দিকে পাওয়া গেছে। এতে সমালোচকরা নতুন করে সন্দেহ পোষণ করেন। ফায়ার চিফের বক্তব্যকে ১৫ সেপ্টেম্বর পেন্টাগনে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে অফিশিয়ালি সমর্থন জানানো হয়। সেখানে পেরি মিচেলের কাছে ফ্লাইট ৭৭-এর ধ্বংসাবশেষের কিছু নমুনা দেখতে চাইলে তিনি বলেন, 'ছোটো ছোটো কিছু অংশ আছে।' রিনোভেশন প্রজেক্টের প্রধান লি এভি বলেন, 'এয়ার ক্র্যাফটের টুকরোগুলো বেশি বড় নয়। দেখে ঠিকমতো বোঝা যাবে না' ইত্যাদি।

এ ধরনের ভাসা ভাসা কথায় কিভাবে বোঝা সম্ভব পেন্টাগনে একটা বোয়িং ৭৫৭ বিমানই বিধ্বস্ত হয়েছিল? ওই প্লেনের ফিউজিলাজ অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, সাধারণ হাইড্রোকার্বন আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হওয়ার জিনিস না সেটা। ইঞ্জিন টেম্পারড্ স্টিলের তৈরি। সহজে গলে যাওয়ার নয়। এতকিছুর পরও বুশ প্রশাসনের অফিশিয়াল ব্যাখ্যায় দাবি করা হয়, সে আগুন এত উত্তপ্ত ছিল যে তাতে সমস্ত ধাতব কেবল পুড়েই যায়নি, কম-বেশি বাষ্প হয়ে উবেও গেছে। এমন দাবি কি বিশ্বাস করার মতো?

প্রথমত, তাদের দাবি অনুযায়ী আগুন এত গরম হলে পেন্টাগনের উপরের ফ্লোরগুলো তার হাত থেকে রেহাই পেল কিভাবে? দ্বিতীয়ত, সে আগুন যদি হাইড্রোকার্বন আগুন হয়ে থাকে, তাহলে মাত্রাছাড়া উত্তপ্ত হবে কেন? তৃতীয়ত, যদি প্লেন ক্র্যাশ করার সময় বিশেষ কিছু ঘটেই থাকে যাতে হাইড্রোকার্বন আগুনের তেজও অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল; হলুদের জায়গায় লাল শিখা উঠছিল তা থেকে, তারপরও কি সেই আগুনের এত বেশি তেজ হতে পারে যাতে অ্যালুমিনিয়াম ও টেম্পারড্ স্টিলের মত ধাতবেরও বাষ্প হয়ে যাওয়া সম্ভব?

ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যার সূত্র কি বলে? অফিশিয়ালরা যদি এই বক্তব্যের উপর নির্ভর করে থাকতে চান, তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ হাইপোথিসিস প্রকাশ্যে পরখ করে দেখা উচিত। পুরনো, অচল কিছু বোয়িং ৭৫৭ বিমানের ইঞ্জিন, ফিউজিলাজে আগুন ধরিয়ে নিয়ে এ পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যেতে পারে।

কেউ যদি ভেবে থাকে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ আছে, তাহলে তাকে আরেক পরীক্ষাতেও সফল হতে হবে। অফিশিয়াল ব্যাখ্যার অন্তত একটা ভার্শন অনুযায়ী জানা যায়, কর্তৃপক্ষ বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিচয় ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলিয়ে নিশ্চিত করেছে। কর্তৃপক্ষই যেখানে দাবি করছে অকল্পনীয় তীব্র আগুনের উত্তাপে প্লেনের অ্যালুমিনিয়ামের ফিউজিলাজ আর টেম্পারড্ স্টিলের ইঞ্জিনও বাষ্প হয়ে গেছে, সেখানে মানুষের চামড়া-মাংস অক্ষত থাকে কি করে? এ-ও সম্ভব?

সে যা-ই হোক, সে পরীক্ষার আর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ ৯/১১-এর অফিশিয়াল ব্যাখ্যার অন্যান্য ঘটনার সাথে এটা দ্বিতীয় ভার্শনে খোলাসা করা হবে। মেইসান জানান ঘটনার ৬ মাস পর, ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে এফবিআই দাবি করে

BanglaBook.org

সেই বোয়িং ৭৫৭ বিমানের বেশিরভাগ অংশ উদ্ধার করেছে তারা। এফবিআই-এর এক মুখপাত্র ক্রিস মারে জানান, 'প্লেনের টুকরোগুলো একটা ওয়্যারহাউসে রাখা আছে। ফ্লাইট ৭৭-এর সিরিয়াল নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা হয়েছে সেগুলো। পরের মাসে নতুন এই ভার্শনকে সমর্থন করেন ফায়ার চিফ এড প্লগার। দেখা গেছে সেদিন তার স্মৃতিশক্তির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

তিনি সেদিন 'মনে করতে পারছিলেন' বোয়িংটা বিধ্বস্ত হওয়ার পর ঘটনাস্থলে সেটার ফিউজিলাজের টুকরো, ডানার কিছু অংশ, ল্যান্ডিং গিয়ার, ইঞ্জিনের খানিকটা, সিট প্রভৃতি 'দেখতে পান' তিনি। এড প্লগার বলেন, 'আই ক্যান সোয়্যার টু ইউ. ইট ওয়াজ এ প্লেন' বা 'আমি আপনাদের কসম করে বলতে পারি ওটা প্লেন ছিল।' পেন্টাগনের সাথে দ্বিমত পোষণ করে তিনি এমন দাবিও করেন, যে দুটো ব্ল্যাক বক্স পেন্টাগন ঘটনার তিনদিন পর ভোর ৪:০০ টার সময় উদ্ধার করে, তার একটাকে তিনি 'সেদিনই' ঘটনাস্থলে দেখেছিলেন।

মনে হতে পারে, ইউএস অফিশিয়ালরা সাংবাদিক ও ৯/১১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশনের সদস্যদের ওয়্যারহাউস বোঝাই ফ্লাইট ৭৭-এর উদ্ধার করা যন্ত্রাংশ দেখিয়ে তাদের এই নতুন ভার্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। অন্তত এটা প্রমাণ হবে যে হাইজ্যাক করা প্লেনটার বেশিরভাগ তারা উদ্ধার করতে পেরেছে। তবে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারব না কোত্থেকে উদ্ধার হয়েছে সেগুলো। পেন্টাগন, ওহায়ও, কেনটাকি না আর কোথাও থেকে।

কর্তৃপক্ষের দেখানো এইসব ফিজিক্যাল এভিডেন্সগুলোকে এড প্লগারের হঠাৎ বেড়ে যাওয়া স্মৃতিশক্তির সাথে মিলিয়ে এই থিয়োরিকে নিশ্চিত করা যাবে না। তাছাড়া এই নতুন ভার্শন এড প্লগারের ১২ সেপ্টেম্বরের বক্তব্যকেই শুধু খণ্ডন করেনি, টিমোথি মিচেল ও রিনোভেশন প্রজেক্টের প্রধান লি এভির ১৫ সেপ্টেম্বরের বক্তব্যকেও সন্দেহের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

যদি প্লেনটার এতসব বড় বড় টুকরো, যেমন ইঞ্জিন, ফিউজিলাজ এবং টেইল সেকশন পেন্টাগনেই থাকত, তাহলে এইসব লোক আগে কেন দেখতে পায়নি সেগুলো? লি এভিকে এয়ার প্লেনের কোনো টুকরো ইত্যাদি পাওয়া গেছে কি না প্রশ্ন করা হলে তিনি কেন বলেছিলেন, 'ফিউজিলাজের কোনো অংশ বা জেট ইঞ্জিন বা ওই ধরনের কিছু পাওয়া যায়নি?' এ নিয়ে আমাদের সাংবাদিকরা কেন প্রশ্ন তোলেননি?

মেইসানের দাবি পেন্টাগনের উপর যা-ই বিধ্বস্ত হয়ে থাকুক, সেটা ফ্লাইট ৭৭ না, আর কিছু ছিল। আমরা দেখেছি বেশ অনেকগুলো প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার এ দাবিকে সমর্থনও করে। পল থম্পসনের রিপোর্ট অনুযায়ী আরও দুটো কারণে তা আরও জোরদার হয়। তার একটা হলো শেষ পর্যন্ত ১৬ অক্টোবর ৯/১১-এর ঘটনায় জড়িত প্লেনগুলোর যে ফ্লাইট কন্ট্রোল ট্রান্সক্রিপ্ট প্রকাশ করা হয়, তাতে দেখা যায় ফ্লাইট ৭৭-এর বিধ্বস্ত হওয়ার অন্তত ২০ মিনিট আগে সেটার ট্রান্সক্রিপ্ট শেষ হয়ে গেছে।

এর পিছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে। তবে একটা সম্ভাব্য কারণন হয়ত এই যে, সরকারী অফিশিয়ালরা প্রেস বা সাধারণ মানুষকে জানতে দিতে চায় না ওই অন্তিম

BanglaBook.org

২০ মিনিটে ফ্লাইট ৭৭-এ আসলে কি ঘটেছিল। দ্বিতীয়টা হচ্ছে একটা নিউজ স্টোরির উপস্থিতি, যেটা এরকম

> পেন্টাগনের মেইন গেট বরাবর রাস্তার ওপাশে একটা গ্যাস স্টেশন আছে শুধু মিলিটারি পার্সোনেলদের জন্য। সেটার এক কর্মচারী জানিয়েছেন, সেদিন আসলে কি ঘটেছিল, তাদের গ্যাস স্টেশনের সিকিউরিটি ক্যামেরায় সে দৃশ্য ধরা পড়েছিল। কিন্তু তিনি সেসব দেখার সময়-সুযোগ পাননি। কারণ ঘটনা ঘটার অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে সেখানে এফবিআই-এর এজেন্টরা হাজির হয় এবং ক্যামেরা থেকে ফিল্ম খুলে নিয়ে যায়।

যদি সেই স্টেশনের কর্মচারী, হোসে ভেলাসকুয়েজের এই বয়ান সত্যি হয়, তাহলে বুঝতে হবে এফবিআই জানত যে একটা এয়ার ক্র্যাফট পেন্টাগনে বিধ্বস্ত হতে যাচ্ছে। নইলে তাদের 'ঘটনা ঘটার কয়েক মিনিটের মধ্যে সেখানে' হাজির হওয়ার ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে? এ ঘটনায় এটাও প্রমাণ হয় এফবিআই অফিশিয়ালদের ভয় ছিল, গ্যাস স্টেশনের ক্যামেরার চোখে হয়ত 'বিধ্বস্ত হওয়ার' ব্যাপারটা ধরা পড়েছে। তারা চায়নি বিষয়টা সাংবাদিক বা সাধারণ মানুষ দেখুক। এর অর্থ হয়ত এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে, কোনো কমার্শিয়াল এয়ার ক্র্যাফট নয়, মিলিটারি মিসাইলই আঘাত হেনেছিল পেন্টাগনে।

সেই ফিল্ম যদি সরকারের দাবিকেই সমর্থন করত, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় প্রশাসন সে কথা গোপন না করে নিজে উদ্যোগী হয়ে ছবিতে কি আছে তা প্রকাশ করত। কাজেই শেষের এই দুই ঘটনা প্রমাণ করে, ফ্লাইট ৭৭-এর ট্রান্সক্রিপ্টের শেষ ২০ মিনিট ও গ্যাস স্টেশনের সিকিউরিটি ক্যামরার ছবির মধ্যে কিছু একটা ছিল যা সরকারের দাবিকে আরও দুর্বল করত।

এয়ারলাইনার দেখা যাওয়ার বিষয়টা কি?

নানান প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখন বুশ প্রশাসনের সাজানো বোয়িং থিয়োরির বিপরীতটাকেই প্রায় প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে, সে সময় কিছু ভুয়া প্রত্যক্ষদর্শীর উদ্ধৃতি দিয়ে কেউ কেউ নতুন থিয়োরি নিয়ে এসে বলছেন, তারা দেখেছেন একটা এয়ার লাইনারই বিধ্বস্ত হয়েছে পেন্টাগনের উপর।

তাদের একজন *সানডে টাইমস*-এ লিখেছেন, 'পেন্টাগনে বোয়িং ৭৫৭ বিধ্বস্ত হয়নি। হয়েছে অন্য একটি প্লেন। এ দৃশ্য অনেকেই নিজের চোখে দেখেছেন।' প্রশাসনের অফিশিয়াল ব্যাখ্যার সমালোচকরা কিভাবে এসব সংশোধনবাদী রিপোর্টের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেন?

এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মনে হয় চারটা উপায় আছে। তার একটা প্রতিষ্ঠা পায় স্ট্যান্ডার্ড ফরেনসিক পয়েন্টের উপর। সেটা এরকম কোনো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর

BanglaBook.org

সাক্ষ্য আর প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের যথার্থতা যদি নিশ্চিত হয়, তাহলে সেটার ওপরেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। ফৌজদারি মামলায় উকিল যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে জোরালো মামলা উত্থাপন করেন, তখন বিবাদি পক্ষের উকিলের প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষীর উপর নির্ভর করে জয়ী হওয়ার অনিশ্চিত আশায় বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না।

কারণ প্রত্যক্ষদর্শীর দেয়া সাক্ষীতে নানান কারণে ভুল থাকতে পারে। ভুল উপলব্ধির কারণে ভুল সাক্ষী দিতে পারে মানুষ, স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ভুল সাক্ষী দিতে পারে, নয়তো প্রতিপক্ষ ঘুষ দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়াতে পারে বলেও তা হতে পারে। কাজেই প্রত্যক্ষদর্শীর কোনো সাক্ষ্য যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাথে না মেলে বা উল্টো কিছু প্রমাণ হয়, তাহলে প্রথমটাকে বাতিল করে দেয়া হয়।

মেইসানের মতে এখানেও সেই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। কিছু সাধারণ মানুষ সাক্ষী দিয়েছেন তারা পেন্টাগনে হামলার সময় একটা আমেরিকান এয়ারলাইনার 'দেখেছেন'। মেইসান এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বিশেষ বিশেষ সময়ে, বিশেষ করে হুজুগের সময় সোশ্যাল সাইকোলজি বা সামাজিক মনস্তত্ত্ব পাইকারি হারে বিমূর্ত কল্পনা ও স্মৃতিনির্ভর হয়ে পড়ে। তখন সে মনে মনে যা দেখার আশা করে তাই 'দেখেছে' বা যা শোনার আশা করে তাই 'শুনেছে' বলে কল্পনা করে।

এ ক্ষেত্রেও সেই মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে। মানুষ খবরে শত শতবার শুনেছে-দেখেছে ডাব্লিউটিসি বিল্ডিঙে হামলা হয়েছে এবং পেন্টাগনে আমেরিকান এয়ারলাইনসের বোয়িং ৭৫৭ বিধ্বস্ত হয়েছে। অতএব হুজুগের আমেরিকায় তখন কিছু লোক সেটাই আউড়ে গেছে। সত্যিকারের এয়ার ক্র্যাফট যদি অন্য কিছু হয়েও থাকে, তবু তাদের বিবেচনায় সেটা তখন বোয়িং ৭৫৭-ই ছিল।

দ্বিতীয় উপায় উল্লিখিত দলটির অনেকের জবানী অনুযায়ী খবর প্রচার করা হয়েছিল যে, সেই এয়ার ক্র্যাফট দেখতে মিসাইল বা মিলিটারি প্লেনের মতো ছিল। শব্দও সেরকম ছিল। উদাহারণ হিসেবে ডালেস এয়ারপোর্টের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার ড্যানিয়েল ও'ব্রায়ানের কথা বলা যেতে পারে।

সেদিন ৯:২৫ মিনিটে রেডার স্ক্রিনে একটা প্লেন দেখা গেছে বলে রিপোর্ট করেছিলেন ও'ব্রায়ান। তিনি বলেন, 'প্লেনটার গতি, ওটার দ্রুত বাঁক নেয়া ইত্যাদি দেখে রেডার রুমে আমরা যারা ছিলাম, তারা সবাই ভেবেছি ওটা সম্ভবত মিলিটারি প্লেন হবে। তাছাড়া পেন্টাগনের এক বাসিন্দাও তার ১৪ তলা অ্যাপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে প্লেনটাকে দেখেছেন। তার কাছে 'আকার দেখে মনে হচ্ছিল ৮ জন থেকে ১২ জন প্যাসেঞ্জার ধরে ওটায়।' এবং সেটা 'ফাইটার প্লেনের মতো কানে তালা লাগানো তীক্ষ্ণ শব্দ করে উড়ে যায়।'

এই বর্ণনার প্রেক্ষিতে মেইসান বলেন, এজিএম-টাইপ মিসাইল দেখতে অবিকল ছোটো সিভিলিয়ান প্লেনের মতই হয়, এবং ফাইটার এয়ার ক্র্যাফটের মত তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ করে সেটা। এরকম বয়ানের ভিত্তিতে যারা মিলিটারি প্লেন দেখেছে বলে সাক্ষী

BanglaBook.org

দিতে এসেছিল, তারা আসলে মিসাইল দেখেছে বলে ধরে নিয়েছেন থিয়েরি মেইসান। সবশেষে, যে সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শী অফিশিয়াল থিয়োরির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন, তারা কিছুটা হলেও মিসাইলের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ভারসাম্য রেখেছেন।

মেইসান পরের দলটাকে বেশি গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন। যদি পেন্টাগনে আঘাতকারী জিনিসটা মিসাইল হয়ে থাকে, তাহলে কেউ কেউ যে বলেছে কমার্শিয়াল লাইনার ছিল সেটা, তার মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণটা একটু আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হুজুগের সময় সোশ্যাল সাইকোলজি বা সামাজিক মনস্তত্ত্ব পাইকারি হারে বিমূর্ত কল্পনা ও স্মৃতিনির্ভর হয়ে পড়ে। তখন মানুষ হুজুগ অনুসারে মনে মনে যা দেখার আশা করে তাই 'দেখেছে,' এবং যা শোনার আশা করে তাই 'শুনেছে' বলে নিজের অজান্তেই কল্পনা করে থাকে।

তবে সেটা যদি বোয়িং ৭৫৭-ই হয়ে থাকে, তাহলে তা অত্যন্ত অবাক করার মত বিষয় হবে। কারণ এ ক্ষেত্রের অত্যন্ত অভিজ্ঞ মানুষ এবং প্রশিক্ষিত চোখ ও কান দেখেছে এবং জবানবন্দি দিয়েছে সেটা হয় মিসাইল ছিল, নয়তো ছোটো মিলিটারি প্লেন ছিল। তাদের রিপোর্টকে বেশি গুরুত্ব দিতেই হবে। বিষয়টাকে ঠিকমতো বোঝার চেষ্টা করলে দেখা যাবে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষী পরস্পরবিরোধী হয়নি, বরং মিসাইল থিয়োরিকে সমর্থনই করেছে।

তৃতীয় উপায়, সবগুলো অফিশিয়াল রিপোর্ট সতর্কতার সাথে যাচাই করলেই দেখা যাবে মানুষ যা দেখেছে বলে তাতে দাবি করা হয়েছে, আসলে সেই জিনিসই দেখেছে কি না। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে পেন্টাগনে একটা এয়ারলাইনারের হামলা করার কথা বলেছে বলে দাবি করা হয়েছে, এরকম ১৯ জনের উপর নতুন এক গবেষণা চালিয়েছেন গেরার্ড হমগ্রেন। তিনি দেখেছেন, তারা আসলে ওরকম কিছু দাবি করেনি। তারা বলেছে, তারা দেখেছে একটা প্লেনকে খুব নিচু দিয়ে উড়ে যেতে। একটু পর বিস্ফোরণের শব্দ পেয়েছে এবং দৃষ্টিসীমার বাইরের পেন্টাগনের দিক থেকে কালো ধোঁয়া উঠতে দেখেছে।

বিষয়টা গুরুত্বহীন মনে হলেও পরে এটাকে পরবর্তীতে আলোচিত দুই এয়ার ক্র্যাফট থিসিসের সাথে যুক্ত করা যাবে। বাকি যারা ছিল, তাদের বেলায় হমগ্রেন কিছুটা সমস্যায় পড়েছেন। যেমন, যারা নিজেদের সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং একটা আমেরিকান এয়ারলাইনারকেই দেখেছেন বলে দাবি করেছিলেন, তাদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ এরকম দাবি আসলে কেউই করেনি বা যারা করেছে, তারা পরে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে নিজেদের আগের দাবি থেকে সরে গেছে। একই ঘটনা *ইউএসএ টুডে*-র মাইক ভল্টারের ক্ষেত্রে ঘটেছে যখন সিবিএস নিউজের ব্রায়ান্ট গামবেল তার ইন্টারভিউ নেন। তাই হমগ্রেন তাঁর গবেষণার সমাপ্তি টানেন এই বলে 'প্রথম ১৯ জন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য অনুযায়ী প্রথমে যা মনে হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তার সবই ভুয়া প্রমাণ হয়েছে।'

পরেরবার আরও ১০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার নেন হমগ্রেন। তাদের বেলাতেও একই সমস্যা দেখা দেয়। কাজেই তিনি বাধ্য হয়ে তাঁর গবেষণার উপসংহার

BanglaBook.org

টানেন এই বলে এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শীও আমি খুঁজে পাইনি, যে সমর্থন করেছে যে পেন্টাগনে ফ্লাইট ৭৭-ই আঘাত করেছিল। তাই আমি অত্যন্ত দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে এই সিদ্ধান্ত না টানতে পারার কোনো কারণ দেখি না যে, পেন্টাগনে আঘাত হানা বস্তুটি নিঃসন্দেহে ফ্লাইট ৭৭ ছিল না। যতক্ষণ না এর বিপরীত কোনো প্রমাণ আত্মপ্রকাশ করে, ততক্ষণ এই বক্তব্যই বহাল থাকবে।

এবার চার উপায়ের সর্বশেষটা নিয়েও আলোচনা করা যাক। হাইপোথিসিস অনুযায়ী এটার বক্তব্য হচ্ছে, দুটো এয়ার ক্র্যাফট পেন্টাগনের দিকে যাচ্ছিল। এই থিসিস অনুযায়ী দুই সেট প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে যারা মিসাইল দেখেছে বলে রিপোর্ট করেছে (ছোটো মিলিটারি প্লেন), এবং যারা প্যাসেঞ্জার জেট দেখেছে বলে (সুনির্দিষ্টভাবে আমেরিকান এয়ারলাইনার) রিপোর্ট করেছে, তাদের দু' পক্ষই সঠিক। ডিক ইস্টম্যান এই দুই পক্ষের অভিমত যাচাই করে বলেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা আসলে তিন ভাগে বিভক্ত।

১. যারা রিপোর্ট করেছে দুই ইঞ্জিনের একটা এয়ারলাইনার ছিল সেটা। লাল ও নীল মার্কিংওয়ালা চকচকে ফিউজিলাজ। নিঃশব্দে ডাইভ দিয়ে অনেক 'নিচে' নেমে এসে, একশো থেকে দু'শো ফুট উপর দিয়ে উড়ছিল। ২. যারা রিপোর্ট করেছে একটা এয়ার ক্র্যাফট 'গাছের মাথা বরাবর' উচ্চতা দিয়ে, '২০ ফুট উঁচু' দিয়ে উড়ে আসছিল... গতি বাড়ছিল, ইঞ্জিনের গর্জনও... একটা মধ্যম আকারের এয়ারলাইনারের চেয়েও ছোটো। এবং ৩. যেমন কেলি নোয়েলস তার দু' মাইল দূরের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে 'দুটো প্লেনকে পেন্টাগনের দিকে যেতে দেখেন। একটা বাঁক নিয়ে দূরে সরে যায়, এবং অন্যটা পেন্টাগনে বিধ্বস্ত হয়।

ইস্টম্যানের প্রথম দুই শ্রেণীর প্রত্যক্ষদর্শীর বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় তারা চোখে দেখেছেন আমেরিকান এয়ারলাইনার, অথচ শুনছেন মিসাইল ছুটে যাওয়ার কানে তালা লাগানো তীক্ষ্ণ বাঁশির মতো শব্দ। এখানে ইস্টম্যানের বিশ্লেষণের মূল কথা হচ্ছে প্রথম দুই শ্রেণীর প্রায় সব সাক্ষীর সাক্ষ্যকেই সঠিক বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। তবে তৃতীয় শ্রেণীর যিনি দুটো এয়ার ক্র্যাফট দেখেছেন বলে দাবি করেছেন, তিনিই পুরো সত্যি কথা বলেছেন।

আরেক অর্থে ইস্টম্যানের থিয়োরির বক্তব্য এরকম একটা আমেরিকান এয়ারলাইনার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ডাইভ দিয়ে নিচে এসে পেন্টাগনের দিকে যেতে থাকে। একই সময় অজ্ঞাত স্থান থেকে সময় হিসেব করে ছোড়া একটা মিসাইল একই দিকে ছুটতে শুরু করে। গন্তব্যে পৌঁছার একেবারে আগ মুহূর্তে এয়ারলাইনার ঘুরে আরেকদিকে চলে যায়। মিসাইল বিধ্বস্ত হয় পেন্টাগনে, ওই সময় আগুন আর ধোঁয়ার মেঘে আকাশ মুহূর্তে ঢেকে যাওয়ার কারণে এয়ারলাইনারটা কোনদিকে গেল কেউ বুঝতে পারেনি। বোঝার চেষ্টাও কেউ করেনি। কারণ যারা সে দৃশ্য চাক্ষুষ করেছে, তাদের সবার নজর আটকে ছিল কালো ধোঁয়ার মেঘ ও আগুনের শিখার দিকে। তারপর লাইনারটা সবার অলক্ষে মাইলখানেক দূরের রিগ্যান ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে গিয়ে ল্যান্ড করে।

BanglaBook.org

এই চারটাই এক্সক্লুসিভ, এর বাইরে কিছু ঘটতে পারে না, ব্যাপারটা তেমন নয় অবশ্য। ইস্টম্যান আর হমগ্রেনের তদন্ত ভিন্ন ভিন্ন পথেই এগিয়েছে, কিন্তু একটা বরং অন্যটাকে সমর্থনই করেছে। যেমন হমগ্রেনের মূল যুক্তি ছিল, যারা দাবি করেছে একটা আমেরিকান এয়ারলাইনারই পেন্টাগনে আঘাত করেছে, তারা আসলে দেখেছে বিস্ফোরণ ঘটার ঠিক আগে একটা এয়ারলাইনার ঘটনাস্থলের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। এর বেশি কিছু নয়। অন্যদিকে ইস্টম্যানের দুই এয়ার ক্র্যাফট থিয়োরি প্রমাণ করেছে চোখে দেখা গেছে একটা এয়ারলাইনার, অথচ পেন্টাগনে যেটা আঘাত হেনেছে সেটা তা নয়।

মেইসানের এই দুই সিদ্ধান্তকে ইস্টম্যান সিদ্ধান্ত বা হমগ্রেন সিদ্ধান্ত; অথবা ইস্টম্যান-হমগ্রেন সিদ্ধান্তে একীভূত করে জোরদার করা যায়। এবার আমি অন্যদিকে নজর দেব। পেন্টাগনে আঘাত হানা জিনিসটা যে ফ্লাইট ৭৭ ছিল না, তা বিশ্বাস করার যে সমস্ত কারণ আছে, সেদিকে নজর দেব আমি।

ওয়েস্ট উইঙে কেন?

পেন্টাগনে এই হামলা তৃতীয় এক সম্ভাবনার সৃষ্টি করে, তা হলো কাজটা ফ্লাইট ৭৭-এর হাইজ্যাকারদের নয়। তাছাড়া আক্রমণের লোকেশনও সম্ভবত পেন্টাগন ছিল না। ধরা যাক, একটা ৭৫৭ জেট বোয়িং হাইজ্যাককারী সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য, পেন্টাগনে আঘাত হানতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তারা ভবনের সামনের অংশে কেন আক্রমণ চালাতে যাবে? পেন্টাগনের ২৯ একর বিস্তৃত ছাদের উপর ডাইভ দিয়ে পড়তে পারত না তারা?

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সন্ত্রাসীদের মূল লক্ষ্য যদি পেন্টাগনই হয়ে থাকে, তাহলে এটাই স্বাভাবিক যে সেখানকার যথাসম্ভব বেশি ক্ষতি করা, বেশি বেশি কর্মচারী হত্যা করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাই যদি হয়, তাহলে পেন্টাগনের ছাদে প্লেন ক্র্যাশ করানোই তো ছিল সবচেয়ে যুক্তিসম্মত। তারা তা করল না কেন? ধরে নিই এ প্রশ্নের জবাব আছে। কিন্তু তারা পশ্চিম উইঙে আঘাত করল কেন? ওটা তো পেন্টাগনের পুরনো অংশ, সংস্কারের কাজ চলছিল ওই অংশে।

লস অ্যাঞ্জেলিস টাইমস এ প্রসঙ্গে রিপোর্ট করেছে সেটাই পেন্টাগনের একমাত্র এলাকা যেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি ছিটানোর স্প্রিঙ্কলার বসানো আছে। যেখানে স্টিলের তৈরি কলাম ও বারের বাধা আছে, ব্লাস্ট রেজিস্ট্যান্ট বা বিস্ফোরণ-প্রতিরোধক জানালা আছে। যে অংশে আঘাত হানলে অন্তত ৪৫০০ মানুষ প্রাণ হারাতে পারত, সেই জায়গা বাদ দিয়ে পশ্চিম উইঙে কেন যেখানে মাত্র ৮০০ মানুষ কাজ করে?

এটা ধরে নেয়াই স্বাভাবিক যে, পেন্টাগনের টপ মিলিটারি ও বেসামরিক অফিসারদের হত্যা করাই এ হামলার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পশ্চিম উইঙে হামলা চালানোর ফলে তাদের একজনও মারা যায়নি। যে ক'জন হতাহত হয়েছে তাদের বেশিরভাগই বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী। তারা পেন্টাগনের ওই অংশের সংস্কারের কাজ করছিল। সামরিক অফিসারদের মধ্যে মাত্র একজন জেনারেল সেই হামলার শিকার হয়।

BanglaBook.org

সন্ত্রাসীরা হাইজ্যাক করা বোয়িং ৭৫৭ নিয়ে যদি আক্রমণই চালাবে, তাহলে এমন জায়গায় কেন করল যেখানে সামান্য ক্ষতি হবে? রেডারের ডেটা অনুযায়ী এ প্রশ্নের উত্তর হলো, পেন্টাগনের আর কোনো অংশে আঘাত হানা *টেকনিক্যালি কঠিন* ছিল। তাই উপর থেকে পাক খেতে খেতে নেমে আসে প্লেনটা।

পাইলট অনভিজ্ঞ ছিল?

প্লেনটা উপর থেকে যেভাবে পাক খেতে খেতে নেমে আসে, তা অফিশিয়াল ব্যাখ্যার বিপরীতে চতুর্থ প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী হাইজ্যাকারদের পাইলট ছিল সামান্য ট্রেইনিং পাওয়া, অনভিজ্ঞ। কাজেই তার পক্ষে অতবড় একটা প্যাসেঞ্জার লাইনার নিয়ে অমন কঠিন একটা ডাইভ দেয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

এ প্রসঙ্গে ইউএস মিলিটারি এক্সপার্ট, স্টান গফ-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে নাফিজ আহমেদ বলছেন, বুশ প্রশাসনের দাবি অনুযায়ী সে ছিল ফ্লোরিডার এক প্রাইভেট ফ্লাইং ক্লাবের অল্প প্রশিক্ষিত এক শিক্ষানবিশ পাইলট। স্কুলের নাম পাডল্-জাম্পার স্কুল ফর পাইপার কাবস অ্যান্ড সেসনাস। সে-ই ছিল 'দ্য রিয়েল কিকার'। যে বিশাল এক বোয়িং নিয়ে দর্শনীয় পাক খেতে খেতে নেমে এসেছে শেষ ৭,০০০ ফুট, মাত্র আড়াই মিনিটে। তারপর ৪৫০ নটিক্যাল মাইল গতিতে পেন্টাগনের... এই পর্যায়ে সামান্য পাডল-জাম্পার স্কুলের গল্প বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। তারপর জানা যায়, তাদের ফ্লাইট সিমিউলেশনের ট্রেইনিংও ছিল।

এ নিয়ে বিতর্ক আরও জোরদার হয় যখন জানা গেল তথাকথিত পাইলট, হানি হানজর কেবল সৌখিনই নয়, একজন অযোগ্য পাইলটও বটে।

নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ লেখা হলো স্টাফ মেম্বাররা বলেন, মিস্টার হানজর অত্যন্ত বিনয়ী, ধৈর্যশীল এবং চুপচাপ স্বভাবের। স্কুলের এক সাবেক কর্মচারী বলেন, তাঁর মতে হানজর খুব বাজে পাইলট। 'ভাবতে গেলে আমি আজও বিস্মিত হই সে কি করে পেন্টাগন পর্যন্ত পৌঁছল! সে তো উড়তেই জানে না।'

সিবিএস নিউজের খবর অনুযায়ী এই ঘটনার কয়েক মাস আগে অ্যারিজোনার একটা ফ্লাইং স্কুলের ম্যানেজার হানজরের নামে এফএএ-র কাছে অন্তত পাঁচবার রিপোর্ট করেছে। সে টেররিস্ট বলে নয়, তার ইংরেজি জ্ঞান এবং ওড়ার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বাজে, তাই।

'মিস্টার হানজরের যে যোগ্যতা, তাতে আমার বিশ্বাসই হয় না যে তার কমার্শিয়াল প্লেন চালানোর লাইসেন্স আছে,' বলেছেন অ্যারিজোনা ফ্লাইট স্কুলের ম্যানেজার পেগি শেভারট।

এরপর কোন পাগলে বিশ্বাস করবে ওরকম এক পাইলট বোয়িং ৭৫৭-এর মতো বিশাল এয়ারলাইনার নিয়ে এমন একটা কাণ্ড ঘটাতে পারে?

BanglaBook.org

ফ্লাইট ৭৭ সত্যিই হারিয়ে গিয়েছিল?

অফিশিয়াল ব্যাখ্যার চরম অসামঞ্জস্যের কারণে পঞ্চম যে প্রশ্নটি উঠেছে, তা হলো ফ্লাইট ৭৭ একটানা ২৯ মিনিট ধরে ওয়াশিংটনের দিকে ছুটেছে, অথচ কোনো রেডার ব্যবস্থা তা টের পায়নি। এ কেমন কথা?

রিপোর্টে জানা গেছে পেন্টাগনের এক মুখপাত্র বলেছেন, 'একটা এয়ার ক্র্যাফট যে আমাদের দিকে ছুটে আসছে, পেন্টাগন একেবারেই কিছু জানত না সে ব্যাপারে।' পল থম্পসন প্রশ্ন করেন, 'এটাও কি বিশ্বাস করার মতো কথা যে আমেরিকার এয়ার স্পেসের মধ্যে একটা প্লেন সবার অলক্ষে আধ ঘণ্টা ধরে নিজের কাজ করে গেল, অথচ কেউ কিছুই জানতে পারল না?'

কর্তৃপক্ষ দাবি করেন, ট্রান্সপন্ডার অফ থাকায় লোকাল এয়ার কন্ট্রোলাররা প্লেনটাকে ট্র্যাক করতে পারেনি। কথাটা যদি সত্যিও হয়, এফএএ-র রেডার সেটার ওয়াশিংটন ডিসিমুখী ফ্লাইট পাথ নিশ্চয়ই ট্র্যাক করতে পারত। তাছাড়া মেইসান জানিয়েছেন, পেন্টাগনের অনেকগুলো সফিস্টিকেটেড রেডার মনিটরিং সিস্টেম আছে এবং সেগুলো দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায় PAVEPAWS ব্যবস্থার কথা।

উত্তর আমেরিকান এয়ার স্পেসের কোনোকিছুই এই ব্যবস্থার নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। PAVEPAWS-এর ওয়েবসাইটে সেটার কাজ ও সক্ষমতা সম্পর্কে যা বলা আছে, তা এরকম ' ডাজ নট মিস এনিথিং অকারিং ইন নর্থ আমেরিকান এয়ারস্পেস। ইট ইজ ক্যাপেবল টু ডিটেক্টিং অ্যান্ড মনিটরিং এ গ্রেট নাম্বার অব টার্গেটস...। যার অর্থ উত্তর আমেরিকার আকাশে কি ঘটে না ঘটে, কোনোটাই তার দৃষ্টি এড়াতে পারে না। একযোগে অনেক লক্ষ্য শনাক্ত ও নজরদারি করতে সক্ষম। সাবমেরিন থেকে আঘাত হানতে সক্ষম ব্যালিস্টিক মিসাইলের নজরদারীতে...।

তারপরও আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে জিনিসটা এতকিছু করতে সক্ষম, সেটা পেন্টাগনমুখী সাধারণ একটা প্লেনকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে? যা যে কোনো সাধারণ রেডারের জন্য কয়েক মুহূর্তের কাজ?

সময়মতো প্রতিহত করা হয়নি কেন?

এতসব প্রশ্নের সাথে আরও একটা নতুন প্রশ্ন ধরা যাক পেন্টাগনে হামলা চালানোর জন্য হাইজ্যাকারদের দখলে থাকা ফ্লাইট ৭৭-ই দায়ি। স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা প্রচলিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়ার মাধ্যমে তা প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি কেন?

সমালোচকদের কাছে এ প্রশ্ন আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পেন্টাগনে হামলা চালানো হয় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দক্ষিণ টাওয়ার ভবন আক্রান্ত হওয়ার আধ ঘণ্টারও বেশি পরে। ওই সময় সেখানকার ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টারের সর্বোচ্চ সতর্ক

BanglaBook.org

অবস্থায় থাকার কথা ছিল। কে না জানে পেন্টাগন পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত স্থাপনা। সেটা অরক্ষিত থাকে কিভাবে? এর কি ব্যাখ্যা হতে পারে? কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যার প্রথম ভার্শন অনুযায়ী আমরা আগেই জেনেছি, আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সেখানকার ফাইটার জেটগুলোকে স্ক্র্যাম্বল করার নির্দেশই দেয়া হয়নি।

যা হোক, এবার আমরা সরাসরি দ্বিতীয় ভার্শন নিয়ে আলোচনা করব। এই ভার্শনের নোরাড ও এফএএ-এর ভাষ্য অনুযায়ী আমরা জেনেছি, তারা ৯:২৪ মিনিট পর্যন্ত কোনো সতর্কবাণী প্রচার করেনি। প্রচার করেনি যে ফ্লাইট ৭৭ হাইজ্যাক হয়েছে এবং সেটা ওয়াশিংটনের দিকে যাচ্ছে। অফিশিয়াল ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটা ফ্লাইট ৭৭-এর সাথে এফএএ-এর রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ৩৪ মিনিট পরের এবং রেডার থেকে সেটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ২৮ মিনিট পরের কথা। তারপর ৯:২৭ মিনিটে নোরাড ল্যাংলি-র এয়ার ফোর্স বেজ থেকে প্লেন স্ক্র্যাম্বল করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু ৯:৩৮ মিনিটে পেন্টাগন আক্রান্ত হওয়ার ১৫ মিনিট পরও প্লেনগুলো জায়গামতো পৌঁছায়নি।

সমালোচকরা এ ঘটনা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন। ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টার বা এনএমসিসি এবং নোরাড নিজেদের সুপিরিয়র রেডার সিস্টেমের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে সেটার ফ্লাইট পাথ বা যাত্রাপথের দিকে নজর রাখেনি কেন? যদি আমরা এই প্রশ্ন অগ্রাহ্যও করি, এফএএ কেন সময় থাকতে সতর্ক হয়নি বিশেষ করে যখন তারা জানতে পারে ৯:০৩ মিনিটের পরপরই দুটো হাইজ্যাক করা প্লেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আঘাত হেনেছে?

'এই দীর্ঘ বিলম্ব কি বিশ্বাসযোগ্য?' প্রশ্ন তুলেছেন থম্পসন। 'নাকি এই তথ্যে কোনো ওস্তাদি খাটানো হয়েছে সময়মতো ফাইটার স্ক্র্যাম্বল করার নির্দেশ না দেয়ার বিষয়টাকে ঢাকা দিতে?' তারপর এফএএ-এর তরফ থেকে নির্দেশ দেয়ার পরও নোরাডের তিন মিনিট দেরি হলো কেন স্ক্র্যাম্বল করার নির্দেশ দিতে? তাছাড়া ওয়াশিংটনের ১৩০ মাইল দূরের ল্যাংলিকে প্লেন স্ক্র্যাম্বল করার নির্দেশ দেয়া হলো কেন, যেখানে তার মাত্র ১০ মাইল দূরেই ছিল অ্যান্ড্রুজ এয়ার বেজ? যেটার সৃষ্টিই হয়েছে ওয়াশিংটন ডিসিকে নিরাপদ রাখার জন্য?

শেষের এই প্রশ্ন সম্পর্কে *ইউএসএ টুডে*-র রিপোর্টে জানা যায়, পেন্টাগন থেকে নাকি তাদেরকে জানানো হয়েছে, অ্যান্ড্রুজ এয়ার বেজে 'সেদিন কোনো ফাইটার ছিল না।' অথচ একই দিনে, একই পত্রিকার অন্য এক খবরে বলা হয় 'অ্যান্ড্রুজ বেজে ফাইটার ছিল, কিন্তু সেগুলোকে সময়মতো সতর্ক করা হয়নি।'

কিন্তু বাইকভ ও জারড ইসরায়েলের দাবি, দুটো অজুহাতই ইউএস মিলিটারি ইনফর্মেশন ওয়েবসাইটের বক্তব্যের বিপরীত। ওয়েবসাইটে বলা আছে অ্যান্ড্রুজ এয়ার বেজে আমেরিকার ১১৩ তম ফাইটার উইঙের ১২১ তম ফাইটার স্কোয়াড্রন সব সময় মজুদ থাকে। ওই স্কোয়াড্রন প্রধানত এফ-১৬ ফাইটার প্লেন নিয়ে গঠিত। তাতে বলা আছে ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সিভিল এমার্জেন্সি পরিস্থিতিতে সাড়া দেয়ার জন্য এই স্কোয়াড্রন প্রস্তুত থাকে এবং মুহূর্তের নোটিসে

BanglaBook.org

আকাশে উঠতে পারে।

শুধু তা-ই নয়, সেখানে ৩২১ মেরিন ফাইটার অ্যাটাক স্কোয়াড্রনও মজুদ থাকে। এই স্কোয়াড্রনে আছে অতি আধুনিক এফ/এ-১৮ হর্নেট বিমান। এছাড়া একটা রিজার্ভ স্কোয়াড্রন থাকে, যার কাজ হচ্ছে প্লেনগুলোকে 'যে কোনো মুহূর্তে আকাশে ওড়ার জন্য প্রস্তুত রাখতে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের দিকে নজর রাখা।' সেখানে ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া এয়ার ন্যাশনাল গার্ড (DCANG)-এরও ঘাঁটি আছে। নিজস্ব ওয়েবসাইটে যার 'মিশন' সম্পর্কে বলা আছে টু প্রোভাইড কমব্যাট ইউনিটস ইন দ্য হাইয়েস্ট পসিবল স্টেট অব রেডিনেস বা যুদ্ধের প্রয়োজনে নিযুক্ত করার জন্য সামরিক ইউনিটসমূহকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সতর্ক রাখা... ইত্যাদি।

এতকিছু যেখানে থাকার কথা, সেখানে একটা ফাইটার ইউনিটও সতর্ক অবস্থায় ছিল না, এটা ডাহা মিথ্যা ছাড়া আর কি হতে পরে? আসল কথা হলো ফাইটার ইউনিট ছিল এবং সে সময় ব্যাপকভাবে প্রচারও করা হয়েছিল যে, পেন্টাগনে হামলার পরপরই অ্যান্ড্রুজের সমস্ত এফ-১৬ উঠে পড়ে এবং ওয়াশিংটনের আকাশে চক্কর দিতে শুরু করে। অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলোর অন্যতম হলো, পেন্টাগন কেন এমন ভুয়া তথ্য সরবরাহ করল?

আরেকটা গুরুতর প্রশ্ন, ৯/১১-এর পরে কিছু কিছু ওয়েবসাইট বদলে ফেলা হয়েছে কেন? সমালোচকরা বলছেন, নোরাড অফিশিয়াল বা এনএমসিসি-র যদি 'প্লেন ছিল না তাই সময়মতো আসতে পারেনি' ধরনের গল্প ফেঁদে মানুষকে বোকা বানানোর ইচ্ছে যদি না-ই থাকে, তাহলে ল্যাংলি থেকে প্লেন স্ক্র্যাম্বল করার নির্দেশ কেন দেয়া হলো বাড়ির কাছে অ্যান্ড্রুজ বিমান ঘাঁটি থাকতে?

তারপরও, ল্যাংলি থেকেও যদি ৯:৩০ মিনিটে এফ-১৬ স্ক্র্যাম্বল করত এবং সর্বোচ্চ গতিসীমার অর্ধেকেরও কম, ৭০০ মাইল বেগেও আসত, ফ্লাইট ৭৭-এর আগেই জায়গামতো পৌঁছে যেতে পারত। এফ-১৬ ফাইটারের সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১,৫০০ মাইল। ১,৩০০ মাইল গতিতে চললেও মাত্র ৬ মিনিটে ল্যাংলি থেকে ওয়াশিংটনে পৌঁছে যেতে পারত সেগুলো। ফ্লাইট ৭৭ বিধ্বস্ত হওয়ার অনেক আগে। তবু এইসব কারণ দেখিয়ে বলা হয়েছে ১৫ মিনিট বেশি দেরিতে পৌঁছেছে প্লেনগুলো। কিন্তু সমালোচকদের দাবি তা অসম্ভব।

জর্জ স্যামুয়েলি বলেন 'এফ-১৬ ফাইটার বহরের ১৫০ মাইল পাড়ি দিতে যদি আধ ঘণ্টা লেগে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সেগুলো ৩০০ মাইল বেগে চলেছে। সর্বোচ্চ ক্ষমতার ২০% কাজে লাগিয়েছে তারা। সে যাই হোক, যদি সেগুলোকে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী অ্যান্ড্রুজ থেকেই স্ক্র্যাম্বল করার অনুমতি দেয়া হতো, তাহলে অনেক বেশি সময় পাওয়া যেত।

আরও গভীর প্রশ্ন পেন্টাগনে হামলা হওয়ার আগে থেকেই ফাইটার বহর ওয়াশিংটন ডিসি-র আকাশে টহল দিতে শুরু করেনি কেন?

ডাব্লিউটিসি-র উত্তর টাওয়ারে হামলা হওয়ার একটু পর নোরাড-এর কমান্ড ডিরেক্টর, ক্যাপ্টেন মাইকেল জেলিনেক এই বলে মন্তব্য করেছেন বলে রিপোর্ট করা

BanglaBook.org

হয়েছে যে, এনএমসিসি-র সাথে টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। অল্প কিছু সময়ের মধ্যে স্ট্রাটেজিক কমান্ড, থিয়েটার কমান্ডারবৃন্দ ও ফেডারাল এমার্জেন্সি-রেসপন্স এজেন্সিগুলো এয়ার থ্রেট কনফারেন্স কলে অংশ নিতে যাচ্ছে। এর একটু পর আরেক রিপোর্টে বলা হয় ওপেন লাইনে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনি, গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত সামরিক অফিসার, এফএএ এবং নোরাড-এর পরিচালকবৃন্দ, হোয়াইট হাউজ এবং এয়ার ফোর্স ওয়ান-এর কর্মকর্তা, সবার কণ্ঠ শোনা গেছে।

রিপোর্টে বলা হয় : এনএমসিসি প্রধান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মন্টাগিউ উইনফিল্ড বলেন, 'এ মুহূর্তে ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকায় যা ঘটছে, তার সাথে যে সমস্ত সরকারী এজেন্সি জড়িত, তার সবগুলো তখন কনফারেন্সে মিলিত হয়েছে।'

পেন্টাগনে হামলা হওয়ার সময়ও সে সম্মেলন চলছিল। এই স্বীকৃত সত্যের মধ্যে একটা কঠিন বাস্তব লুকিয়ে আছে। দেশের বিভিন্ন সর্বোচ্চ পদের এই সমস্ত মহারথী ও এজেন্সিগুলো আগে না হোক, অন্তত ৮:৫৬ মিনিটে ফ্লাইট ৭৭-এর কথিত হাইজ্যাকের পর থেকেই সব ঘটনা জানত।

এটাও জানত, ৯:০৩ মিনিটে ডাব্লিউটিসি-র দক্ষিণ টাওয়ারে ফ্লাইট ১৭৫ বিধ্বস্ত হয়েছে এবং তার জের হিসেবে ওয়াশিংটন থেকে সমস্ত ফ্লাইটের টেক-অফ স্থগিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে থম্পসনের প্রশ্ন: ওয়াশিংটনের প্রতিরক্ষায় একটা প্লেনকেও স্ক্র্যাম্বল করার নির্দেশ না দিয়ে বরং সেখান থেকে উল্টে সমস্ত ফ্লাইটের টেক-অফ জরুরি ভিত্তিতে বন্ধ করে দেয়া হলো। এর কারণ কি?

সবাইকে কেন সরিয়ে নেয়া হয়নি?

দু' নম্বর ডাব্লিউটিসি ভবনে ফ্লাইট ১৭৫ বিধ্বস্ত হওয়ার কিছুক্ষণ আগের এক অস্বাভাবিক ঘটনা আরেক অস্বস্তিকর প্রশ্নের জন্ম দেয়। সেটা হলো হামলা হওয়ার আগে ঘোষণা করা হয়েছিল ভবন নিরাপদ আছে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সবাই নির্ভয়ে যার যার কাজে ফিরে যেতে পারে।

পেন্টাগনে হামলাও প্রায় একই ধরনের প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, অফিশিয়াল ব্যাখ্যাকে যদি সত্যি বলে ধরে নেয়াও হয়। সেটায় বলা হয় ৮:৫৬ মিনিটে রেডার স্ক্রিন থেকে হারিয়ে যায় ফ্লাইট ৭৭। তার ঠিক আগে ওটা ইউ-টার্ন নিয়ে ওয়াশিংটনের দিকে ঘুরে গেছে দেখা গেছে। পেন্টাগনের কর্মচারীরা পেন্টাগনকে ডাকত 'গ্রাউন্ড জিরো' নামে। সেখানে এই নামে একটা স্ন্যাক বারও আছে। সেখানকার অফিশিয়ালরা ডাব্লিউটিসি ভবনে হামলা হয়েছে জানার পরও কেন তৎক্ষণাৎ পেন্টাগন খালি করার নির্দেশ দেননি?

৮:৫৬ মিনিটের পরপরই কাজটা করা হয়নি ঠিক আছে। কিন্তু ৯:২৫ মিনিটে যখন জানা গেল এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার একটা অজ্ঞাত পরিচয়, দ্রুতগামী এয়ার ক্র্যাফট দেখতে পেয়েছে পেন্টাগন আর হোয়াইট হাউজের দিকে যাচ্ছে—তখন কেন করা হয়নি কাজটা? পেন্টাগনে হামলা হতে তখনও ১৩ মিনিট বাকি ছিল। চেষ্টা করলে ওই

BanglaBook.org

সময়ের মধ্যে গোটা পেন্টাগন জনশূন্য করে ফেলা যেত, হয়তো। কেন তা করা হয়নি?

এ প্রশ্নের জবাবে পেন্টাগনের একজন মুখপাত্র বলেছেন 'পেন্টাগন পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল না যে এয়ার ক্র্যাফটটা আমাদের দিকেই আসছে।' বিশেষ করে দাবি করা হয়, ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফেল্ড ও তার টপ সহযোগীরা হামলা হওয়ার আগ পর্যন্ত জানতেনই না যে এতবড় একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। অথচ গোটা পরিস্থিতি বলে ভিন্ন কথা।

নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর মতে ৮:৪৬ মিনিটে ডাব্লিউটিসি-র উত্তর টাওয়ারে বিমান হামলা হওয়ার পর পেন্টাগনের পুব অংশে ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টারের হাই অফিশিয়ালরা আইন প্রয়োগকারী ও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের সাথে জরুরি বৈঠকে বসে পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এদিকে অফিশিয়াল ব্যাখ্যা এরকম এফএএ ৯:২৪ মিনিটে নোরাডকে জানিয়েছিল—ফ্লাইট ৭৭ মনে হয় ওয়াশিংটন ডিসির দিকে ঘুরে গেছে।

থম্পসনের প্রশ্ন এ কথা কি বিশ্বাস করার মতো যে পেন্টাগনের কর্মচারীরাসহ স্বয়ং ডিফেন্স সেক্রেটারি, ডোনাল্ড রামসফেল্ডও এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না?

যদি বিশ্বাস করার মতো না হয়, তাহলে পশ্চিম উইঙের এতগুলো মানুষকে কেন জেনেশুনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হলো?

মেইসান থিয়োরির প্রতিক্রিয়া

মেইসানের থিয়োরি প্রকাশ হওয়ার পরপরই সরকারের পক্ষ থেকে তার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। ২০০২ সালের ২ এপ্রিল এফবিআই এ ব্যাপারে একটা বিবৃতি প্রকাশ করে। তাতে বলা হয় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এএ ফ্লাইট ৭৭ পেন্টাগনে বিধ্বস্ত হয়নি, সে কথা চিন্তা করাও অন্যায় হবে। তাহলে প্লেনটির ৫৯ জন যাত্রী এবং পেন্টাগনে সন্ত্রাসীদের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞে নিহত ১২৫ জন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্মৃতির প্রতি অন্যায় করা হবে।

একই মাসের শেষদিকে ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্সের পক্ষ থেকে ভিক্টোরিয়া ক্লারিসের নামে আরেক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। তাতে তিনি বলেন আমার মনে হয় এই ধারণাটাই হাস্যকর এবং চূড়ান্তভাবে অবিশ্বাস্য। পেন্টাগনে সেদিন যে প্রায় ৯০০ মানুষ নিহত হয়েছেন তাঁদের আত্মীয়-পরিজন, পরিবারের সদস্য ও বন্ধু, এবং নিউ ইয়র্কে নিহত কয়েক হাজার হতভাগ্যের প্রতি এটা ছিল এক দুঃখজনক তামাশা।

মেইসান স্বীকার করেন, পেন্টাগনে নিহত হওয়া ১২৫ জন নিরীহ মানুষকে সন্ত্রাসীরা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নিষ্ঠুর পন্থাতেই হত্যা করেছে। কিন্তু তিনি অফিশিয়াল থিয়োরিতে যাদেরকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দেয়া হয়, তাদের পরিচয় মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন, ঘটনার শিকার এবং তাদের বন্ধু, আত্মীয়-পরিজনদের কাছে এই ঘটনার জন্য যারা দায়ী, সেইসব সন্ত্রাসীর পরিচয় জেনেশুনে কেউ গোপন করে থাকলে সেটাও হবে এক ধরনের তামাশা। এ জন্য কে দায়ি, এ প্রশ্নে তিনি প্রশাসনের সাথে দ্বিমতের কথা জানান। এই অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগের কারণে

BanglaBook.org

কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

আমরা চাই পেন্টাগনে হামলার ঘটনার পূর্ণ তদন্ত হোক। সেই সাথে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলারও তদন্ত হোক। এ প্রশ্নে বুশ প্রশাসনের অফিশিয়াল ব্যাখ্যার বিপরীতে মেইসানসহ অন্যান্য সন্দেহবাদীরা যে সমস্ত অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলেছেন, আমরা চাই সেসবের সত্য-মিথ্যা যেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে দেখা হয়।

পেন্টাগনে হামলার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি যদি যোগ করা হয়, পরিচিতি পর্বের সম্ভাব্য দর্শনগুলোর তৃতীয়টা তাহলে মনে হয় বাতিল হয়ে যায়। সেই দর্শন অনুযায়ী কোনো ইউএস অফিশিয়াল সে হামলার পরিকল্পনার সাথে জড়িত ছিল না। কিন্তু সে বিষয়ে অফিশিয়াল ব্যাখ্যার বিপরীতে সমালোচকরা যে পাল্টা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন ; বিশেষ করে মেইসান, তাতে প্রমাণ হয় জড়িত ছিল। তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। কারণ একমাত্র ইউএস মিলিটারি এয়ার ক্র্যাফটেই বিশেষ ধরনের ট্রান্সপন্ডার থাকে, যেগুলো বলতে পারে *ফ্রেন্ডলি* ক্র্যাফট কোনটা, আর *হস্টাইল* ক্র্যাফট কোনটা। পেন্টাগনের অ্যান্টি মিসাইল ব্যাটারিগুলো সেই অনুযায়ীই কাজ করে।

যদিও এই ফ্লাইট সম্পর্কে পাওয়া তথ্যে হয়তো দেখা যাবে মিলিটারির মধ্যকার কিছু দুর্বৃত্ত এ কাজ ঘটিয়েছে। তবে আগের দুই ঘটনায় এনএমসিসি যে পেন্টাগনের অফিশিয়ালদের জড়িয়ে ফেলেছিল, তা এরমধ্যে প্রমাণ হয়ে গেছে। তাছাড়া ডাব্লিউটিসি টাওয়ার ও পেন্টাগনে হামলা সম্পর্কে ডোনাল্ড রামসফেল্ডের ভবিষ্যদ্বাণীর গল্প যদি সত্যি হয়, তাহলে পেন্টাগনের সিভিলিয়ান হেড সম্ভবত জানতেন হামলা কখন হবে।

***

এই তিন ফ্লাইট নিয়ে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, তার সারমর্ম দাঁড়াল এই যে, ৯/১১-এর হামলা সম্পর্কে যে অফিশিয়াল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তার বিপরীতে প্রচারিত সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দুটো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। তা হলো আমাদের সরকার ও মিলিটারি নেতারা হয় অবিশ্বাস্যরকম অযোগ্য, নয়তো এই ভয়াবহ দুষ্কর্মের সাথী।

এবং কানাডার আন্তর্জাতিক পুরস্কার-বিজয়ী সাংবাদিক, ব্যারি জুইকারের মতে 'অযোগ্যতা সাধারণত যা অর্জন করে, তা হলো কঠোর তিরস্কার। এ জন্যই আমি জানতে চাই, অন্যান্য মিডিয়ারও জানতে চাওয়া উচিত, সেদিন বুশ প্রশাসন 'স্ট্যান্ড ডাউন' অর্ডার জারি করেছিল কি না।

এ প্রশ্নের জবাবটাও জুইকার নিজেই দিয়েছেন এই ভাষায় পুরো নাটক ঘটল দুই ঘণ্টা ধরে, অথচ সব শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইন্টারসেপ্টরগুলোর এফটার চাকা পর্যন্ত ঘুরল না। কেন? যে সমস্ত এয়ার ক্রুদের মিনিটের মধ্যে 'স্ক্যাম্বল' করার জন্য দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, এটা কি তাদের অযোগ্যতা? এইসব সাধারণ প্রশ্নের যে জবাব পাওয়া যাবে, তা এক কথায় অগ্রহণযোগ্য। বিশ্বাস করা কঠিন। আপনি যত প্রশ্ন করবেন, ততই নতুন নতুন ব্যাখ্যা হাজির হতে থাকবে। বুঝতে পারবেন ৯/১১-এ যা ঘটেছিল, তার সাথে ইউ. এস. মিলিটারির শীর্ষ অফিসার, ইন্টেলিজেন্স ও রাজনৈতিক

BanglaBook.org

নেতারা জড়িত ছিলেন।

গোর ভিডালও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তিনি বলেন, সত্যিকারের কারণ হয়তো আমরা কোনোদিনই জানতে পারব না। তবে এক ঘণ্টা বিশ মিনিট ধরে গোটা পুব উপকূলের এয়ার ফোর্সের নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার বিষয়টা কোনো 'ব্রেক ডাউন' হতে পারে না। এটা নিশ্চয়ই 'স্ট্যান্ড-ডাউন' নির্দেশ থাকার কারণে ঘটেছে। সেদিন দেশের প্রচলিত বাধ্যতামূলক স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরকে সিজ অ্যান্ড ডিসিস্ট (cease and desist) বা 'বিরত ও নিবৃত্ত' থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

জুইকার ও ভিডালের মতে প্রশাসনের 'অযোগ্যতা' নয়, নিখাদ 'দুষ্কর্ম' কাজ করেছে সেদিন এবং সেটা 'ব্রেক ডাউন' ছিল না, ছিল 'স্ট্যান্ড-ডাউন'। এ জন্যই ডাব্লিউটিসি টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা একশ ভাগ সফল হয়। তাদের সুরে সুর মিলিয়ে মাইকেল প্যারেনটিস বলেছেন, রাজনৈতিক নেতারা কখনো কখনো নিজেদের 'অযোগ্যতাকে' পিঠ বাঁচানোর একটা আবরণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। এভাবে তারা বেআইনী কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদের সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার বিষয়টিকে সযত্নে এড়িয়ে যান।

অযোগ্যতার এই স্বীকারোক্তিকে এরপর 'ব্যগ্রতার সাথে আঁকড়ে ধরেন কিছু কিছু ভাষ্যকার।' কারণ নিজেদের নেতাদেরকে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতারণার' বদলে 'অযোগ্যতার' অভিযোগে ভুগতে দেখলে তারা সন্তুষ্ট হন।

'এ দেশে সেটাই কি ঘটেছে?' জারড ইসরায়েলের মতামতের উপর আলোচনার সময় প্রশ্ন করেছেন নাফিজ আহমেদ।

ক্রিস্টেন ব্রিটওয়েইজারের স্বামী মারা গেছেন ডাব্লিউটিসি টাওয়ার বিধ্বস্ত হয়ে। পরে একদিন ফিল ডোনাহিউর টেলিভিশন শো-তে তিনি বলেন 'আমি বুঝি না একটা প্লেন কিভাবে আমাদের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টকে আক্রমণ করতে পারে... তা-ও আবার প্রথম টাওয়ারে একটা প্লেন বিধ্বস্ত হওয়ার এক ঘণ্টা পরে! আমি বুঝি না কিভাবে তা সম্ভব। আমি যুক্তি মেনে চলা মানুষ। আমরা প্রতি বছর আধা ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করি দেশের প্রতিরক্ষা খাতে, অথচ তারপরও আপনি বলেছেন একটা প্লেন ইচ্ছে করলেই পেন্টাগনে হামলা চালাতে পারে... প্রথম টাওয়ার আক্রান্ত হওয়ার এক ঘণ্টা পর?'

যে কারণেই হোক না কেন, যাত্রীবাহী কোনো কমার্শিয়াল প্লেন রেডার থেকে উধাও হয়ে গেলে বা সেটার ট্রান্সপন্ডার অফ হয়ে গেলে অথবা রেডিও কমিউনিকেশন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু নিয়ম ও প্রটোকল অনুসরণ করার কড়া বিধান আছে। অথচ সেদিন তার কোনোটাই অনুসরণ করা হয়নি। কেন হয়নি, সে প্রশ্নের জবাব কি আশা করতে পারেন না স্বামীহারা ক্রিস্টেন ব্রিটওয়েইজার?

***

একটা কৌতূহল জাগানো পাদটীকা আমি যখন এই পৃষ্ঠার প্রুফ দেখছি (অক্টোবর ১২, ২০০১), ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফেল্ড পেন্টাগনে এক সাক্ষাৎকারে তখন বলছিলেন 'যে "মিসাইলের" আঘাতে এই বিল্ডিঙের ক্ষতি হয়েছে... !'

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

ফ্লাইট ৯৩-কে ভূপাতিত করা হয়েছে?

প্রথম তিনটি ফ্লাইটের ব্যাপারে মূল যে সমস্যা দেখা দেয়, তা হলো সেগুলোর মধ্যে কোনটা পেন্টাগনে হামলা চালিয়েছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। এবং যে প্লেনটাকে গুলি করে ফেলে দেয়া উচিত ছিল, সেটাকে ফেলা হয়নি। এ বিষয়ে সমালোচকরা বলছেন, ইউএ ফ্লাইট ৯৩-এর পরিণতি দেখা দিয়েছে বিপরীত সমস্যা হয়ে। ওটাকে গুলি করে ফেলে দেয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। পল থম্পসন তাঁর *টাইমলাইন* থেকে এই উপসংহার টেনেছেন।

সেটার প্রথম অংশের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে ফ্লাইট ৯৩ নিউআর্ক এয়ার পোর্ট থেকে আকাশে ওঠে নির্ধারিত সময়ের ৪১ মিনিট পরে, ৮:৪২ মিনিটে। টম ব্রুনেট নামে সেটার এক যাত্রী ৯:২৭ মিনিটে তার স্ত্রীকে টেলিফোন করে বলে তাদের প্লেন হাইজ্যাক হয়ে গেছে। সে যেন এফবিআইকে খবরটা জানায়। তার স্ত্রী তাই করে। ৯:২৮ মিনিটে গ্রাউন্ড কন্ট্রোলাররা ফ্লাইট ৯৩ থেকে চিৎকার ও মারপিটের শব্দ শুনতে পায়। ৯:৩৪ মিনিটে ব্রুনেট আবার স্ত্রীকে ফোন করে এবং ডাব্লিউটিসি বিল্ডিঙে সন্ত্রাসী হামলার খবর শুনে বুঝতে পারে, তাদের প্লেন কোনো 'সুইসাইড মিশনে' ব্যবহারের জন্য হাইজ্যাক করা হয়েছে।

৯:৩৬ মিনিটে ফ্লাইট ৯৩ ওয়াশিংটনের দিকে ঘুরে যায়। ৯:৩৭ মিনিটে জেরেমি গ্লিকসহ সেটার আরও দুই যাত্রী ডাব্লিউটিসি বিল্ডিঙে হামলার কথা জানতে পারে। ৯:৪৫ মিনিটে টম ব্রুনেট তার স্ত্রীকে বলে, হাইজ্যাকাররা দাবি করছে তাদের কাছে বোমা আছে। কিন্তু সে তা মনে করে না। তাই আরও কয়েকজন যাত্রীকে নিয়ে সে কিছু একটা করার প্ল্যান করছে। সেই সময়ে এফবিআই ফ্লাইট ৯৩-এর টেলিফোন কল মনিটর করছিল। প্লেনটা ভূপাতিত হওয়ার ১৯ মিনিট আগের কথা এটা। ৯:৪৫ মিনিটে টড বিমার নামে আরেক যাত্রী এক ভেরিজন প্রতিনিধির সাথে দীর্ঘ ফোনালাপে তাকে প্লেনের ভেতরের পরিস্থিতি খুলে বলে।

৯:৪৭ মিনিটের পরপরই জেরেমি গ্লিক তার স্ত্রীকে ফোন করে জানায়, যাত্রীরা সবাই হাইজ্যাকারদেরকে পাল্টা আক্রমণ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে আরও জানায়, হাইজ্যাকারদের কাছে অস্ত্র বলতে কেবল ছুরি আছে। পিস্তল বা আর কোনো

BanglaBook.org

আগ্নেয়াস্ত্র নেই। তাদের কাছে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না বলে যাত্রীরা অনেক আশাবাদী ছিল যে, তারা চেষ্টা করলে প্লেনটাকে দখলমুক্ত করতে পারবে। ৯:৫৪ মিনিটে টম ব্রুনেট আবার স্ত্রীকে টেলিফোন করে। বলে 'আমি জানি আজ আমরা সবাই মরব। এখানে আমরা তিনজন কিছু একটা করার চেষ্টা করছি।' পরেরবার কথা বলার সময় তাকে আরও আশাবাদী মনে হয়। 'সব আমাদের উপর নির্ভর করে,' বলছিল সে। 'আশা করি আমরা পারব।' তারা যে প্লেনের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিতে যাচ্ছে, সে কথাও বলে টম ব্রুনেট। তাদের মধ্যে একজন পেশাদার পাইলট ও একজন ফ্লাইট কন্ট্রোলারও ছিল।

থম্পসনের *টাইমলাইন* মতে পরের ঘটনা এরকম যখন ধারণা জন্মায় যে যাত্রীরা সবাই মিলে হাইজ্যাকারদের পরাজিত করতে যাচ্ছে, তখনই প্লেনটাকে গুলি করে ফেলে দেয়া হয়। ৯:৫৭ মিনিটে এক হাইজ্যাকারকে বলতে শোনা যায়, ককপিটের বাইরে যাত্রীদের সাথে তাদের হাতাহাতি হচ্ছে। তার মধ্যে একটা গালা বলে ওঠে 'ধর ব্যাটাদের!' ৯:৫৮ মিনিটে যাত্রীরা হাইজ্যাকারদের 'ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছে,' এ কথা বলে লাইন কেটে দেয় টড বিমার। তারপরই শোনা যায় তার বিখ্যাত শেষ ক'টি কথা 'আর ইউ রেডি গাইজ? লেট'স রোল! (তোমরা সবাই রেডি? তাহলে শুরু করা যাক)।'

৯:৫৮ মিনিটে এক মহিলা যাত্রী তার স্বামীকে ফোনে জানায় 'মনে হয় ওরা পারবে কাজটা করতে। ওরা ককপিটে ঢোকার চেষ্টা করছে।' একটু পরই আবার তাকে উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠতে শোনা যায় 'দে আর ডুইং ইট! দে আর ডুইং ইট! দে আর ডুইং ইট!' একই মুহূর্তে অনেকগুলো আর্তকণ্ঠের চিৎকার-চেঁচামেচিও শুনতে পায় তার স্বামী। তার সাথে বাতাসের তীব্র বেগে ছোটাছুটির বিকট 'হু-উশশশ!' ধরনের শব্দও তার কানে আসে। তারপর আরও অনেকগুলো কণ্ঠের চিৎকার। তারপর টেলিফোন লাইন কেটে যায়।

আরেক যাত্রী সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কয়েক মুহূর্ত আগে পরিচিত একজনের সাথে টেলিফোনে বলছিল বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছে সে। প্লেন থেকে প্রচুর সাদা ধোঁয়া বের হতে দেখেছে। কিন্তু ঘটনার কয়েক মাস পর এফবিআই জানায়, ফ্লাইট ৯৩ থেকে সেদিন এরকম কোনো কল করা হয়নি যাতে বিস্ফোরণের শব্দ আর ধোঁয়ার কথা বলা হয়েছে। আবার ফোনটা যাকে করা হয়েছিল, মিডিয়ার সামনে তাকে মুখ খুলতেও দেয়নি এফবিআই।

জেরেমি গ্লিকের ওপেন ফোন লাইনের কথাবার্তা আরেক লোকও শুনতে পেয়েছিল সেদিন। তিনি জানান 'কথা শেষ হতে দু'মিনিটের মতো নীরব ছিল লাইন। তারপর একটা মেকানিক্যাল শব্দ হয়। এরপর ফের চিৎকার-কান্নাকাটি। সবশেষে আরও একটা মেকানিক্যাল শব্দ... তারপর লাইন নীরব হয়ে যায়।'

একটা খবরের কাগজের রিপোর্ট অনুযায়ী আরও জানা যায় 'সূত্রগুলো বলছে, ককপিট ভয়েস রেকর্ডারে সবশেষে শোনা যায় বাতাসের শব্দ। বোঝা যাচ্ছিল প্লেনের ফিউজিলাজ ফুটো হয়ে গেছে। থম্পসনের ধারণা, এই রেকর্ড সঠিক কথাই বলেছে। ফুটো হয়ে গিয়েছিল ফ্লাইট ৯৩-এর ফিউজিলাজ। মিসাইল ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়

BanglaBook.org

ওটাকে। যে মুহূর্তে মনে করা হচ্ছিল যাত্রীরা প্লেনটা দখল করে নিতে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে। ককপিট টেপের রেকর্ডিং আর অফিশিয়াল সূত্র প্লেনটির পতনের যে সময় দাবি করে, থম্পসন তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্লেনটির নিহত যাত্রীদের আত্মীয়-স্বজনদের সে টেপ বাজিয়ে শোনানোর অনুমতি দেয়া হয়েছিল। রেকর্ডিং শুরু হয়েছিল ৯:৩১ মিনিটে। দীর্ঘ ৩১ মিনিট চলার পর ১০:০২ মিনিটে তা শেষ হয়।

সময়টা ফ্লাইট ৯৩ ভূপাতিত হওয়ার কাছাকাছি হবে। যদি বুশ প্রশাসনের দাবি অনুযায়ী সেটা ১০:০৩ মিনিটেই ঘটে থাকে। তবে এক সাইজমিক স্টাডিতে দেখা যায় ১০:০৬ মিনিটের সামান্য পরে ভূপাতিত হয় ফ্লাইট ৯৩। ১০:০৩ মিনিট থেকে ১০:০৬ মিনিট, মাঝের এই তিন মিনিট কি ঘটেছে? এই ৩ মিনিটের রহস্যময়তা নিয়ে *ফিলাডেলফিয়া ডেইলি নিউজ* একটা খবর ছাপে যার শিরোনাম ছিল *থ্রি-মিনিট ডিসক্রিপেন্সি ইন টেপ* বা টেপে তিন মিনিটের গরমিল।

থম্পসনের প্রশ্ন : টেপের শেষ তিন কি চার মিনিটের মধ্যে কি ঘটেছিল?

শুধু ফ্লাইট ৯৩-এর রেকর্ডের এই গরমিলই নয়। ১৬ অক্টোবর বুশ প্রশাসন যখন ৯/১১-এর ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্লেনগুলোর ফ্লাইট কন্ট্রোল ট্রান্সক্রিপ্ট প্রকাশ করে, তার মধ্যে ফ্লাইট ৯৩-এর ট্রান্সক্রিপ্ট ছিল না।

ওটাকে যে গুলি করে ফেলে দেয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায়, সেদিন ৯:৫৬ মিনিটের পরপরই ফাইটারগুলোকে হাইজ্যাককারীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা যে কোনো প্লেনকে ইন্টারসেপ্ট করতে এবং গুলি করে ফেলে দিতে বলা হয়েছিল। এক রিপোর্টে জানা যায়, নির্দেশ জারি করার একটু পরই এক মিলিটারি এইড ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনিকে বলে '৮০ মাইল দূরে একটা প্লেন দেখা গেছে। একটা ফাইটার আছে ওই এলাকায়। আমরা কি ওটাকে বাধা দেব?'

জবাবে চেইনি বলেন 'ইয়েস।'

এরপর একটা এফ-১৬ ছুটে যায় ফ্লাইট ৯৩-কে ইন্টারসেপ্ট করতে। তারপর চেইনিকে আরও দুবার একই প্রশ্ন করা হয় : 'আমরা বাধা দেব?'

দুবারই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ইয়েস।'

এনএমসিসি-র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উইনফিল্ড পরে বলেছেন 'এক সময়ে ঝামেলা শেষ করার সময় ঘনিয়ে এসেও আবার পিছিয়ে যায়। এনএমসিসিতে তখন কিরকম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি ছিল, বুঝতেই পারছেন।'

রিপোর্টে জানা যায়, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে ১০:০৮ মিনিটে যখন ওটাকে ভূপাতিত করার খবর দেয়া হয়, তখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন 'আমরা গুলি করে ফেলেছি? নাকি নিজে থেকেই ক্র্যাশ করেছে?' এসব প্রশ্ন থেকে বোঝা যায়, ফ্লাইট ৯৩ কে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে অনেকের চিন্তা কাজ করেছে। প্লেনটা ক্র্যাশ করার একটু পর সিবিএস টেলিভিশন রিপোর্ট করে দুটো এফ-১৬ ফাইটার পিছু নিয়ে ওটাকে ফেলে দিয়েছে। রিপোর্টে জানা যায়, মিডিয়ার সামনে এ প্রসঙ্গে মুখ খুলতে নিষেধ করার পরও এক ফ্লাইট কন্ট্রোলার তা অগ্রাহ্য করে বলেন 'একটা এফ-১৬ ধাওয়া করে ফ্লাইট ৯৩-কে... কমার্শিয়াল জেটটার পিছনে সেঁটে থাকতে ৩৬০ ডিগ্রি বাঁক নেয়

BanglaBook.org

এফ-১৬।'

ওই এলাকায় সেদিন যে এফ-১৬ ফাইটার দেখা গেছে, সে ব্যাপারে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সমর্থনও পাওয়া গেছে। *ইন্ডিপেন্ডেন্ট*-এর রিপোর্ট অনুযায়ী 'কম করেও আধা ডজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন... দ্বিতীয় একটা প্লেন অনেক নিচু দিয়ে উড়ছিল... কমার্শিয়াল লাইনারটার বিধ্বস্ত হওয়ার জায়গায়। তাদের বর্ণনা অনুযায়ী সেটা ছিল ছোটো, সাদা রঙের জেট। পিছনে ইঞ্জিন। শনাক্ত করার মতো কোনো মার্কিং ছিল না।'

এফবিআই দাবি করে ওটা একটা ফেয়ারচাইল্ড ফ্যালকন ২০ বিজনেস জেট। কিন্তু এক মহিলা সে দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন 'সেটা অবশ্যই মিলিটারি প্লেন ছিল... পিছনে একজোড়া ইঞ্জিন ছিল... স্পয়লারের মত বিশাল ফিনও ছিল পিছনে... অবশ্যই কোনো এক্সিকিউটিভ জেট ছিল না ওটা। এফবিআই আমার সাথে দেখা করেছে, বলেছে আমার বর্ণনা অনুযায়ী কোনো প্লেন ছিল না সেখানে। কিন্তু আমি জানি ছিল। ক্র্যাশের আগে। আমার মাথার ৪০ ফুট উপরে। কিন্তু ওরা চাইছে এ কাহিনী যেন জানাজানি না হয়।'

মহিলার ব্যাখ্যার সাথে সুর মিলিয়ে আরও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, তারাও একটা সাদা প্লেনই দেখেছেন। ওটার ইঞ্জিন ছিল পিছনে। গায়ে এমন কোনো মার্কিং ছিল না যা দেখে শনাক্ত করা যায়। তারচেয়েও বড় প্রমাণ পাওয়া গেছে যারা সেটাকে গুলি করার শব্দ শুনেছেন, তাদের সাক্ষীতে। অন্য এক মহিলা দাবি করেন, তিনি প্লেনটার উড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেছেন, তারপরই একটা বিকট 'দুম্' শব্দ। খানিক পর আরও দুবার 'দুম্, দুম্' তারপর আর প্লেনের আওয়াজ শোনা যায়নি। অন্য এক প্রত্যক্ষদর্শী একবার 'দুম' শব্দ হতে শুনেছেন। আরেকজন শুনেছেন দুবার। তারপরই ফ্লাইট ৯৩ নাক নিচু করে পড়ে যেতে শুরু করে। অন্য একজন বলেন, 'চলতে চলতে হঠাৎ করে পতন শুরু হয় প্লেনটার। ছুড়ে মারা ঢিলের মত।' আরেক প্রত্যক্ষদর্শী বিকট শব্দের সাথে প্লেনটাকে ডানদিকে কাত হয়ে পড়তে দেখেছেন। তারপরই মাটিতে আছড়ে পড়ে সেটা।

স্যাংকসভিলের মেয়র বলেন, তিনি দুজনকে চেনেন, যারা জানে শব্দটা মিসাইলের ছিল। তাদের একজন ভিয়েতনামে যুদ্ধ করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'ওই শব্দ কিসের, তা বুঝতে তাদের ভুল হয়নি।'

প্লেনটার ধ্বংসাবশেষ কোথায় পড়েছে, সে প্রসঙ্গও আছে রিপোর্টে। প্রায় আধ টন ওজনের একটা ইঞ্জিন পাওয়া গেছে ঘটনাস্থল থেকে এক মাইল দূরে। কিছু প্রত্যক্ষদর্শী আট মাইলের মত দূর থেকেও স্পষ্ট দেখেছে প্লেন থেকে জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ মাটিতে পড়তে। ইনডিয়ান লেক ম্যারিনার কর্মচারীরা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের পরপরই উপর থেকে মণ্ডা-মিঠাই বর্ষণ হলে যেমন দেখায়, ধ্বংসাবশেষের সেরকম একটা মেঘ আশেপাশের খামারগুলোর উপর ঝরে পড়ে। মেঘের চেহারা দেখে বোঝা গেছে ওগুলো মৃত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই হবে। পরে দেখা গেছে তাদের বর্ণনায় কোনো বাড়াবাড়ি ছিল না। আট মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল ফ্লাইট ৯৩-এর হতভাগ্য যাত্রীদের দেহাবশেষ।

প্লেনটাকে যে ভূপাতিত করা হয়েছে, তা পরে অনেক সামরিক ও বেসামরিক

BanglaBook.org

কর্মকর্তাদের বিবৃতিতেও প্রকাশ পেয়েছে। এক রিপোর্টে জানা যায়, সেদিন নিউ ইয়র্ক ও তার আশপাশের আকাশে রুটিন পেট্রল সেরে দুপুরের দিকে ঘাঁটিতে ফিরছিলেন একজন এফ-১৫ পাইলট। তাকে বলা হয়, একটা এফ-১৬ চতুর্থ এয়ারলাইনারটিকে পেনসিলভেনিয়ায় গুলি করে ফেলে দিয়েছে। ১৩ সেপ্টেম্বর আর্মড সার্ভিসেস কমিটির নেয়া ইন্টারভিউতে জেনারেল মেয়ারের বক্তব্য প্রকাশ হওয়ার পর বিষয়টা প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

সে অনুষ্ঠানে সিনেটর কার্ল লেভিন মেয়ারকে প্রশ্ন করেন ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট কোনো এয়ার ক্র্যাফটের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে কি না। তিনি বলেন, 'কিছু কিছু বিবৃতির কথা শোনা যাচ্ছে যেগুলোয় দাবি করা হয়েছে পেনসিলভেনিয়ায় একটা প্লেনকে গুলি করে ফেলে দেয়া হয়েছে।' মেয়ারের জবাব ছিল, 'আর্মড ফোর্সেস কোনো প্লেনকে গুলি করেনি।' কিন্তু ডেপুটি সেক্রেটারি অব ডিফেন্স পল ওলফোউইৎজ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'পেনসিলভেনিয়ায় যে প্লেনটা ক্র্যাশ করেছে এয়ার ফোর্স সেটাকে অনুসরণ করছিল... তবে প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা ফেলে দেয়ার জন্যও প্রস্তুত ছিল।'

থম্পসনের বিশ্বাস, বিশেষ প্রয়োজনে ওটাকে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। হাইজ্যাকারদের মিশন সফল হতে যাচ্ছে বলে নয়। বরং বিপরীত কারণে। আকাশে যখন একমাত্র ফ্লাইট ৯৩, তখন এই অর্ডার কেন? পল থম্পসন এ প্রসঙ্গে যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ উত্থাপন করেছেন, অত্যন্ত অস্বস্তিকর সেসব। ফ্লাইট ৯৩-কে গুলি করার নির্দেশ দেয়ার কারণ তাঁর মতে যাত্রীরা হাইজ্যাকারদের হাত থেকে প্লেনের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিচ্ছিল। এরপর প্লেনটাকে কোথাও নিরাপদে অবতরণ করানো গেলে জীবিত হাইজ্যাকারদের অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি করা হতো। তাহলে সম্ভবত এটাও প্রমাণ হয়ে যেত যে, আগের তিনটা ফ্লাইট ভূপাতিত করার পিছনে বুশ প্রশাসনের অযোগ্যতা নয়, বিশেষ কোনো দুরভিসন্ধি ছিল। কেননা ফ্লাইট ৯৩-কে ভূপাতিত করার মধ্য দিয়েই প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তারা চাইলে ফ্লাইট ১১ আর ফ্লাইট ১৭৫ কোনোমতেই সফল হতে পারত না সেদিন।

এই ফ্লাইট থেকে পাওয়া তথ্য-প্রমাণ বলে, আগের তিনটার মতো এটার ব্যাপারেও মিলিটারির হাই অফিশিয়ালদের বিশেষ কোনো পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু যাত্রীদের অপ্রত্যাশিত তৎপরতায় তা ফাঁস হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিতে দেরি না করে ফ্লাইট ৯৩-এর এই পরিণতির আয়োজন করা হয়। এই ফ্লাইটটির এমন বিয়োগান্ত পরিণতি হয় সম্ভবত নির্ধারিত সময়ের ৪১ মিনিট দেরিতে যাত্রা করার কারণে। চারটা ফ্লাইটেরই নির্দিষ্ট সময়ে আকাশে ওঠার কথা ছিল এবং শেডিউল অনুযায়ী একই সময়ে যার যার লক্ষ্যে আঘাত হানার কথা ছিল। প্রথম তিনটা ফ্লাইট মোটামুটি কাছাকাছি সময়েই মাটি ছাড়ে সেদিন।

কিন্তু ফ্লাইট ৯৩-এর আকাশে উঠতে ৪১ মিনিট দেরি হয়ে যায়। দেরিতে আকাশে ওঠা এবং হাইজ্যাকাররা যখন সেটার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়, ততক্ষণে প্রথম দুটো ফ্লাইট ডাব্লিউটিসি-র উত্তর ও দক্ষিণ টাওয়ারে বিধ্বস্ত হয়েছে। ফ্লাইট ৯৩-এর যাত্রীরা বিভিন্নজনের কাছে ফোন করে ডাব্লিউটিসি-র ব্যাপারে জানতে পারে এবং বুঝে ফেলে তাদের ফ্লাইটেরও নিশ্চয়ই ওই ধরনের কোনো সুইসাইড মিশন আছে।

BanglaBook.org

প্রথম দুই ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জাররা জানত না তাদের ভাগ্যে কি ঘটতে চলেছে, কিন্তু আকাশে উঠতে দেরি হওয়ায় ফ্লাইট ৯৩-এর প্যাসেঞ্জাররা নিজেদের পরিণতি টের পেয়ে যায়। বুঝে ফেলে, এ অবস্থায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার অর্থ হবে সেধে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া।

কাজেই তারা মরিয়া হয়ে প্লেনের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেয়ার চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগে। যদি প্লেনটা আকাশে উড়তে এত বেশি দেরি না করে ফেলত, তাহলে হয়তো যাত্রীরাও সেরকম কিছু করত না। তাহলে সেটাও সম্ভবত তার লক্ষ্যে আঘাত হানার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতো না। যদি সেটা সফল হতো, তাহলে হয়তো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে যেত পৃথিবীর ইতিহাসে।

ক্যাপিটল বিল্ডিং খালি করার কাজ ৯:৪৮ মিনিটের আগে শুরু হয়নি। একটা অজ্ঞাত পরিচয় এয়ার ক্র্যাফট ওয়াশিংটনের দিকে যাচ্ছে, সে কথা প্রচার হওয়ার ২৩ মিনিট পর, এবং পেন্টাগনে হামলা হওয়ার ১০ মিনিট পর শুরু করা হয় সে কাজ। কি হত যদি ফ্লাইট ৯৩ এত দেরি না করত? থম্পসনের *টাইমলাইন* জানায় পরে জানা গেছে ফ্লাইট ৯৩-এর টার্গেট ছিল খোদ ক্যাপিটল বিল্ডিং। কাজেই যদি সেটা ৪০ মিনিট আগে, সময়মতোই এয়ারপোর্ট ত্যাগ করতে পারত, তাহলে হয়তো বেশিরভাগ সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানের সেদিন শোচনীয় মৃত্যু হতো।

অবশ্য থম্পসনের হাইপোথিসিসে এ সম্ভাবনার কথাও আছে ফ্লাইট ৯৩-এর লক্ষ্য হোয়াইট হাউজই ছিল হয়তো। সমালোচকরা প্রশ্ন তুলেছেন, সেটাই বা কেন সময় থাকতে খালি করা হয়নি? অনেক রিপোর্টে জানা গেছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনি এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর, কন্ডোলিৎসা রাইসকে সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা ৯:০৩ মিনিটের সময় হোয়াইট হাউজের আন্ডারগ্রাউন্ড বাংকারে নিয়ে গিয়েছিল।

যদি কর্তৃপক্ষ ওই সময় জেনেই থাকে চেইনি ও রাইসের বিপদ হতে পারে, তাহলে তাদের মতো অন্য যারা সেখানে ছিল, তাদেরকেও কেন আন্ডারগ্রাউন্ড বাংকারে সরিয়ে নেয়া হয়নি বা নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে বলা হয়নি? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ৯:২৫ মিনিটের সময় ডালেস এয়ারপোর্টের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার যখন জানায় একটা দ্রুতগামী এয়ার ক্র্যাফট হোয়াইট হাউজের দিকে যাচ্ছে, তখনই কেন হোয়াইট হাউজ খালি করে ফেলা হলো না?

এই প্রশ্ন আরও বেশিরকম জোরাল হয়ে ওঠে যখন বুশ প্রশাসনের অফিশিয়াল ব্যাখ্যাতেই দাবি করা হয়, ফ্লাইট ৭৭-এর লক্ষ্য ছিল হোয়াইট হাউজে আঘাত হানা। যদি তাই হতো, তাহলে পেন্টাগনের বদলে হোয়াইট হাউজে কাজে ব্যস্ত বেসামরিক-সামরিক লোকজন মারা যেত।

আরও একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনের মতো হোয়াইট হাউজ আর ক্যাপিটল বিল্ডিঙেও কি সেইদিন কিছু লাশ ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল? অল্পের জন্য মিস হয়ে গেছে?

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

প্রেসিডেন্ট বুশ : কেন এই আচরণ?

৯/১১-এর দিন চারটা প্লেন 'দুর্ঘটনা' ঘটে। দুটো নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর ও দক্ষিণ টাওয়ারে বিধ্বস্ত হয়, একটা পেন্টাগনে বিধ্বস্ত হয়, এবং অন্যটাকে ফিলাডেলফিয়ায় গুলি করে ফেলে দেয়া হয়। সে প্রসঙ্গে বুশ প্রশাসনের দেয়া ব্যাখ্যা-বিবৃতি নিয়েই কেবল প্রশ্ন ওঠেনি, বরং স্বয়ং জর্জ বুশের সেদিনকার আচরণ নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছে। আমি এখন সেসবের মধ্যকার সবচেয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

সেদিন সকালে ফ্লোরিডা রাজ্যের সারাসোটার একটা প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শন করার কথা ছিল প্রেসিডেন্ট বুশের। শেডিউল অনুযায়ী ৯:০০ টা বাজার সামান্য আগেই সেখানে পৌঁছে যান তিনি। ছোটো ছোটো ছেলেরা রিডিং পড়বে, আর তিনি শুনবেন। ৯/১১ সংক্রান্ত প্রশাসনের ব্যাখ্যার অন্তত একটা ভার্শনমতে ওই সময়ই তাঁকে ডাব্লিউটিসি-র উত্তর টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার কথা জানানো হয়েছিল। ততক্ষণে দেশের সবাই জেনে গেছে ফ্লাইট ১১ সহ আরও দুটো প্লেনও হাইজ্যাক হয়ে গেছে। কাজেই সঙ্গত কারণেই ধরে নেয়া যায় যে, প্রেসিডেন্টও অবশ্যই তখন ঘটনা জেনে গেছেন। সমালোচকরা সেরকমই দাবি করেন। অ্যালান উড আর পল থম্পসন এ প্রসঙ্গে যে সমস্যার কথা বলছেন, সেটা হলো

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর টাওয়ারে ফ্লাইট ১১-এর ক্র্যাশ করার খবর মিডিয়ায় প্রথম প্রচার হয় সকাল ৮:৪৮ মিনিটের দিকে। ঘটনা ঘটার দু' মিনিট পরে সিএনএন ওই সময় তার নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে ডাব্লিউটিসি-র ঘটনার লাইভ কাভারেজ শুরু করে... অতএব কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ জেনে যায় সেই ভয়াবহ ঘটনার কথা। অথচ তারপরও প্রেসিডেন্ট বুশ আরও অন্তত দশ মিনিট 'অন্ধকারে' ছিলেন। 'জানতেন না'। সমালোচকদের মতে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

ব্যারি জুইকার এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রেসিডেন্টের সফর সঙ্গীদের মধ্যে সিক্রেট সার্ভিসের যে সমস্ত স্টাফ ছিলেন, বিশ্বের সেরা কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট সজ্জিত ছিল তারা। কাজেই ঘটনা ঘটার এক মিনিটের মধ্যে তাদের তো বটেই, প্রেসিডেন্ট বুশেরও

BanglaBook.org

অবশ্যই জানা হয়ে যায় সে খবর। এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। থম্পসন বলেন, ঘটনা নিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনি মুখ খুলতে গিয়ে ঝোলার বিড়াল বের করে দিয়েছেন। ১৬ সেপ্টেম্বর 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, 'এফএএ-র সাথে সিক্রেট সার্ভিসের একটা বিশেষ যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। তাদের সেই লাইন খোলা ছিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে...' এই পর্যন্ত বলে থেমে যান তিনি বাক্য শেষ না করেই।

অতএব থম্পসন নিশ্চিত, প্রেসিডেন্টের গাড়ি বহরের সাথে যে সমস্ত সিক্রেট সার্ভিস পার্সোনেলরা ছিল, এমনকি প্রেসিডেন্টের নিজের গাড়িতেও যে একজন ছিল, তারা সবাই নির্দিষ্ট স্কুলে পৌঁছানোর আগেই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সন্ত্রাসী হামলার কথা জেনে গিয়েছিল। এ কথা এমনকি সরকারী ব্যাখ্যাতেও উল্লেখ করা হয় যে, হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি আরি ফ্লেইশার গাড়িতে বসেই হামলার খবর প্রথম জানতে পারেন।

থম্পসনের দাবি, 'এমন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর সফর সঙ্গীদের সবাই জেনে যাবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। তবু বুশ এবং আরও অনেকের দাবি, তারা স্কুলে না পৌঁছানো পর্যন্ত এ খবর তাঁকে জানানো হয়নি। কিন্তু থম্পসন তা মানতে নারাজ। তাঁর প্রশ্ন হলো, প্রেসিডেন্ট সবকিছু জেনেশুনেও না জানার ভান করলেন কেন? ওদিকে সমালোচকদের মতে সিক্রেট সার্ভিসের সাথে এফএএ-র সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকে, ডিক চেইনি মুখ ফসকে এমন মন্তব্য করে জবর এক সমস্যা বাধিয়ে ফেলেছেন। সরকারী ব্যাখ্যাকেই অনেকখানি হালকা করে দিয়েছে সেটা।

অন্যদিকে আরেক খবরে বলা হয়েছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর টাওয়ারের একটা প্লেন হামলা চালিয়েছে শুনে প্রেসিডেন্ট বুশ নাকি সেটাকে 'হরিবল অ্যাক্সিডেন্ট' বা বীভৎস দুর্ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন। এ নিয়ে ব্যারি জুইকার প্রশ্ন তোলেন ওই সময় সিক্রেট সার্ভিস পার্সোনেল এবং প্রেসিডেন্ট, সবারই জানা হয়ে গিয়েছিল যে কয়েকটা এয়ারলাইনার হাইজ্যাক হয়েছে। কাজেই ওই পর্যায়ে তিনি কেমন করে নিশ্চিত হলেন ডাব্লিউটিসি-র উত্তর টাওয়ারের ওপর প্লেন বিধ্বস্ত হওয়া একটা অ্যাক্সিডেন্টই ছিল?

বিষয়টা অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। থম্পসন জানতে চেয়েছেন বুশ এবং তাঁর এইডরা কি ভান করছিলেন যে এমন একটা ন্যাশনাল এমার্জেন্সির খবর তাঁদেরকে জানানো হয়নি? যদি তাই হয়, তাহলে কেন? যা হোক, পরের খবরে জানা যায় প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর, কন্ডোলিৎসা রাইস টেলিফোনে জর্জ বুশকে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন। তিনি নাকি এ কথাও বলেন, এ ঘটনার পিছনে ওসামা বিন লাদেনের হাত আছে বলে সিআইএ-র ডিরেক্টর জর্জ টেনেট নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১২ সেপ্টেম্বরের *টাইম* ও ১৭ সেপ্টেম্বরের *ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর*-এর খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে থম্পসন জানিয়েছেন, ১১ তারিখ

BanglaBook.org

সকালে সিনেটর বোরেন-এর সাথে নাস্তা করছিলেন সিআইএ পরিচালক টেনেট। সে সময় সেল ফোনে ডাব্লিউটিসি-র প্রথম টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা হওয়ার খবর জানতে পারেন তিনি। এবং মন্তব্য করেন 'জানেন, এর পিছনে আমি বিন লাদেনের ফ্রিঙ্গারপ্রিন্ট দেখতে পাচ্ছি।'

অথচ প্রেসিডেন্ট ওদিকে স্কুলের প্রিন্সিপালকে খবরটা জানাতে গিয়ে নাকি বলেছিলেন, 'একটা কমার্শিয়াল প্লেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হিট করেছে এবং... তবে আমরা কর্মসূচী মতো কাজ করে যাবো, "রিডিং থিং" চালিয়ে যাবো।'

সমালোচকরা বিষয়টাকে 'অবিশ্বাস্য' বলে মনে করছেন। একদিকে কোনো ধারণা নেই প্লেন হাইজ্যাক হওয়া সম্পর্কে, তার উপর একটা প্লেন ততক্ষণে ইতিহাসের ভয়ঙ্করতম সন্ত্রাসী হামলা সফলভাবে সম্পন্ন করেও ফেলেছে, সেই সময় দেশের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তাঁর সেনাবাহিনী আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে প্রস্তুত কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত না করে তিনি আগের শেডিউল অনুযায়ী 'রিডিং থিং' চালিয়ে যেতে চাইছেন! অ্যালান উড আর পল থম্পসন জর্জ বুশের সেই অদ্ভুত আচরণের সারাংশ বর্ণনা করেছেন এভাবে

আনুমানিক ৮:৪৮ মিনিটের সময়... জ্বলন্ত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ছবি টেলিভিশনে লাইভ প্রচার করা হয় প্রথমবারের মতো... ওই সময় নাগাদ ফেডারাল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FAA), নর্থ আমেরিকান অ্যারোস্পেস ডিফেন্স কমান্ড (NORAD), ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টার (NMCC), পেন্টাগন, হোয়াইট হাউস, সিআইএ (CIA), এফবিআই (FBI) সহ সমস্ত সিক্রেট সার্ভিস এবং কানাডার স্ট্রাটেজিক কমান্ড, সবার জানা হয়ে গেছে যে তিনটা কমার্শিয়াল এয়ারলাইনার হাইজ্যাক করা হয়েছে।

সবার এটাও জানা হয়ে গেছে যে, সেগুলোর একটা গিয়ে ইচ্ছা করে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর টাওয়ারে আঘাত হেনেছে। দ্বিতীয় প্লেনটা কোর্স থেকে সরে গিয়ে ম্যানহাটনের দিকে যাচ্ছে... ৯:০৩ মিনিটে যখন সারা পৃথিবী জেনে গেছে আমেরিকায় অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত্রাসীরা সুপরিকল্পিত হামলা চালিয়ে সফল হয়েছে, তারপরও কেন প্রেসিডেন্ট বুশ একটা স্কুলের সেকেন্ড গ্রেডের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বসে সময় নষ্ট করছিলেন?

বুশের এই আচরণ হতবাক করেছে সমালোচকদের। কারণ তাঁর সিক্রেট সার্ভিস সদস্যদের ততক্ষণে অন্তত এই সন্দেহ জাগা উচিত ছিল যে, প্রেসিডেন্ট নিজেও সম্ভবত সন্ত্রাসী হামলার লক্ষ্যবস্তু হতে পারেন। ওদিকে একই সময়ে নিরাপত্তার খাতিরে ডিক চেইনি আর কন্ডোলিৎসা রাইসকে তাড়াতাড়ি হোয়াইট হাউজের মাটির নিচের বাংকারে নিয়ে যাওয়া হলেও এদিকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের মানুষটির নিরাপত্তার কোনো তোড়জোড় ছিল না কেন?

বুশের বেলায় ঘটল আর কিছু! *গ্লোব অ্যান্ড মেইল* পত্রিকা এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলে, 'ফর সাম রিজন, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টস ডু নট হাসল্ বুশ। হোয়াই ডাজ নট দিস হ্যাপেন টু বুশ অ্যাট দ্য সেম টাইম?' অর্থাৎ, কোনো কারণে সিক্রেট সার্ভিস

BanglaBook.org

এজেন্টরা তাঁকে সেখান থেকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যায়নি। কেন তাঁর বেলায়ও একই মহূর্তে এ কাজটা করা হলো না?

থম্পসন প্রশ্ন তোলেন 'বুশের সেদিনকার শেডিউল আগে থেকেই প্রচার করা হয়েছিল। দেশের সবাই জানত তিনি ওই সময় কোথায় ছিলেন। হাইজ্যাকাররা যদি সেখানেও একটা প্লেন নিয়ে হামলা চালাত, তার সিক্রেট সার্ভিস কি তা ঠেকাতে পারত?' সমালোচকরা বলেন, জর্জ বুশের এই ব্যাখ্যার অতীত আচরণ আরও প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে। জেমস বামফোর্ড নামে এক ইন্টেলিজেন্স এক্সপার্ট লিখেছেন দেশে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, এ খবর শোনার পরও কমান্ডার ইন চিফ বেশ অবিচল ছিলেন। বিস্তারিত শোনার আগ্রহ দেখা যায়নি তাঁর মধ্যে। তিনি এমনকি এটাও জানতে চাননি নতুন কোনো হুমকি আছে কি না, বা নতুন হামলা হলে তার হাত থেকে রক্ষা পেতে কি কি করা জরুরি...

তার বদলে তিনি যে কাজে গিয়েছিলেন, 'আধুনিক পার্ল হারবার দিবসের মাঝ বেলায়' তাতে মন দেন। ফোটো অপারচিউনিটি (photo opportunity) বা ফোটো অপ অনুষ্ঠানও ছিল দিনের এজেন্ডায়। দল বেঁধে ছবি তুলবে সবাই প্রেসিডেন্টের সাথে। তারপর সেকেন্ড গ্রেডের ছাত্ররা বই থেকে 'এ পেট গোট' বা গৃহপালিত ছাগল সম্পর্কে রচনা পড়বে, প্রেসিডেন্ট শুনবেন। তিনি ক্লাসরুমে কয়েক মিনিট কাটানোর পর তাঁর চিফ অব স্টাফ, অ্যান্ড্রু কার্ড এসে কানে কানে কিছু বলেন বুশকে। জানা গেছে, দ্বিতীয় ডাব্লিউটিসি টাওয়ারে হামলার কথা জানিয়েছিলেন কার্ড। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তাতেও বিচলিত হননি। কয়েক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে তিনি শিশুদের আবার পড়া শুরু করতে বলেন।

প্রেসিডেন্টের এই অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বামফোর্ড বলেন 'বুশ যখন বসে বসে সেকেন্ড গ্রেডারদের রিডিং শুনছেন, তখন জ্বলন্ত ডাব্লিউটিসি টাওয়ারে আটকা পড়া মানুষ অসহায়ের মত ছোটাছুটি করেছে... শ্বাসনালীতে ঢুকে পড়া কালো ধোঁয়া আর আগুনের হাত থেকে বাঁচতে পাগলের মতো বিল্ডিং থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে...

জর্জ বুশ তখন রিডিং শুনছেন দি-পেট-গোট। এ-গার্লগোট-এ পেট-গোট। বাট-দ্য-গোট-ডিড-সামথিং-দ্যাট-মেড-দ্য-গার্লস-ড্যাড-ম্যাড।'

কয়েক মিনিট শোনার পর প্রেসিডেন্ট ঠাট্টা করে বলেন, 'ভালো রিডিং পড়তে পারে, সত্যি! এরা নিশ্চয়ই সিক্সথ গ্রেডার্স!'

প্রেসিডেন্টের এই আচরণ ও নিউ ইয়র্কের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে আরও একজন চরম অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। লোরি ভান অকেন তাঁর নাম। প্রেসিডেন্টের সেই রিডিং সেশনের ভিডিও টেপ জোগাড় করে বারবার দেখেছেন তিনি। অবশেষে মন্তব্য করেন 'ওই সময়ে প্রেসিডেন্টের পাশে বসে রিডিং শোনার দৃশ্য থেকে আমি চোখ সরাতে পারিনি। একদিকে আমার স্বামী ডাব্লিউটিসি বিল্ডিঙে আগুনে পুড়ে মরছে, আরেকদিকে তিনি সেকেন্ড গ্রেডারদের ছড়া রিডিং শুনছেন!' ততক্ষণে তিনি সন্ত্রাসী হামলার খবর জেনে গেছেন শুনে মহিলা বলেন 'ওই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট কৌতুক করেন কিভাবে?'

BanglaBook.org

শুধু কৌতুকই করেননি তিনি, অহেতুক সময়ের অপচয়ও করেছেন। তিনি আমেরিকার মতো দেশের কমান্ডার-ইন-চিফ। অথচ তাঁর আচরণে তখন মোটেও মনে হয়নি দেশে একটা গুরুতর পরিস্থিতি চলছে। *ওয়াশিংটন টাইমস*-এর হোয়াইট হাউজ করেসপন্ডেন্ট বিল স্যামনের লেখা *ফাইটিং ব্যাক* বইয়ে লেখা হয় 'বুশ সময় নষ্ট করছিলেন।' স্যামনের বর্ণনা অনুযায়ী রিডিং শেষ হতে বুশ বলেন 'বাহ্! এরা সবাই চমৎকার রিডার। তোমাদের রিডিং স্কিল দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। তোমরা প্র্যাকটিসও করো, তাই না? টিভি দেখার চেয়ে প্র্যাকটিস বেশি করো তো?' (কিছু শিশু হাত তোলে) ওহ্, দারুণ! ভেরি গুড। প্র্যাকটিস করা খুব জরুরি। আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ

তারপরও আলাপ চালিয়ে যান প্রেসিডেন্ট। শিশুদের নিয়মিত স্কুলে আসতে এবং সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পরামর্শ দেন। নিজের শিক্ষা নীতি নিয়ে কথা বলেন। স্যামন বলেন, ওই সময় বুশের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিল দুনিয়ার কোনোকিছুই তিনি পরোয়া করেন না। তখন এক রিপোর্টার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, নিউ ইয়র্কের ঘটনা সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন কি না। বুশ জবাব দেন 'এ নিয়ে পরে কথা বলব।'

এরপর তিনি মেয়ে ক্লাসরুম টিচার ড্যানিয়েলকে নিয়ে ছবি তোলার জন্য পোজ দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। মুখ দিয়ে কথার খই ফুটছে। স্যামনের মতে প্রেসিডেন্ট তখন কমান্ডার-ইন-চিফ ছিলেন না, দ্য ডডলার (dawdler)-ইন-চিফ (কালক্ষেপণকারী) ছিলেন। তবে চরম অবাক করার মতো বিষয় হলো, প্রেসিডেন্টের সেদিনের ব্যাখ্যার অতীত আচরণ নিয়ে সমালোচনার যে ঝড় ওঠে, হোয়াইট হাউজ দীর্ঘ এক বছর পর তা মেরামতের উদ্যোগ নেয়। বুশের চিফ অব স্টাফ, অ্যান্ড্রু কার্ড সেই প্রসঙ্গে বলেন, ৯/১১-এর দিন তিনি প্রেসিডেন্টকে ডাব্লিউটিসি-র দ্বিতীয় টাওয়ারে হামলা হওয়ার খবর দিতেই তিনি স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 'কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে' চলে আসেন।

পরে সেই কথাগুলোই কার্ড একটু ঘুরিয়ে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে আসতে বেশি সময় নেননি।'

সমালোচকদের মতে হোয়াইট হাউজ প্রথমদিকে এত বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, তারা ধরেই নিয়েছিল ৯/১১-এর ব্যাখ্যা মিডিয়া চ্যালেঞ্জ করবে না। তাই *ওয়াশিংটন টাইমস*-এর হোয়াইট হাউজ করেসপন্ডেন্ট, বিল স্যামনের প্রো-বুশ বই *ফাইটিং ব্যাক*-এ লেখা 'বুশ সময় নষ্ট করছিলেন,' এবং প্রেসিডেন্টের সেদিনের কার্যক্রমের ওপর প্রকাশ করা ভিডিও চিত্রে প্রমাণ থাকার পরও সেসব গ্রাহ্যে আনা হয়নি। অ্যালান উড ও পল থম্পসন এ প্রসঙ্গে বলেন, 'তাদের কথায় প্রমাণ হয় কেউ সঠিক কথা বলছে না... 'যদি না বেশি সময়ের অর্থ ৭০০ সেকেন্ডেরও বেশি (১১ মিনিট) হয়ে থাকে!'

আবার আসল ইতিহাসে ফেরা যাক। অবশেষে ৯:১৩ মিনিটে প্রেসিডেন্ট ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর অ্যাডভাইজরদের সাথে কথা বলেন। জাতির উদ্দেশে টেলিভিশন ভাষণে কি বলবেন, তা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর সে ভাষণ ৯:২৯ মিনিটে প্রচার করা হয়। থম্পসন উল্লেখ করেন, প্রেসিডেন্ট বুশের সেদিনকার কর্মসূচী

BanglaBook.org

আগে থেকে প্রচার করা নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট জায়গাতেই শুরু হয়। ফলে তিনিও সন্ত্রাসীদের লক্ষ্যবস্তু হতে পারতেন। কেবল তিনিই নন। উড আর থম্পসন পরে যখন অ্যান্ড্রু কার্ড ও কার্ল রোভকে জিজ্ঞেস করেন, দ্বিতীয় টাওয়ারে হামলার কথা শোনামাত্র কেন স্কুল ত্যাগ করেননি প্রেসিডেন্ট? তখন জবাব দেয়া হয় প্রেসিডেন্ট শিশুদেরকে আপসেট করতে চাননি।

পরে জানতে চাওয়া হয়, প্রেসিডেন্ট কেন শিশুদের এবং উপস্থিত আরও শ' দুয়েক মানুষের নিরাপত্তার কথা ভাবলেন না? তাদের ওপরেও তো সন্ত্রাসীরা হামলা চালাতে পারত। জবাবটা সম্ভবত এরকম হতো, তিনি জানতেন সেখানে কোনো সন্ত্রাসী হামলা হবে না। তাই কি?

যাই হোক, তারপর প্রেসিডেন্ট সহযাত্রীদের নিয়ে শেডিউলড মোটর শোভাযাত্রা নিয়ে শেডিউলড রুট ধরে এয়ারপোর্টে যান। যাওয়ার পথে প্রেসিডেন্ট জানতে পারেন পেন্টাগনেও হামলা হয়েছে এবং তাঁর প্লেন, এয়ার ফোর্স ওয়ানকেও টার্গেট করেছে সন্ত্রাসীরা। তারপরও তাঁর প্লেনকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো মিলিটারি এসকর্টের নির্দেশ দেননি প্রেসিডেন্ট।

'অবাক কাণ্ড!' বলেছেন পল থম্পসন। 'কোনো ফাইটারের প্রটেকশন ছাড়াই জর্জ বুশের প্লেন আকাশে উঠে পড়ে।'

ব্যাপারটা এই কারণে আরও বেশি অবাক করার মতো ছিল যে, ঠিক ওই সময় মোট ৩,০০০ প্লেন ছিল আমেরিকার আকাশে, নিজ নিজ গন্তব্যের পানে চলছে। তখন কারও সঠিক জানা ছিল না সন্ত্রাসীরা মোট কয়টা প্লেন হাইজ্যাক করেছে। এয়ার ফোর্স ওয়ানের দিকে কোনোটা তেড়ে আসছে কি না। উদাহরণ হিসেবে থম্পসনের একটা রিপোর্টের কথা উল্লেখ করা যায়।

এয়ার ফোর্স ওয়ান আকাশে ওঠার এক ঘণ্টা পর এফএএ প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায়, সেই মুহূর্তে ছয়টা প্লেনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। মিসিং ছিল। সেগুলোর কথা চেইনি একবার উল্লেখ করেছিলেন। তারও কিছু পরে সন্দেহ করা হয় মোট এগারোটা প্লেন হাইজ্যাক করা হয়েছে। কার্ল রোভের বক্তব্য অনুযায়ী, পরে সিক্রেট সার্ভিস জানতে পারে 'নির্দিষ্ট হুমকি ছিল এয়ার ফোর্স ওয়ানের উপর।'

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, সেদিনই হামলা হওয়ার একটু পর ডিক চেইনির মুখ থেকে বের হওয়া এক কাহিনী কার্ল রোভ ও আরি ফ্লেশার ছড়িয়ে দেন। সেটা হলো সন্ত্রাসীরা এয়ার ফোর্স ওয়ানের সিক্রেট কোড ব্যবহার করে হোয়াইট হাউজ আর এয়ার ফোর্স ওয়ানকে হুমকি দিয়েছিল। এর অর্থ, হয় হোয়াইট হাউজে সন্ত্রাসীদের গুপ্তচর ছিল, নয়তো তারা হোয়াইট হাউজের কম্পিউটারে হ্যাকিং মিশন চালিয়েছিল। এ কাহিনী ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ *নিউ ইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় ছাপা হয়।

মিডিয়া দ্রুত লুফে নেয় এ খবর। তবে বিভিন্ন মহল থেকে এর সত্যতা নিয়ে সন্দেহও প্রকাশ করা হয়। বলা হয়, বুশ সেদিন দীর্ঘ সময় ওয়াশিংটন থেকে অনুপস্থিত থাকায় যে সমালোচনার সৃষ্টি হয়, তা চাপা দিতেই এমন সব খবরের বীজ বোনা হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর আরি ফ্লেশারকে এ বক্তব্যের ব্যাপারে উপযুক্ত প্রমাণ দেখাতে

BanglaBook.org

বলা হলে তিনি যে জবাব দেন, সোজা বাংলায় তা দাঁড়ায় এরকম 'সে খবর এতক্ষণে হেজেমজে গেছে।'

২৬ সেপ্টেম্বর সিবিএস নিউজ বিষয়টার সমাপ্তি টানে এই বলে যে, আরি ফ্লেশারের বক্তব্যের ভুল অর্থ করা হয়েছে। সূত্রগুলো বলছে, হোয়াইট হাউজের কর্মচারীরা সম্ভবত তাদের সিকিউরিটি ডিটেইলের মন্তব্যের ভুল অর্থ করেছে।

কাজেই প্রশ্ন উঠতেই পারে–সারাসোটার কাছেই দুটো মিলিটারি বেজ ছিল, চব্বিশ ঘণ্টা ফাইটার অ্যালার্ট থাকে সেখানে। তারপরও কেন এয়ার ফোর্স ওয়ানকে এসকর্ট করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেদিন একটা ফাইটার জেটও আকাশে ওঠেনি? সেদিন যারা হতাহত হয়েছেন, তাদের আত্মীয়-স্বজনদেরও নজর এড়ায়নি প্রেসিডেন্টের এইসব ব্যাখ্যার অতীত অদ্ভুত আচরণ। ক্রিস্টেন ব্রিটওয়েইজারের কথা আগেও বলা হয়েছে।

তিনি প্রশ্ন করেন 'যখন পরিষ্কার বোঝা গেল যে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, সিক্রেট সার্ভিস তখন কেন প্রেসিডেন্টকে সেখান থেকে সরিয়ে আনল না? ফ্লোরিডা টিভিতে তাঁকে লাইভ দেখানো হচ্ছিল। সন্ত্রাসীরা যদি ফ্লোরিডায় থাকত... ? আমি জানতে চাই, তারপর আরও ২৫ মিনিট কেন সেই স্কুলে বসে থাকলেন প্রেসিডেন্ট?'

এয়ার ফোর্স ওয়ান সেখান থেকে আকাশে ওঠে ৯:৫৫ মিনিটে। প্রেসিডেন্ট বুশ লম্বা সময়ের জন্য ওয়াশিংটন থেকে অনুপস্থিত ছিলেন। কারও কারও মতে, হয়তো ভয়ে। এ নিয়ে যে সব সাংবাদিক প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করেন, পরে তাদেরকে চাকরি হারাতে হয়। সম্ভবত এই জন্যই হোয়াইট হাউজ নিশ্চিত ছিল যে মিডিয়া তাদের বানানো 'সত্যি কাহিনীর' ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তুলবে না।

সে যাই হোক, সমালোচকরা আরও প্রশ্ন তুলেছেন, সন্ত্রাসী হামলা হওয়ার পরবর্তী এক ঘণ্টার মধ্যে প্রেসিডেন্টের আচরণে কোনোরকম ভয়-ভীতির আভাস পর্যন্ত দেখা গেল না কেন? এ থেকে আরেকটা অস্বস্তিকর প্রশ্নের উদ্ভব হয় প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সিক্রেট সার্ভিস চিফ কি জানতেন তিনি সন্ত্রাসীদের টার্গেটের তালিকায় ছিলেন না?

বুশ প্রশাসন আগে থেকেই ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার কথা জানত, তা পরে স্বয়ং বুশের একটা মন্তব্যে অনেকটাই নিশ্চিত হয়। তিনি বলেন 'আমি ক্লাস রুমের বাইরে বসে ছিলাম ভেতরে যাবো বলে। এই সময় দেখি একটা প্লেন টাওয়ারে আঘাত করল। টিভি খোলা ছিল এবং আমি নিজেও প্লেন চালাতে জানি। সেই ঘটনা দেখে আমি বললাম, "ওই লোক একটা ভয়ঙ্কর পাইলট।"'

এই অফিশিয়াল 'সত্য' ব্যাখ্যার জবাবে বলতে হয়, হামলা হওয়ার অন্তত পনেরো মিনিট পর পর্যন্ত বুশের টিভি দেখার কোনো সুযোগই ছিল না। জর্জ বুশের এই বক্তব্য আরও কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে।

বোস্টন হেরাল্ড বলেছে বিষয়টা ভেবে দেখুন। বুশের মন্তব্যে বোঝা যায়, তিনি ফ্লোরিডায় বসে দেখেছেন প্রথম প্লেন, এএ ফ্লাইট ১১ উত্তর টাওয়ারে আঘাত করেছে। অথচ আমরা সবাই জানি, সিএনএন টিভিতে আমরা প্রথমে উত্তর টাওয়ারে দাউ দাউ আগুন জ্বলতে দেখলেও প্লেনের হিট করার ভিডিও দৃশ্য কিন্তু পরদিন দেখেছি। কারণ সে দৃশ্য ক্যামেরায় 'অ্যাক্সিডেন্টলি' ধারণ করেছিলেন দুই ফরাসি ডকুমেন্টারি নির্মাতা।

BanglaBook.org

জুলস আর গিডিয়ন নডেট। তাঁদের ক্যামেরায় 'অ্যাক্সিডেন্টলি ধরা পড়া সত্যিকারের হামলার ভিডিও ছবি' প্রকাশ হয় ঘটনার ১৩ ঘণ্টা পর। ১২ সেপ্টেম্বর ভোরে বাজারে আসে সেটা।

তাহলে বুশ কি দ্বিতীয় প্লেনের দক্ষিণ টাওয়ারে হিট করার কথা বলতে চেয়েছেন, যেটা প্রায় সারা বিশ্ব লাইভ দেখেছে সিএনএনসহ অন্য সব টিভিতে? না। বুশ নিজেই বলেছেন, ওই সময় তিনি সেই ক্লাসরুমে বসে ছিলেন। অ্যান্ড্রু কার্ড তখন এসে তাঁর কানে কানে দ্বিতীয় প্লেনের হিট করার কথা জানান। বুশ কয়েকবারই এ কাহিনী বয়ান করেছেন বলার পর *বোস্টন হেরাল্ড*-এর সাংবাদিক বিস্ময় প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন করেন তিনি 'তা কেমন করে সম্ভব? প্রথম প্লেনের টাওয়ারে হিট করার দৃশ্য কেমন করে দেখলেন কমান্ডার-ইন-চিফ?'

দারুণ একটা প্রশ্ন। কিন্তু আরও অজস্র সাংবাদিক এমনি আরও অজস্র দারুণ প্রশ্ন তুলেছেন সেদিনের নানান প্রসঙ্গ নিয়ে। কিন্তু এক সময় সেসব প্রশ্ন হারিয়ে গেছে মিডিয়া থেকে। কারণ যে কোনো কারণেই হোক, সেগুলোর জবাব পাওয়ার আশায় তারা উপযুক্ত জায়গায় প্রয়োজনীয় চাপ প্রয়োগ করতে পারেননি।

থিয়েরি মেইসান এ প্রশ্নের একটা সম্ভাব্য জবাব দিতে গিয়ে বলেন 'প্রেসিডেন্ট বুশের ঘোষণা শুনে মনে হয় দ্বিতীয় প্লেন টার্গেটে হিট করার আগে তিনি কোনোভাবে প্রথম হিটের ছবি দেখেছেন।' তবে তাঁর মতে সেটা ফরাসি ডকুমেন্টারি নির্মাতা জুলস ও গিডিয়ন নডেটের 'অ্যাক্সিডেন্টলি তুলে ফেলা সত্যিকারের হামলার ভিডিও ছবি' হতে পারে না। কারণ তাদের তোলা ভিডিও ঘটনার তেরো ঘণ্টা পর বাজারে আসে।

কাজেই ঘটনার দিন, ৯/১১-এর সকালে বুশের প্রথম হিটের লাইভ ছবি দেখার প্রশ্নই অবান্তর।

তবে মেইসান আরেকটা ধারণার কথা বলেছেন। সেটা হলো, বুশের সফর আগে থেকে নির্ধারিত ছিল বলে সেই স্কুলে একটা কমিউনিকেশনস রুম সেট করা হয়েছিল, যা খুবই স্বাভাবিক। তারপর নিউ ইয়র্কে সন্ত্রাসী হামলার সময় ইউএস ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস তা ভিডিও করে এবং সেই ছবি সিক্রেট ইমেজ ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে জর্জ বুশকে সেই কমিউনিকেশনস রুমে দেখানো হয়।

এর আরেক অর্থ হলো, ইউএস ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস যদি তা ভিডিও করেই থাকে, তাহলে সরকার যে ভালো করেই জানত ডাব্লিউটিসি-র টাওয়ারে হামলা হবে, তা পরিষ্কার হয়ে যায়। তাহলে সব মিলিয়ে যা দাঁড়ায় তা এরকম প্রথম প্লেনের প্রথম টাওয়ারে আঘাত করার ঘটনা যখন ঘটে, প্রেসিডেন্ট সম্ভবত তখনই সে দৃশ্য দেখেননি। দেখেছেন ক্লাসরুমে ঢোকার আগে। অবশ্য কেউ কেউ এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না যে, প্রেসিডেনশিয়াল লিমুজিনে বসেই এ দৃশ্যের ট্রান্সমিটেড ইমেজ দেখেছেন বুশ। স্কুলে পৌঁছানোর আগেই।

BanglaBook.org

***

সমালোচকদের মতে ৯/১১-এর দিন প্রেসিডেন্ট বুশের সন্দেহজনক আচরণ এই ধারণাকেই মজবুত করে যে, আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্যায়ের সরকারী ও মিলিটারি অফিশিয়ালদের আগে থেকেই জানা ছিল দেশে কি ঘটতে যাচ্ছে। তারা এই বেদনাদায়ক ষড়যন্ত্রের সাথে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনায় নিহত ২,৮১০ জন এবং চারটা প্লেনের সমস্ত যাত্রী-ক্রুসহ অন্যদের প্রাণহানি ও দেশের প্রচুর সম্পদহানির সাথে জড়িত ছিল।

আমরা অফিশিয়াল দুষ্কর্মের সম্ভাব্য ধারণার যে তালিকা তৈরি করেছি, প্রেসিডেন্টের আচরণ তার প্রথম পাঁচটা সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয়। অর্থাৎ হোয়াইট হাউজ কোনো সন্ত্রাসী হামলা আশা করছিল না। বরং প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তাঁর সিক্রেট সার্ভিস অফিশিয়ালদের আচরণের ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে ষষ্ঠ ধারণা মিলে যায়; অর্থাৎ যেটায় বলা হয়েছে যে, হোয়াইট হাউজ কোনো ধরনের আক্রমণ আশা করছিল।

তার উপর আমরা যদি বুশের 'ক্লাসরুমে ঢোকার আগেই টেলিভিশনে প্রথম হিট দেখেছেন' বক্তব্যকে কেন্দ্র করে মেইসানের মন্তব্য বিচার করি, তাহলে সপ্তম ধারণা মিলে যায়। অর্থাৎ হামলার সঠিক সময় ও টার্গেট সম্পর্কে আগে থেকে হোয়াইট হাউজের জানা ছিল। সপ্তম ধারণা অনুযায়ী এটাও প্রমাণ হয় যে, প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তাঁর সিক্রেট সার্ভিস পার্সোনেলদের মনে হয় জানা ছিল যে, হামলা হলেও তাঁদের উপর হবে না।

অফিশিয়াল ব্যাখ্যার সমালোচকদের মতে, এই উপসংহার থেকে অনুমান করা যায়, ৯/১১-এর ঘটনার সাথে অফিশিয়াল দুষ্কর্মের কোনো না কোনো যোগসূত্র নিশ্চয়ই ছিল। আশা করছি পরের অধ্যায়গুলোতে পাঠকদের কাছে বিষয়টা আরও জোরালো এবং স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্বিতীয় খণ্ড

৯/১১-এর বৃহত্তর প্রসঙ্গ

বুশ প্রশাসন জানত?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

প্রশাসন সব জানত?

সমালোচকরা বুশ প্রশাসনের ব্যাখ্যার বিপরীতে আরও চার ধরনের প্রমাণ হাজির করেছেন। এই অধ্যায়ে আমি তার প্রথমটা নিয়ে আলোচনা করব। সেটা হলো হামলা হওয়ার আগে থেকেই আমেরিকান অফিশিয়ালরা বিষয়টা জানত। অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যদিও অনেকবার দাবি করেছেন এই হামলা তাদের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, প্রেসিডেন্ট বুশের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর কন্ডোলিৎসা রাইস ২০০২ সালের মে মাসে বলেছেন 'আমার মনে হয় কেউই বুঝে উঠতে পারেনি এই লোকগুলো একটা যাত্রীবাহী প্লেন নিয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উপর গিয়ে পড়তে পারে। তারপর আরেকটা প্লেন নিয়ে পেন্টাগনের উপর ঝাঁপ দেবে। কেউ বুঝতে পারেনি... যাত্রীবাহী প্লেন হাইজ্যাক করে মিসাইলের মতো ব্যবহার করা হবে।' পরের মাসে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, 'এগারোই সেপ্টেম্বরের বিভীষিকা কেউ প্রতিহত করতে পারত, আমার তা বিশ্বাস হয় না।'

৯/১১-এর ব্যাপারে ইউএস সিনেটের বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স কমিটি ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর যৌথ তদন্তের ফাইন্যাল রিপোর্টের সারাংশেও এই দাবিকে সমর্থন জানানো হয়। বলা হয় ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির সাধারণ ধারণা ছিল ২০০১-এর বসন্তে আর গ্রীষ্মে বিন লাদেনের হুমকি অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে আমেরিকান স্বার্থের উপর আক্রমণ চালানো হবে।

এই সাধারণ দাবিগুলোকে আরও দু' ভাগে ভাগ করা যায় এবং দুটোই অফিশিয়াল ব্যাখ্যার সমালোচনাকারীদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল।

BanglaBook.org

হামলার শঙ্কা ছিল না?

দাবিগুলোর একটা হচ্ছে কেউ প্লেনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে, এমনটা কল্পনা করা হয়নি। এ দাবির পক্ষে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, এক ডিফেন্স

অফিশিয়াল বলেছিলেন আমরা কেউই ভাবিনি ওরকম অতিকায় যাত্রীবাহী প্লেন দেশের অভ্যন্তরীণ হুমকির কারণ হয়ে উঠতে পারে। আমি এরকম একজনকেও দেখি না যিনি এমন আশঙ্কা করেছিলেন। এর এক বছর পর হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি আরি ফ্লেশার বলেন, 'হামলা হওয়ার আগে পর্যন্ত আমার মনে হয় না এরকম কিছু সম্ভব বলে কেউ চিন্তা করেছে।'

কিন্তু সমালোচকরা বলছেন, বরং এর উল্টোটারই অনেক প্রমাণ আছে। যেমন, ১৯৯৩ সালে পেন্টাগনের নিয়োগ দেয়া একদল বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত নিরাপত্তা প্যানেল সতর্ক করে দিয়েছিল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের উপর প্লেনকে মিসাইল বানিয়ে হামলা করা হতে পারে। এ অভিমত সেই প্যানেলের রিপোর্ট *টেরর ২০০০*-এ ছাপা হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। কারণ হিসেবে সেটার লেখকদের একজন বলেন 'ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স আমাদেরকে কথাটা লিখতে নিষেধ করে দিয়েছিল।'

কিন্তু ১৯৯৪ সালে তাদের একজন *ফিউচারিস্ট* ম্যাগাজিনে লেখেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মতো লক্ষ্যবস্তুগুলো কেবল প্রয়োজনীয় লাশের চাহিদাই পূরণ করবে না, নিজেদের প্রতীকী পরিচয়ের কারণে অনেক বেশি মর্যাদাহানীও করবে। নিজেদের সাফল্য নিশ্চিত করতে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো একযোগে একাধিক হামলাও চালাতে পারে। সেই বছরই তিনটা প্লেন হাইজ্যাক করা হয়, যার একটা নিয়ে আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত একটি দল অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিল।

১৯৯৫ সালে সিনেটর স্যাম নানকে নিয়ে টাইম ম্যাগাজিন একটা কাভার স্টোরি করে। তাতে ইউএস ক্যাপিটল বিল্ডিঙের উপর একটা রেডিও নিয়ন্ত্রিত প্লেনের বিধ্বস্ত হওয়ার কাল্পনিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়। একই বছর গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ফাঁস হয়ে যায়, যা নিয়ে পরে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। বিষয়টা ছিল ফিলিপিন পুলিশ একটা আল-কায়েদা কম্পিউটার উদ্ধার করে, তাতে প্রোজেক্ট বোয়িনকা (Project Bojinka) নামে একটা উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার কথা পাওয়া যায়। তাতে হাইজ্যাক করা প্লেন নিয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, হোয়াইট হাউজ, সিআইএ হেড অফিস ও পেন্টাগন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে হামলা চালানোর প্ল্যানের উল্লেখ ছিল।

পরে জানা যায়, এসব প্ল্যান বেরিয়েছে খালিদ শেখ মোহাম্মদের মাথা থেকে এবং সে-ই ৯/১১-এর নাটের গুরু। তার আত্মীয় রামসি ইউসুফ ছিল ১৯৯৩ সালে প্রথমবার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে যে হামলা হয়, তার পরিকল্পনাকারী। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সেই হামলার জন্য রামসি ইউসুফ অভিযুক্ত হননি। এখন এটা প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে যে, এক এফবিআই এজেন্ট (ডাবল এজেন্ট?) সেই ঘটনা ঘটাতে উৎসাহ জুগিয়েছিল। অন্যদিকে সেই হামলার পর এক ফিলিপিনো গোয়েন্দা বলেছিলেন 'কাজটা বোয়িনকার... আমরা বোয়িনকার ব্যাপারে আমেরিকাকে সব জানিয়েছি। তারপরও ওরা কেন পাত্তা দেয়নি?'

১৯৯৯ সালে প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিকে সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে সতর্ক করে ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স কাউন্সিল। সন্ত্রাসবাদের উপর

BanglaBook.org

তাদের এক স্পেশাল রিপোর্টে বলা হয় ১৯৯৮ সালে আমেরিকার চালানো ক্রুজ মিসাইল হামলার প্রতিশোধ নিতে পারে আল-কায়েদা। ক্যাপিটল বিল্ডিঙে বিভিন্ন কায়দায় সন্ত্রাসী হামলা চালাতে পারে। আল-কায়েদার মার্টারডম ব্যাটালিয়ন ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক বোঝাই প্লেন নিয়ে ইচ্ছেমত যে কোনো জায়গায় ক্র্যাশ-ল্যান্ড করতে পারে... পেন্টাগনে, সিআইএ-র হেড অফিসে বা হোয়াইট হাউজে।

২০০০ সালের অক্টোবরে হাইজ্যাক করা প্লেন অফিসের উপর ক্র্যাশ-ল্যান্ড করতে পারে, এই সম্ভাবনার কারণে পেন্টাগনের অফিশিয়ালরা এমার্জেন্সি ড্রিলে অংশ নিয়েছিলেন। অতএব এ ধরনের হামলার কথা কেউ চিন্তা করেনি বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তা একেবারেই সত্য নয়

নির্দিষ্ট সতর্কবাণী ছিল না?

দাবি করা হয়েছে, এই ধরনের হামলা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও ৯/১১-এর ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো সতর্কবাণী ছিল না। নমুনা হিসেবে বলা যায়, এর তিনদিন পর এফবিআই ডিরেক্টর রবার্ট মুলার (ছয়দিন আগে দায়িত্ব পাওয়া) বলেন 'আমার জানামতে এমন কোনো সতর্ক সংকেত ছিল না যাতে বোঝা যায় দেশে এই ধরনের একটা অপারেশন পরিচালিত হতে পারে।' এক বছর পরও তিনি একই দাবি করেন 'আজ পর্যন্ত সারা আমেরিকায় আমি এমন একজনকেও খুঁজে পেলাম না যে হাইজ্যাকারদের প্ল্যান সম্পর্কে আগে থেকে জানত।'

হাউজ অব সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটিসমূহের সম্মিলিত তদন্তের ফাইন্যাল রিপোর্টের সারাংশেও একই দাবি করা হয়। সে রিপোর্টের প্রথম 'ফাইন্ডিং' সংক্ষেপে এরকম ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি ওসামা বিন লাদেন ও তার সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে জানতে অনেক চেষ্টা করলেও তাদের ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। যৌথ তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্টে আগেই যেমন বলা হয়েছিল 'বহির্বিশ্বে আমেরিকান স্বার্থের উপর হামলা চালানো হবে,' সেটাকেই 'সত্যি ধরে নিয়েছিল' দেশের ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি।

কিন্তু সমালোচকরা বলেন অন্য কথা। তাদের মতে, ৯/১১ এর আগে পর্যন্ত কয়েক মাসে আক্রমণের অনেকগুলো সুনির্দিষ্ট হুমকি ছিল। ২০০১ সালের মে মাসে আমেরিকার উপর হামলার যে সমস্ত সতর্কবাণী ছিল, তা ছিল আগের যে কোনো সময়ের চাইতে অনেক জোরালো। দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ জন্য বিশেষ সতর্ক অবস্থায় ছিল। এই সতর্কতার মাত্রা আরও বাড়ার কথা ছিল।

কারণ সিআইএ ডিরেক্টর জর্জ টেনেট জুন মাসের ২৮ তারিখ প্রেসিডেন্ট বুশের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর কন্ডোলিৎসা রাইসের অফিসে একটা ইন্টেলিজেন্স সামারি দাখিল করেন। সেটায় বলা হয় আমেরিকায় আল-কায়েদার বড় ধরনের একটা হামলা হওয়ার প্রবল আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেটা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ঘটতে পারে। এরপর আসে নতুন এবং সুনির্দিষ্ট সতর্কবাণী। জুলাই মাসের শেষদিকে

BanglaBook.org

আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমেরিকান অফিশিয়ালদের জানান, ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার ভিতরে 'হিউজ অ্যাটাক' চালানোর পরিকল্পনা করছে। তাতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

সেই বার্তায় স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, সেই হামলায় কমার্শিয়াল এয়ারলাইনার ব্যবহার করা হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ জুলাই সিবিএস নিউজ রিপোর্ট করে, অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাশক্রফট হুমকির কারণে প্লেনে সফর করা বাদ দিয়েছেন। যদিও এফবিআই বা জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট হুমকিটা কি, তা নির্দিষ্ট করে বলতে ব্যর্থ হয়। সেটার কথা কখন জানা গেছে, কে হুমকি দিয়েছে, তা-ও জানা যায়নি।

সান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকল অভিযোগ করে 'এফবিআই অবশ্যই জানত বাতাসে কিছু একটা গুঞ্জন আছে... কারণ তারাই অ্যাশক্রফটকে কমার্শিয়াল এয়ার ক্র্যাফট থেকে দূরে সরে থাকতে বলেছিল।' সিবিএস-এর ডান র‍্যাদার এই সতর্কবাণী প্রশ্নে বলেন 'এ কথা কেন সাধারণ মানুষকে জানানো হয়নি?'

আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে আরও বেশি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়। আল-কায়েদা সংগঠনের মধ্যে পেনিট্রেট করে গোপন তথ্য জেনে এসেছে, এমন এক মরোক্কান এজেন্টকে আমেরিকায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তার কাছে জানা যায়, ১৯৯৩ সালের বোমা হামলায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস না হওয়ায় ভীষণ হতাশ ওসামা বিন লাদেন ২০০১ সালের গ্রীষ্মে বা বসন্তে আমেরিকায় আরেকটা বড় ধরনের অপারেশন চালাতে যাচ্ছে। আরেক খবরে জানা যায়, সাবেক সিআইএ এজেন্ট রবার্ট বায়ের সংস্থার কাউন্টার টেররিজম সেন্টারকে জানিয়েছেন, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের এক প্রিন্সের মিলিটারি অ্যাসোসিয়েটের মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছেন যে, আমেরিকায় একটা 'স্পেকটাকিউলার' বা দর্শনীয় সন্ত্রাসী অভিযান সংঘটিত হতে যাচ্ছে।

এছাড়াও কিছু কিছু সতর্কবাণী কয়েকটা বিদেশী ইন্টেলিজেন্স সংস্থার তরফ থেকেও আসে। যেমন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আগস্ট মাসে বলেন, 'আমি আমার ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলোকে বলে দিয়েছি প্রেসিডেন্ট বুশকে সতর্ক করে দিতে যে ২৫ জন সন্ত্রাসী আমেরিকায় হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা পেন্টাগনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারী স্থাপনায় হামলা চালাবে।'

রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স প্রধান বলেছেন 'আমরা বিভিন্ন উপলক্ষে বারবার স্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে সতর্ক করেছি, কিন্তু তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়নি।'

এছাড়া জর্ডান, মিশর ও ইসরায়েল থেকেও সতর্ক করা হয়। ৯/১১-এর কয়েকদিন আগে আসা শেষের সতর্কবাণীগুলোয় বলা হয়, ওসামা বিন লাদেনের সংগঠনের সাথে জড়িত সম্ভবত ২০০ সন্ত্রাসী আমেরিকায় বিরাট অপারেশন চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে সময় একটা অফিশিয়াল ওয়ার্নিঙের কথাও ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়ে যায়। সেটা এসেছিল ব্রিটেন থেকে।

৬ আগস্টের ইন্টেলিজেন্স ব্রিফিঙের সময় প্রেসিডেন্ট বুশকে পড়ে শোনানো হবে বলে এফবিআই সেটাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল আল-কায়েদা হাইজ্যাক করা প্লেনের সাহায্যে আমেরিকায় বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলা চালানোর

BanglaBook.org

পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু পরে সেই অফিশিয়াল ওয়ার্নিঙের পরিণতি কি হয়েছিল, তা অজ্ঞাতই থেকে যায়।

তার উপর হোয়াইট হাউজ এসব সতর্কবাণীর কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখে এবং ৯/১১-এর পর প্রেসিডেন্ট বুশ বারবার দাবি করতে থাকেন, তিনি কোনো সতর্কবাণী পাননি। কিন্তু ২০০২ সালের ১৫ মে সিবিএস ইভনিং নিউজ ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স সূত্রে পাওয়া সেই ব্রিটিশ মেমোর অস্তিত্বের কথা ফাঁস করে দেয়। কিন্তু অনমনীয় কন্ডোলিৎসা রাইস সেগুলোকে মাত্র দেড় পৃষ্ঠার 'গুরুত্বহীন, ঘোলাটে আর ঠুনকো' বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি আরি ফ্লেশার বলেন 'প্লেনকে মিসাইলের মত ব্যবহার করে হামলা চালানো হবে, এমন কোনো বার্তা প্রেসিডেন্ট কখনোই পাননি।'

কয়েকদিন পর *গার্ডিয়ান* পত্রিকা রিপোর্ট করে '৬ আগস্টের মেমোতে সতর্ক করা হয়েছিল হাইজ্যাক করা এয়ারলাইনারকে মিসাইলের মত ব্যবহার করে লক্ষ্যে আঘাত হানার আয়োজন চলছে। সেটাকে গুরুত্ব দেয়া হলে এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হলে এত মৃত্যু, সম্পদহানি ঠেকানো যেত। তাই আমেরিকান প্রশাসনের সত্যবাদীতা আর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। তারা ব্রিটিশ সরকারের পাঠানো সেই মেমো একদিকে প্রচার করতে অস্বীকার করেছে। অন্যদিকে দাবি করেছে সেটায় নির্দিষ্ট কোনো সতর্কবাণী নেই।' এ নিয়ে মাইকেল মুর প্রশ্ন করেন 'নির্দিষ্ট কিছু না থাকলে প্রচার করতে বাধা কোথায় ছিল?'

সে যাই হোক, এতকিছুর পরও যদি কেউ মনে করে এসব 'গুরুত্বহীন' তথ্যের সাহায্যে ৯/১১ প্রতিহত করা সম্ভব হতো না, তাহলে নিউ ইয়র্ক স্টক মার্কেট থেকে আরও 'সুনির্দিষ্ট' তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারত। ওই সময় আসন্ন বিপর্যয়ের সূত্রের খোঁজে স্টক মার্কেটের উপর কড়া নজর ছিল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর। সমালোচকরা বলছেন, ১১ সেপ্টেম্বরের কয়েকদিন আগে থেকে মার্কেটের কিছু নির্দিষ্ট কোম্পানির শেয়ারের দর অস্বাভাবিক হারে চড়তে থাকে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ২২ তলার ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠান মর্গ্যান স্ট্যানলি ডিন উইট্টার এবং যে দুই কোম্পানির বোয়িং হামলায় ব্যবহার করা হয়; সেই আমেরিকান এয়ারলাইনস (AA) ও ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের (UA) 'পুট অপশনস' অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় সে সময়। বিশেষ করে পরের দুই এয়ারলাইনসের শেয়ারের ভলিউম ৯/১১-এর আগের তিনদিনের মধ্যে ১২০০ পার সেন্ট বেড়ে গিয়েছিল। 'পুট অপশন' কেনার অর্থ হলো 'বেট' ধরা যে শেয়ারের দাম পড়ে যাবে। এবং এসব ক্ষেত্রে বাজি হয় অত্যন্ত লাভজনক।

সান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকল-এর ব্যাখ্যা যখন স্টকের দাম পড়ে যায়... সন্ত্রাসী হামলার কারণে, তখন অপশনের দাম শতগুণ বেড়ে যায়। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার লাভের ঘরে জমা হয়। 'যদি কোনো একটা ফটকাবাজ গ্রুপ এই তিন স্টকের বেশিরভাগ পুট অপশনস একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিনে থাকে, তাহলে ওই ধাক্কায় তারা কম করেও ১০ মিলিয়ন ডলার মুনাফা করেছে।' এই ধরনের অস্বাভাবিক শেয়ার কেনা সন্দেহের সৃষ্টি করে যে লগ্নিকারীরা ৯/১১-এর হামলা সম্পর্কে আগে থেকে

BanglaBook.org

জানত।

কাজেই যদি কোনো ইন্টেলিজেন্স অফিশিয়াল নিউ ইয়র্ক স্টক মার্কেটের হালচালের উপর ওই সময় নজর রাখত, বিশেষ করে চারদিকে থেকে এত সতর্কবাণী আসার প্রেক্ষিতে, তাহলে খুব সহজেই বুঝে ফেলতে পারত এসবের পিছনে এমন কেউ আছে যার বা যাদের নিশ্চিতভাবে জানা ছিল যে নিকট ভবিষ্যতে আমেরিকান এয়ারলাইনস ও ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের প্যাসেঞ্জার প্লেন হামলার কাজে ব্যবহার হতে যাচ্ছে; সম্ভবত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উপরেই।

ব্রিটিশ গবেষক নাফিজ আহমেদের দাবি, 'কোনো সন্দেহ নেই ইউএস ইন্টেলিজেন্স অফিশিয়ালরা শেয়ার মার্কেটের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি অবশ্যই মনিটর করেছেন। অনুসন্ধানী সাংবাদিক; লস অ্যাঞ্জেলিস পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাবেক গোয়েন্দা, মাইকেল রুপার্টের এক রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে নাফিজ আহমেদ বলেছেন সিআইএ যে দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের অস্বাভাবিক ট্রেডের উপর নজর রেখে আসছে, তার লিখিত প্রমাণ আছে। এসব কর্মকাণ্ডকে দেশের স্বার্থবিরোধী ও সন্ত্রাসী হামলার সম্ভাব্য সতর্কবাণী হিসেবে দেখে আসছে আমেরিকা।' এছাড়া নাফিজ আরও বলেন আমেরিকার খরচে পরিচালিত ECHELON ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কও স্টক ট্রেডিঙের উপর সতর্ক নজর রাখে।

এ কাহিনীর একটা মজার পাদটীকা এরকম প্রেসিডেন্ট বুশ ২০০১ সালের মার্চ মাসে এ. বি. 'বাজি' ক্রনগার্ডকে প্রমোশন দিয়ে সিআইএ-র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পদে বসান। এই লোক ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ডয়েশ ব্যাংক (Deutsche Bank)-এর ম্যানেজার ছিলেন। সেই ব্যাংকের মাধ্যমেই ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের 'পুট অপশসন' বিক্রি হয়েছিল। এসবের নিহিত অর্থ হচ্ছে, এর মধ্যে হয়তো কোনো 'ইনসাইডার ট্রেডিং'-এর ব্যাপার ছিল।

সমালোচকরা বলেন, কর্তৃপক্ষ আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারসেপশনের মাধ্যমে। রিপোর্টে জানা যায়, ৯/১১-এর ক'দিন আগে এফবিআই কিছু মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করে; যেমন—'দেয়ার ইজ এ বিগ থিং কামিং (বড় কিছু একটা আসছে)' এবং 'দে আর গোয়িং টু পে দ্য প্রাইস' (ওদেরকে এখন মূল্য পরিশোধ করতে হবে)।'

রিপোর্টে জানা যায়, ৯ সেপ্টেম্বর মায়ের কাছে পাঠানো বিন লাদেনের এক বার্তা একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টারসেপ্ট করে ইউএস ইন্টেলিজেন্সের হাতে তুলে দেয়। তাতে বিন লাদেন তাঁর মাকে লিখেছেন বলে জানা যায় আর দু'দিনের মধ্যে অনেক বড় একটা সুখবর শুনতে পাবে তুমি। তারপর কিছুদিনের জন্য আমার খবর পাবে না। তার পরদিন, ১০ সেপ্টেম্বর ইউএস ইন্টেলিজেন্স ইলেক্ট্রনিক ইন্টারসেপশনের মাধ্যমে আল-কায়েদার সদস্যদের আলোচনা শুনতে পায় তাতে একজন নাকি বলেছে 'আগামীকাল আমাদের জন্য স্মরণীয় একটা দিন হবে।'

BanglaBook.org

এরকম একটা কল ইন্টারসেপ্ট করে এনএসএ বা ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি। সেটা ওই বছরের গ্রীষ্মকালের কথা এবং খবর অনুযায়ী কথা হচ্ছিল খালিদ শেখ

মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ আতার মধ্যে। ধারণা করা হয়, প্রজেক্ট বোয়িনকার অন্যতম স্থপতি এই খালিদ শেখ মোহাম্মদ। ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং *ইউএসএস কোল*-এ বোমা হামলার জন্য খালিদ শেখ মোহাম্মদকে দায়ি বলে মনে করা হয়। জানা গেছে, ১০ সেপ্টেম্বরের এক ইলেক্ট্রনিক ইন্টারসেপশনে জানা গেছে খালিদ শেখ পরদিন, অর্থাৎ ৯/১১-এর হামলার ব্যাপারে মোহাম্মদ আতাকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়।

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০২ সালের *ইন্ডিপেন্ডেন্ট* পত্রিকায় এই ইন্টারসেপশন নিয়ে একটা রিপোর্ট ছাপা হয়। সেই ইন্টারসেপশনের অনুবাদ কখন করা হয়, তা অবশ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে উল্লেখ করা হয়, ২০০১ সালের জুন মাসেই আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স জানতে পারে খালিদ শেখ মোহাম্মদ 'আমেরিকায় সন্ত্রাসী পাঠাতে আগ্রহী।' এরকম ক্ষেত্রে সবাই ধরে নেবে যে, খালিদ শেখ মোহাম্মদের এরকম একটা মেসেজ ইন্টারসেপ্ট ও অনুবাদ করার পর কর্তৃপক্ষ সেটাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে।

কিন্তু আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স জানায়, তারা এই মেসেজ উদ্ধার করে ৯/১১-এর দু'দিন আগে এবং অনুবাদ করে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর। কর্তৃপক্ষের এই দাবির বিপরীতে থম্পসন যে তথ্য প্রকাশ করেন, তা-ও যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। তিনি বলেন, ৯/১১-এর পরদিন এক নিউজ ব্রিফিং-এ সিনেটর ওরিন হ্যাচ উল্লেখ করেন, ইউএস ইন্টেলিজেন্স ইন্টারসেপশনের মাধ্যমে হামলা সফল হওয়ার আনন্দে বিন লাদেনের দুই এইডকে উল্লাস করতে শুনেছে। ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফেল্ড নাকি সিনেটরের এই 'ব্রিচ' বা শৃঙ্খলাহানিকর মন্তব্যে বিরক্ত হয়েছিলেন।

কারণ আল-কায়েদার ইলেক্ট্রনিক কমিউনিকেশনসের উপর আগাগোড়াই যে সরকারের কড়া নজর ছিল, হ্যাচের মন্তব্যে সেই থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। ওদিকে একই প্রসঙ্গে *নিউজউইক*-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, এই বিশেষ তথ্যটি কর্তৃপক্ষ যে ১০ সেপ্টেম্বরই কেবল জেনেছে বা অনুবাদ করেছে তা-ই নয়, পরদিন সকালে পেন্টাগনের কিছু টপ অফিশিয়াল হঠাৎ করে তাদের এক সফর প্ল্যান বাতিলও করেছিল নিরাপত্তার কারণে।

কাজেই আমাদের সামনে থাকা এইসব তথ্য-প্রমাণ থেকে আমরাই যৌথ তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্টের উপযুক্ত মূল্যায়ন করতে পারি। তার সামারিতে যেমন হামলার ব্যাপারে তাদের ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির কোনো তথ্যই জানা ছিল না বলে দাবি করা হয়েছে, বাস্তবে ঘটেছে তার বিপরীত।

'ঘটনার দিন-সময়, হামলার লক্ষ্য এবং কি ধরনের হামলা চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল,' সবই ইউএস ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির জানা ছিল। কাজেই এটা স্পষ্ট যে যৌথ তদন্ত কমিটি সবকিছু জানা সত্ত্বেও না জানার ভান করেছে। দাবি করেছে '২০০১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এনএসএ যে সমস্ত কল ইন্টারসেপ্ট করেছে, ১১ সেপ্টেম্বরের আগে সেগুলোর অনুবাদ ইত্যাদি করা সম্ভব হয়নি—কিছু কিছু বার্তায় আসন্ন সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কার কথা থাকার পরও।'

যৌথ তদন্তের এমন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' জাতীয় উপসংহার এনএসএ-র সদস্যদের 'বক্তব্য' ছাড়া আর কোনো তথ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করে রচনা করা

BanglaBook.org

হয়েছিল কিনা জানতে পারলে মন্দ হতো না। এটাও জানা গেলে ভালো হতো, যৌথ তদন্ত কমিটি উপসংহারে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছে কি না যে, ১০ সেপ্টেম্বর একদল টপ পেন্টাগন অফিশিয়াল তাদের পরদিনের নির্ধারিত সফর হঠাৎ কেন বাতিল করেছিলেন। এবং তারা জানতে চেয়েছেন কি না যে, ৮ সেপ্টেম্বরের আগে একাধিক সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট ইন্টারসেপ্ট করার পরও এনএসএ কেন সেগুলো অনুবাদ করেনি বা জায়গামতো সতর্ক বার্তা পৌঁছে দেয়নি।

যা হোক, কন্ডোলিৎসা রাইসের 'ইউএস অফিশিয়ালদের কাছে হামলা সম্পর্কে অগ্রীম কোনো তথ্য ছিল না,' নাফিজ আহমেদ এ দাবিকে 'ডাহা মিথ্যা' বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে বুশ প্রশাসন আগে থেকে হামলার খবর জানত কি না, এ প্রশ্নের জবাবে মাইকেল চসুদোভস্কি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন 'অবশ্যই তারা জানত! আমেরিকান জনগণের সাথে জেনেশুনে প্রতারণা করা হয়েছে।'

সমালোচকরা যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ হাজির করেছেন বুশ প্রশাসনের ব্যাখ্যার বিপরীতে, তাতে এর মধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে তাদের দাবিই সঠিক। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে বুশ প্রশাসনের অফিশিয়াল দুষ্কর্মের প্রথম দুই সম্ভাব্য ধারণার পক্ষে উপস্থাপন করা প্রমাণ। যেগুলোয় কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিল তারা ৯/১১-এর হামলা সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই জানত না।

কিছু কিছু প্রমাণ অফিশিয়াল দুষ্কর্মের প্রথম ছয় ধারণাকে বাতিল করে দেয়। প্রমাণ হয়, হোয়াইট হাউজ ৯/১১-এর হামলার ব্যাপারে আগে থেকে কিছু জানত না। অফিশিয়াল বক্তব্যের সমালোচকদের বিশ্বাস, এই অধ্যায়ে অফিশিয়াল দুষ্কর্মের যে সমস্ত প্রমাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বোঝা যায় অফিশিয়ালরা দেশবাসীর কাছে তথ্য কেবল গোপনই করেনি, বরং ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের সুবিধার জন্য সক্রিয়ভাবে যৌথ তদন্ত কমিটির কাজে বাধাও দিয়েছে যাতে হামলাকারীদের পরিকল্পনা ফাঁস হতে না পারে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

৯/১১-এর আগে তদন্তে বাধা দেয়া হয়েছে?

ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির রিসিভ করা আল-কায়েদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বার্তার কথা ফাঁস হয়ে গেছে, অফিশিয়ালরা এমন দাবি নাকচ করে পাল্টা দাবি করেন, সব সময় এত বেশি গোয়েন্দা তথ্য আসতে থাকে যে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু থাকে কি না বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। তার বেশিরভাগই শেষ পর্যন্ত মিথ্যে আর গুরুত্বহীন প্রমাণ হয়।

৯/১১-এর ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হামলার মতো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তারা বলছেন, তথ্যের ছিটেফোঁটা কণা উদ্ধার করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। আরও কিছু তথ্য পাওয়া গেলে কাজে লাগানো যেত।

কিন্তু সমালোচকরা বলছেন অন্য কথা। বলছেন, সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি, বিশেষ করে এফবিআই বিশেষ উদ্দেশ্যে আল-কায়েদা সম্পর্কিত তদন্তে সব সময় বাধা দিয়ে এসেছে এবং অনেক নামী ব্যক্তিত্ব সংগঠনটির সাথে জড়িত আছে। তাঁরা দাবি করেন, এর প্রমাণও আছে তাঁদের কাছে।

লাদেনকে শিকার 'না করার' অভিযান

বুশ প্রশাসন ৯/১১-এর হামলা প্রতিহত করতে না পারার পিছনের যে তত্ত্ব প্রচার করে আসছে, তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করার বড় কারণ হচ্ছে ওসামা বিন লাদেনকে আটক করা বা হত্যা করার অনেক সুযোগ পেয়েও তারা সেসব কাজে লাগায়নি। নাফিজ আহমেদ ও পল থম্পসনের উদ্ধার করা এরকম কিছু ইতিহাস এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

ডিসেম্বর, ১৯৯৮। সিআইএ-র পরিচালক জর্জ টেনেট দেশের সবগুলো ইন্টেলিজেন্ট এজেন্সির মধ্যে এক মেমোরেন্ডাম প্রচার করেন, যার বক্তব্য ছিল 'উই আর অ্যাট ওয়ার' বা আমরা যুদ্ধ জড়িয়ে পড়েছি। 'আমি চাই সিআইএসহ দেশের বৃহত্তর ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির ভিতরে বা বাইরে কর্মরত প্রত্যেকে এ যুদ্ধে আমাকে

BanglaBook.org

সাধ্যমতো সহায়তা দিয়ে যাবে।'

কিন্তু পরে কংগ্রেসনাল জয়েন্ট ইনকোয়্যারি কমিটি বিষয়টা তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পারে ডিরেক্টরের এই ঘোষণার পরও কমিউনিটির নীতিতে কোনো অদল-বদল, বাজেটের অঙ্ক বৃদ্ধি বা লোকবল বাড়ানোর মতো কিছুই ঘটেনি। সবচেয়ে মজার কথা, এফবিআইয়ের অনেক এজেন্ট টেনেটের সেই মেমোরেন্ডাম চোখে দেখা তো দূরের কথা, ওটার কথা কানেও শোনেনি।

রিচার্ড ক্লার্ক নামে এক কাউন্টার-টেররিজম এক্সপার্ট *ইউএসএস কোল*-এ আল-কায়েদার বোমা হামলার জবাবে সংগঠনটিকে কাটছাঁট করার একটা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেন ২০০০ সালের ২০ ডিসেম্বর। সে পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানে নিজেদের, অর্থাৎ আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর গোপন তৎপরতা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ানো যাতে বিন লাদেনের অভয়ারণ্য পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব হয়। তখন বিল ক্লিনটন ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু তিনি সে পরিকল্পনা অনুমোদন করেননি। আর কয়েক সপ্তাহ পর বুশ প্রশাসন ক্ষমতায় বসবে, তাদের সিদ্ধান্তের জন্য রেখে যান সেটা। পরের মাসে বুশ ক্ষমতায় বসেন এবং তিনিও সেটা বাতিল করে দেন।

জুলি সারস ছিলেন আমেরিকার ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (DIA)-এর এজেন্ট। ২০০১ সালে দু'বার আফগানিস্তান সফর করেন তিনি। প্রথম সফরের সময় নর্দার্ন অ্যালায়েন্স নেতা, আহমেদ শাহ মাসুদের সাথে পরিচয় হয় তার। দ্বিতীয় দফা সফর শেষে জুলি দেশে ফেরেন 'তথ্যের ভাণ্ডার' নিয়ে। তার একটা ছিল আহমেদ শাহ মাসুদকে হত্যা ষড়যন্ত্র করছেন ওসামা বিন লাদেন (মাসুদ ৯ সেপ্টেম্বর আততায়ীর হাতে নিহত হন; ৮ অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে)। কিন্তু জুলি সেই তথ্যের ভাণ্ডার কোনো কাজে লাগাতে পারেননি। কারণ দেশে পা রাখার সাথে সাথে এক সিকিউরিটি অফিসার এয়ারপোর্ট থেকেই তার ভাণ্ডার ছিনতাই করে নিয়ে যায়। তারপর তার নিজের সংস্থা ডিআইএ এবং এফবিআই-এর জেরার মুখে পড়েন জুলি সারস।

পরে তিনি অভিযোগ করেন, ঊর্ধ্বতন অফিসারদের একজনও তাঁর কাছে শুনতে চাননি আফগানিস্তানে গিয়ে তিনি কি করেছেন, বা সেখান থেকে তিনি কি তথ্য সংগ্রহ করে এনেছেন। অপমানজনকভাবে অগ্রাহ্য করা হয় তাঁকে। অপমান চূড়ান্ত করতে জুলির সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এরপর তিনি আত্মসম্মানের খাতিরে চাকরি ছেড়ে দেন।

২০০১ সালের মে মাস। জাতিসংঘে রাশিয়ার স্থায়ী মিশন প্রধান গোপনে একটি অভাবিতপূর্ব বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করেন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে। ওসামা বিন লাদেন কোথায় আছেন, কোথায় কোথায় তাঁর গোপন ঘাঁটি আছে, তাঁর সরকারী যোগসূত্র এবং বিদেশী পরামর্শদাতা কে কে, তার একটা তালিকা ছিল সেই রিপোর্টে। সমালোচকদের মতে সে রিপোর্টে ওসামা বিন লাদেনকে খতম করার মতো পর্যাপ্ত তথ্য ছিল। কিন্তু বুশ প্রশাসন সে ব্যাপারে কিছুই করেনি। *জেন'স ইন্টেলিজেন্স রিভিউ* পত্রিকার সম্পাদক আলেক্স স্ট্যাভিশ পরে ৯/১১-এর হামলা সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

BanglaBook.org

ওটা ইন্টেলিজেন্সের ব্যর্থতার কারণে ঘটেনি, 'লাদেনের বিপক্ষে না যাওয়ার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে ঘটেছে।'

২০০১ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ ওসামা বিন লাদেন হয়ে ওঠেন আমেরিকার 'মোস্ট ওয়ান্টেড' অপরাধী। তাঁর মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয় ৫ মিলিয়ন ডলার এবং আমেরিকান সরকার তাঁকে হত্যা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে বলে স্থির ধারণা জন্মায় সবার। অথচ জুলাই মাসে ইওরোপের সবচেয়ে বিশ্বস্ত কিছু সংবাদ সূত্রের খবর অনুযায়ী জানা যায়, ওসামা বিন লাদেন ইউনাইটেড আরব আমিরাতের রাজধানী দুবাইয়ের এক আমেরিকান হাসপাতালে দু' সপ্তাহ ধরে চিকিৎসা নিয়েছেন বলে তারা জানতে পেরেছেন।

আমেরিকান সার্জন ড. টেরি কলঅ্যাওয়ে তাঁর চিকিৎসা করেছেন। সেখানে সউদি ইন্টেলিজেন্স প্রধান দেখা করেছেন বিন লাদেনের সাথে। ১২ জুলাই স্থানীয় সিআইএ এজেন্ট, ল্যারি মিচেলও তাঁর সাথে দেখা করেন। এসব রিপোর্ট সিআইএ, সার্জন টেরি, হসপিটাল এবং স্বয়ং বিন লাদেন অস্বীকার করলেও সূত্রগুলো তাদের দাবিতে অটল থেকেছে। 'এখানে এক্সপ্লোসিভ স্টোরি হচ্ছে,' থম্পসন মন্তব্য করেন, 'সারা ইওরোপে বিষয়টা ব্যাপক প্রচার পেলেও আমেরিকায় পেয়েছে খুব সামান্যই।'

এক সময় আমেরিকার ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফেল্ড মন্তব্য করেছিলেন, 'বিন লাদেনকে খোঁজা হবে খড়ের গাদায় সুঁই খোঁজার মত দুঃসাধ্য।' নভেম্বর মাসে বিন লাদেনের আমেরিকা কানেকশনের খবর জানাজানি হয়ে যেতে রামসফেল্ডের সেই মন্তব্যের পাল্টা বক্তব্য রাখতে গিয়ে চসুদোভস্কি বলেন, 'ইচ্ছে করলে আমেরিকা জুলাই মাসেই লাদেনকে গ্রেফতার করে দেশে নিয়ে আসতে পারত। কিন্তু তাদের হাতে নাকি যুদ্ধে জড়ানোর মত কোনো উসিলা ছিল না।'

বুশ, লাদেন ও সউদি রাজ পরিবারের গোপন সংযোগ

প্রশাসনের কর্মকাণ্ডের সমালোচকদের তোলা অন্যতম অস্বস্তিকর একটা প্রশ্ন হলো, জর্জ বুশ, ওসামা বিন লাদেন এবং সউদি রাজ পরিবারের মধ্যকার সম্পর্ক সবাই সাদা চোখে যেরকম দেখে, বাস্তবে সম্ভবত সেরকম নয়। এরকম সন্দেহ করার বেশ কয়েকটা কারণ আছে।

প্রথম কারণ, লাদেন পরিবার সউদি আরবের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও বিত্তশালী পরিবারগুলোর অন্যতম। তাদের সাথে বুশ পরিবারের ২০ বছরেরও পুরনো ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে। দু' নম্বর কারণ, যদিও প্রমাণ করার চেষ্টার ত্রুটি নেই যে ওসামা বিন লাদেন তাঁর বংশের কুলাঙ্গার। সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালানোর জন্য তাঁকে 'ত্যাজ্যপুত্র' করা হয়েছে; পারিবারিক সম্পদ প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে যাতে 'অশুভ বিন লাদেনের' খপ্পর থেকে 'শুভ বিন লাদেন' বেরিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু আসল ঘটনা অন্যরকম। নিজের পরিবারের সাথে তাঁর এখনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় আছে। তৃতীয় কারণ, আমেরিকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সউদি আরবের তরফ থেকে গোপনে প্রায় সব ধরনের

BanglaBook.org

সহযোগিতাই পেয়ে থাকেন বিন লাদেন। চতুর্থ কারণ, ৯/১১-এর পরপরই আটক করার বদলে আমেরিকা তার মিত্র সউদি সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে লাদেন পরিবারের সদস্যদের সে দেশ থেকে নিরাপদে সরে পড়ার আয়োজন করে দেয়।

এমনকি জাতীয় এয়ার ব্যান বা বিমান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকা অবস্থায়ও তাদের জেট প্লেনকে বিনা বাধায় উড়ে যেতে দেয় বুশ প্রশাসন। এবং পঞ্চম কারণ নতুন একটা সন্দেহ। সেটা হলো ২০০৩ সালে যখন হাউস ও সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির ৯/১১ সংক্রান্ত যৌথ তদন্তের রিপোর্ট পেশ করা হয়, তখন বুশ প্রশাসন প্রায় জোর করে সেটার ২৮ টি পৃষ্ঠা 'ব্লক' করে দেয়। খবর অনুযায়ী ওই পৃষ্ঠাগুলোয় ছিল সউদি আরব সম্পর্কিত রিপোর্ট। এবং সর্বশেষ, ৯/১১-এর অভিযুক্ত হাইজ্যাকাররা সবাই ছিল সউদি নাগরিক।

২০০১ সালের ২২ আগস্ট এক কাউন্টার-টেররিজম এক্সপার্ট, জন ও'নিল এফবিআই-এর চাকরি থেকে রিজাইন করেন। ওসামা বিন লাদেনকে ট্র্যাকিঙের কাজে (খুঁজে বের করা) সবচেয়ে সফল অনুসন্ধানী গোয়েন্দা ছিলেন তিনি। রিজাইন করার কারণ হিসেবে ও'নিল বলেন, আল-কায়েদার ব্যাপারে তদন্ত করার সময় প্রতি পদে পদে তার কাজে বাধা দেয়া হচ্ছিল। সংস্থার উঁচু পদে ছিলেন ও'নিল। তিনি অভিযোগ করেন, বাধা আসছিল হোয়াইট হাউজের পক্ষ থেকেও। আল-কায়েদার ব্যাপারে তার তদন্তের আসল বাধা ছিল আমেরিকার অয়েল কর্পোরেট স্বার্থ আর সউদি আরবের রহস্যজনক ভূমিকা। ও'নিল বলেন, 'বিন লাদেন এবং তার সংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যা যা করার দরকার, সবকিছু সউদি আরবে পাওয়া যাবে।'

নাফিজ আহমেদ বলেছেন, ও'নিলের এই বিশ্বাসকে সমর্থন করেছেন তারিক আলি। তিনি লিখেছেন, 'ওসামা বিন লাদেন এবং তার গ্যাং হচ্ছে অক্টোপাসের শুঁড় (ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের অক্টোপাস)। যার মাথা আছে সউদি আরবের মাটিতে, আমেরিকান সেনাবাহিনীর সশস্ত্র পাহারায়।'

বুশ প্রশাসনের ৯/১১-এর ঘটনাবলীর ওপর প্রকাশিত ব্যাখ্যার একজন জোরাল সমর্থক জেরাল্ড পসনার। তিনি একজন লেখক। সরকারী ব্যাখ্যার বেশিরভাগ যুক্তিই তিনি সমর্থন করেছেন। মজার বিষয় হলো, সেই পসনার এখন ৯/১১-এর সমর্থনে কলম ধরেছেন। তিনি বলেন, বিষয়টাকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেয়া উচিত এবং সউদি আরবে এ বিষয়ে খোঁজ-খবর করা উচিত। সরকারের ভেতরকার দুটো অজ্ঞাত সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী তিনি জানান, সউদি নাগরিক আবু জুবায়দাকে আমেরিকা জেরা করেছে।

আবু জুবায়দা ছিল আল-কায়েদার একজন উঁচু পদের নেতা। ২০০২ সালের মার্চের শেষদিকে পাকিস্তানে ধরা পড়ে আবু জুবায়দা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় থিওপেন্টাল সোডিয়াম (Sodium Pentothal) ইঞ্জেকশন পেশ করে। কাজটা করে দুই আরব-আমেরিকান। জিজ্ঞাসাবাদের সময় নিজেদেরকে সউদি নাগরিক পরিচয় দেয় তারা। আবু জুবায়দা নিজে সউদি। তাই লোক দুটোকে নিজের প্রতি সহানুভূতিশীল মনে করে পেটের সব কথা খুলে বলে সে। অবশ্য সে জন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়াও যথেষ্ট

BanglaBook.org

সহায়তা করে।

লোক দু'টো তাকে রক্ষা করবে ভেবে জুবায়দা বলে, আল-কায়েদার সদস্য সে। এক সিনিয়র সউদি অফিশিয়ালের অধীনে কাজ করে। প্রশ্নকারীরা যাতে তার কথা উড়িয়ে না দেয়, সে জন্য জুবায়দা বাদশাহ্ ফাহাদের এক ভাগ্নের নাম ও টেলিফোন নাম্বার দিয়ে তাকে ফোন করে নিশ্চিত হয়ে নিতে বলে। বাদশাহ্র সেই ভাগ্নের নাম প্রিন্স আহমেদ বিন সালমান বিন আব্দুল আজিজ। বিশাল এক পাবলিশিং সাম্রাজ্যের চেয়ারম্যান এবং কেন্টাকি ডারবি বিজয়ীদের জন্য ওয়ার এমব্লেম প্রস্তুতকারী থরোব্রেড কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা তিনি।

জুবায়দা প্রিন্সের একাধিক মুখস্থ টেলিফোন নাম্বার তাদেরকে জানায়। আরব-আমেরিকান জিজ্ঞাসাবাদকারীরা তাকে বলে ৯/১১-এর ঘটনা সবকিছু পাল্টে দিয়েছে, প্রিন্স এখন নিশ্চয়ই আল-কায়েদাকে আর সমর্থন করেন না। জুবায়দা জোর দিয়ে বলে: ৯/১১-এর কারণে কিছুই বদলায়নি। কারণ প্রিন্স আগে থেকেই জানতেন ওইদিন আমেরিকায় হামলা চালানো হবে। তার দাবি যে মিথ্যে নয়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বাদশাহ্র আরও দুই আত্মীয়ের টেলিফোন নাম্বার তাদেরকে জানায় জুবায়দা। তাঁরা হলেন প্রিন্স সুলতান বিন ফয়সাল বিন তুরকি আল সাউদ এবং প্রিন্স ফাহাদ বিন তুরকি বিন সাউদ আল কবির।

এই ঘটনার চার মাসেরও কম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন আলামত দেখে পসনারের ধারণা হয়, জুবায়দা সত্যি কথাই বলেছে। কারণ সে যে তিন সউদির নাম বলেছিল, ৮ দিনের মধ্যে তাদের সবাই রহস্যজনকভাবে মারা যান। ২০০২ সালের ২২ জুলাই প্রিন্স আহমেদ (৪৩) হার্টের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান বলে খবরে জানা যায়। পরদিন সুলতান বিন ফয়সাল (৪১) কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। এর এক সপ্তাহ পর প্রিন্স ফাহাদ বিন তুরকি (২১) 'তৃষ্ণায় মারা যান।'

প্রিন্স ফয়সাল বিন তুরকি ছিলেন সউদি ইন্টেলিজেন্সের প্রধান। আবু জুবায়দা জানিয়েছে, সে ওসামা বিন লাদেন ও প্রিন্স সুলতান বিন ফয়সালকে একাধিকবার মিটিং করতে দেখেছে। একটা মিটিং হয়েছিল আফগানিস্তানের কান্দাহারে, ১৯৮৮ সালে। সেই মিটিঙে প্রিন্স তুরকি কথা দিয়েছিলেন, সউদি সরকার কখনও বিন লাদেনকে দেশে ফেরত পাঠানোর দাবি জানাবে না এবং তালেবান সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিন লাদেন সউদি রাজতন্ত্রের ওপর হামলা না চালানোর প্রতিজ্ঞা বজায় রাখবেন।

প্রিন্স তুরকিকে ৯/১১-এর দশদিন আগে সউদি ইন্টেলিজেন্সের প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। পরে তিনি ইংল্যান্ডে সউদি অ্যামবাসাডর নিযুক্ত হন। সে যাই হোক, সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখলে মনে হয় সউদি রাজ পরিবার, ওসামা বিন লাদেন এবং বুশ প্রশাসনের এই ঘনিষ্ঠ সংযোগের কারণে আমেরিকার পক্ষে বিন লাদেনকে ধরা সম্ভব হয়নি। দুই ইনভেস্টিগেটিভ বা অনুসন্ধানী সাংবাদিক; গ্রেগরি প্যালাস্ট, ডেভিড পালিস্টার এবং কিছু কিছু ইউএস ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট অনেকদিন থেকেই অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন, তারা বিন লাদেন পরিবারের ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত

BanglaBook.org

চালাতে পারছেন না। তাদেরকে রাজনৈতিক কারণে বারবার বাধা দেয়া হচ্ছে।

তারা আরও অভিযোগ করেন, বুশ প্রশাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকে পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হতে থাকে। বিন লাদেন পরিবার ও সউদি রাজ পরিবারের কোনো বিষয় নিয়ে তদন্ত করা থেকে তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় 'ব্যাক অফ' বা দূরে থাকতে নির্দেশ দেয়া হয় প্রশাসন থেকে।

প্যালাস্ট এক টেলিভিশন ইন্টারভিউতে বলেছেন 'কোনো সন্দেহ নেই পার্ল হারবারের পর ইন্টেলিজেন্সের এতবড় ব্যর্থতা এ দেশে আর ঘটেনি। কিন্তু এখন আমরা যা বুঝতে পারছি, তা হলো এ বিপর্যয় তাদের ব্যর্থতার কারণে ঘটেনি। ঘটেছে সর্বোচ্চ মহলের নির্দেশে।'

এক ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট প্যালাস্টের এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন 'বিন লাদেন পরিবার প্রশ্নে নির্দিষ্ট কিছু তদন্তকে হত্যা করা হয়েছে।'

***

তবে এ কথাও ঠিক যে, কেবল বিন লাদেন পরিবারের ক্ষেত্রেই তদন্ত কাজে বাধা দেয়া হয়নি। নাফিজ আহমেদ ও থম্পসনের মতে এরকম আরও বেশ কয়েকটি কেসের ফল একই হয়েছে। তদন্ত ইতিবাচক দিকে যাচ্ছে বোঝা গেলেই প্রশাসনের দিক থেকে নানান বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছে তদন্তকারীদের। এটা আরও বেশি করে হয়েছে ৯/১১-এর ঘটনা তদন্ত করে দেখার জন্য গঠন করা যৌথ কমিটির বেলায়। তারপরও প্রায় সব ক'টা তদন্তের ফলাফলের উপসংহারে বলা হয়েছে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর ব্যর্থতার জন্যই ৯/১১ ঘটেছে। এটা দুঃখজনক তবে না বোঝার মতো কিছু নয়।

যখন বলা হয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো যতখানি স্বীকার করেছে তারচেয়ে অনেক বেশি তথ্য পেয়েছে, তখন যৌথ তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে জবাব দেয়া হয়েছে, তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মিসও করেছে। 'আর এ ধরনের মিস তখন হয়, যখন মানুষ... আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।'

তবে এখন আমি যে সমস্ত কেস নিয়ে আলোচনা করব, সেগুলোর ক্ষেত্রে গোয়েন্দারা খুব বেশি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন বলে মনে হয় না।

BanglaBook.org

ফিনিক্স-এ এফবিআইকে অগ্রাহ্য করা হয়

২০০১ সালের ১০ জুলাই ফিনিক্স-এর এফবিআই এজেন্ট কেন উইলিয়ামস একটা বহুল আলোচিত মেমোরেন্ডাম পাঠায় এফবিআই হেডকোয়ার্টার্সের কাউন্টার টেররিজম ডিভিশনে। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকজনের সন্দেহজনক আচরণের ব্যাপারে সেটায় সতর্ক করা হয় সংস্থাকে। বলা হয়, লোকগুলো ফ্লাইট চালনার ট্রেইনিং নিচ্ছে। কেন উইলিয়ামস এই লোকগুলোর ব্যাপারে তদন্ত শুরু করে ২০০০ সালে, কিন্তু সেই

মেমোরেন্ডাম পাঠানোর পর তাকে আগুন লাগার ঘটনার অন্য এক কেসের তদন্তে লাগানো হয়। এই ঘটনায় অবাক হন এফবিআই-এর সাবেক এক রিটায়ার্ড এজেন্ট।

সংস্থার ডিরেক্টর মুলারকে ৯/১১-এর ঘটনার পর চিঠি লেখেন তিনি। প্রশ্ন করেন : 'কেন আপনার সেরা টেররিজম ইনভেস্টিগেটরকে ফ্লাইট-স্কুল কেস থেকে সরিয়ে নিয়ে সাধারণ একটা আরসন কেস তদন্ত করতে পাঠালেন?'

তিনি এই চিঠি লেখার পর কেন উইলিয়ামসকে সেই ফ্লাইট-স্কুল কেসে এক মাসের জন্য ফিরিয়ে আনা হয়েছিল বটে। কিন্তু ততদিনে যা ঘটার ঘটে গেছে।

মিনিয়াপোলিসে এফবিআই তদন্তের পথরোধ

২০০১ সালের আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে মিনিয়াপোলিসের এক ফ্লাইট স্কুলের কর্মচারী এফবিআইকে জানায়—জাকারিয়া মুসাওই নামে এক লোক বোয়িং ৭৪৭-এর সিমিউলেটর বা কৃত্রিম ৭৪৭ বোয়িং চালনা শেখার জন্য টাকা জমা দিয়েছে। সে আসলে বোয়িং ৭৪৭-কে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।

স্থানীয় এফবিআই লোকটাকে অ্যারেস্ট করার পর তার কাছে সন্দেহজনক নানান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। তার একটা হলো ল্যাপ টপ কম্পিউটার। এরপর এফবিআই-এর হেডকোয়ার্টার্সের কাছে লোকটার ল্যাপ টপে কি আছে, সার্চ করে দেখার জন্য সার্চ ওয়ারেন্ট চাওয়া হয়। এদিকে এফবিআই হেডকোয়ার্টার্সে ফ্রান্সের কাছ থেকে জাকারিয়া মুসাওই সম্পর্কে নানান সতর্কবাণী আসে। যার মূল কথা ছিল লোকটা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড এক হুমকি।

এই সতর্কবাণীর কথা প্রথম জানা যায় জাঁ-চার্লস ব্রিসার্ড ও গুইলউম ডাসকি-র লেখা *ফরবিডেন ট্রুথ ইউ এস-তালিবান সিক্রেট অয়েল ডিপ্লোম্যাসি অ্যান্ড দ্য ফেইল হান্ট ফর বিন লাদেন* বা নিষিদ্ধ সত্য: ইউএস-তালেবান গোপন তেল কূটনীতি ও বিন লাদেনকে শিকারে ব্যর্থতা বইয়ে। ব্রিসার্ড ছিলেন ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিসের সাবেক এজেন্ট। ২০০১-এর নভেম্বরে যখন এ বই বাজারে আসে, তখন আমেরিকান সরকারের ভেতরের-বাইরের সন্দেহপ্রবণরা লেখককে উপহাস করেছিলেন ফরাসি ইন্টেলিজেন্স এফবিআইকে জাকারিয়া মুসাওইর ব্যাপারে সতর্ক করেছিল দাবি করায়। তবে কলিন রাউলির মেমো জানাজানি হয়ে গেলে পরিস্থিতি বদলে যায়।

সে যাই হোক, সার্চ ওয়ারেন্টের ব্যাপারে সিনিয়র এফবিআই অফিশিয়ালরা জবাব দেন, এই সাধারণ অভিযোগে কারও ল্যাপ টপ সার্চ করার অনুমতি দেয়া ঠিক হবে না। কিন্তু মিনিয়াপোলিসের সেই এজেন্ট এরমধ্যে ফ্রান্সের পাঠানো সতর্কবাণী দেখেছে। তাই সার্চ ওয়ারেন্টের জন্য হন্যে হয়ে ওঠে সে। ওদিকে আরেক এজেন্ট সন্দেহ প্রকাশ করে 'মুসাওই কিছু একটা নিয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আঘাত করার পরিকল্পনা করছে।'

এদিকে কম্পিউটার ল্যাপ টপ সার্চ করতে মরিয়া এজেন্ট সার্চ ওয়ারেন্টের জন্য হেডকোয়ার্টার্সের কাছে ফরেন ইন্টেলিজেন্স সার্ভেইলেন্স অ্যাক্ট (FISA)-এর অধীনে আবেদন জানায়। এরপর ওয়ারেন্ট ইসু না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

BanglaBook.org

অতীতে এরকম অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কখনো ফিরিয়ে দেয়নি। তবে হেডকোয়ার্টার্স এ ক্ষেত্রে ঘটনা তদন্ত করার দায়িত্ব আবেদনকারীকে না দিয়ে র‍্যাডিকাল ফান্ডামেন্টালিস্ট ইউনিটকে (RFU) দেয়।

আরএফইউ এজেন্ট ম্যারিয়ন 'স্পাইক' বোম্যানকে মুসাওই সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার দায়িত্ব দেয়। 'স্পাইক' জানতে পারে চেচনিয়ার একটি বিদ্রোহী গ্রুপের মাধ্যমে আল-কায়েদার সাথে মুসাওইর সম্পর্ক আছে। কিন্তু এফবিআই-এর ডেপুটি জেনারেল কাউন্সেল বলেন, মুসাওইর সাথে আল-কায়েদার এমন কোনো সম্পর্ক নেই যাতে সার্চ ওয়ারেন্ট ইসু করা যেতে পারে।

ওয়ারেন্ট ইসু করার অনুরোধ তিনি এমনকি ফরেন ইন্টেলিজেন্স সার্ভেইল্যান্স অ্যাক্ট (FISA)-এর কাছে ফরোয়ার্ডও করেননি। মিনিয়াপোলিসের এফবিআই লিগ্যাল অফিসার কলিন রাউলি প্রশ্ন করেন 'একজন এফবিআই এজেন্ট কেন ইচ্ছে করে একটা কেস স্যাবোটাজ করবে?'

এরকম অনুরোধ 'ব্লক' করে দেয়ায় মিনিয়াপোলিসের অন্যান্য এজেন্ট রসিকতা করে বলে, হেডকোয়ার্টার্সে নিশ্চয়ই 'মোল (স্পাই)' আছে বিন লাদেনের পক্ষে কাজ করার। অন্য এক এজেন্টের অভিযোগ 'এই ব্যর্থতার আয়োজন' এফবিআই হেডকোয়ার্টার্সই করেছে। যৌথ তদন্ত কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টের 'ফাইন্ডিংস'-এর সারাংশের সাথে এই ঘটনার তুলনা বেশ মজার। তাতে বলা হয় 'ফরেন ইন্টেলিজেন্স সার্ভেইল্যান্স অ্যাক্টের অধীনে কোনো ওয়ারেন্ট পেতে হলে কি ধরনের আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়, সে ব্যাপারে র‍্যাডিকাল ফান্ডামেন্টালিস্ট ইউনিট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ল ইউনিট এবং এফবিআই হেডকোয়ার্টার্সের পার্সোনেলরা, সবাই ভুল করেছেন। ফিসার প্রক্রিয়া অনেক দীর্ঘ এবং তাতে নিজ দায়িত্বে কাজ করায় অনেক ঝুঁকি থাকে।'

রিপোর্টের 'ফাইন্ডিংস'-এ কোনো 'স্যাবোটাজ' নেই। আছে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা ভুল বোঝাবুঝি। কলিন কাউলির বাক্যবাণে বিদ্ধ করা সেই রিপোর্টের কয়েক মাস পর এই 'ফাইন্ডিংস' প্রকাশ করা হয়। নিচে কাউলির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরে এটা পাবলিক রেকর্ডে পরিণত হয়। মিনিয়াপোলিসের এফবিআই-এর এজেন্টদের সবাইকে যৌথ তদন্ত কমিটি কিভাবে 'বিভ্রান্ত' ভাবল, বিষয়টা হতবাক করার মতো।

যাই হোক, ৯/১১-এর আগে মিনিয়াপোলিসের এফবিআই-এর এজেন্টরা মুসাওইর ল্যাপ টপ কম্পিউটার বা আর কিছু পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পায়নি। পরে সেগুলো সার্চ করা হয় এবং এফবিআই-এর সাবেক ডেপুটি ডিরেক্টর মন্তব্য করেন, 'সেসবের মধ্যে ৯/১১-এর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।' কিন্তু কংগ্রেসনাল তদন্তকারীদের বরাত দিয়ে *ওয়াশিংটন পোস্ট* জানিয়েছিল, জাকারিয়া মুসাওইর কম্পিউটারে যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা আগে যতটা ভাবা হয়েছিল তার চেয়েও বেশি মূল্যবান।

তাতে মুসাওই 'হামবুর্গের মূল হাইজ্যাকিং সেলের সাথে' এবং 'মালয়েশিয়ায় আল-কায়েদার কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত' বলে উল্লেখ ছিল। অতীতে তার কার্যকলাপ

BanglaBook.org

সিআইএ মনিটর করত। এ প্রসঙ্গে *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর মন্তব্য এটা নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে—ফেডারেল বুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) বা অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা হাইজ্যাকিং ঠেকানোর উদ্যোগ কেন নেয়নি?

৯/১১-এর তিনদিন পর এফবিআই নতুন নিযুক্ত ডিরেক্টর, মুলার আগের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। 'সেটায় এমন কোনো সতর্ক সংকেত ছিল না যাতে প্রমাণ হয় এরকম একটা কিছু দেশে ঘটতে যাচ্ছে।'

কলিন রাউলি এবং মিনিয়াপোলিসের অন্য সব এজেন্ট নতুন ডিরেক্টরের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। তাকে মুসাওই কেস সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেন, যাতে নতুন ডিরেক্টর 'পাবলিক সেন্টিমেন্ট যথাযথভাবে সামাল দিতে সফল' হন। তারপরও মুলার বারবার একই বিবৃতি দিয়ে যেতে থাকেন। ২০০২ সালের ৮ মে সিনেট হিয়ারিং কমিটির সামনে জবানবন্দি দিতে গিয়েও তিনি বলেন, 'এজেন্সির হাতে এমন কোনো তথ্য ছিল না যাতে আসন্ন ঘটনা আঁচ করা যায় বা প্রতিরোধ করা যায়।'

খবরে জানা যায়, এই হিয়ারিঙের রিপোর্ট অনুযায়ী মুলার শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন ৯/১১-এর এক মাস আগে একজন এফবিআই এজেন্ট তার অনুমানের কথা জানিয়েছিল যে, 'মুসাওই হয়তো নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্লেন ক্র্যাশ করানোর ট্রেইনিং নিচ্ছে।'

এ ঘটনার দুই সপ্তাহ পর এফবিআই কিভাবে মুসাওই কেস অবহেলা করেছে, তা নিয়ে এক দীর্ঘ রিপোর্ট লেখেন লিগ্যাল অফিসার কলিন রাউলি। *টাইম* ম্যাগাজিন সেটাকে আখ্যা দেয় 'কলোসাল ইন্ডিক্টমেন্ট অব আওয়ার চিফ ল-এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি'জ নেগলেক্ট' বা আমাদের প্রধান আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে অবহেলার বিশাল অভিযোগপত্র।

এসব প্রকাশ হওয়ার পর মুলার তার অবস্থান থেকে খানিকটা সরে এসে বলেন 'আমি নিশ্চিত নই যে একেবারে কোনো সূত্রই আমাদের গোচরে আসেনি, যা হাইজ্যাকারদের কাছে নিয়ে যেতে পারত আমাদেরকে।'

শিকাগোতে এফবিআই তদন্তের গতিরোধ

১৯৯৮ সালে এফবিআই এজেন্ট রবার্ট রাইট শিকাগোর একটি সন্ত্রাসী সংস্থাকে অনুসরণ শুরু করেন। তাঁর সন্দেহ ছিল ওই বছর আমেরিকান দূতাবাসে যে বোমা হামলা হয়েছিল, শিকাগো প্রবাসী এক সউদি মিলিয়নেয়ার সেটার অর্থায়ন খরচ জুগিয়েছে। ২০০১ সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ রবার্ট নাইটের ধারণা দৃঢ় হয় যে তদন্ত সঠিক পথেই চলেছে। এই সময় তাঁকে জানানো হয়, উপরের নির্দেশে তদন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

জুন মাসে এজেন্ট রাইট একটা ইন্টারনাল মেমো লেখেন। তাতে তিনি অভিযোগ করেন যে, সন্ত্রাসী আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা না করে এফবিআই বরং 'তথ্য সংগ্রহ করছিল যাতে বুঝতে পারে সন্ত্রাসী হামলা হলে কাকে কাকে গ্রেফতার করতে হবে।'

BanglaBook.org

২০০২ সালের মে মাসে রাইট ঘোষণা করেন, সেই বিষয়টি নিয়ে তাঁর লেখা বই এফবিআই ছাপাতে দিচ্ছে না বলে তিনি সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করবেন।

পরে এক ইন্টারভিউতে রবার্ট রাইট বলেন উপর মহল থেকে তাঁকে বলা হয়, সেই কেসের তদন্ত থামিয়ে দেয়া হয়েছে কারণ 'ঘুমন্ত কুকুরকে ঘুমাতে দেয়াই ভালো'। রাইট বলেন, 'কিন্তু কুকুরগুলো ঘুমাচ্ছিল না। প্লেন চালানো ট্রেইনিং নিচ্ছিল... সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য তৈরি হচ্ছিল। সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ হচ্ছে এফবিআই-এর চরম অযোগ্যতার ফল।

তবে শিকাগো ফেডারাল প্রসিকিউটর মার্ক ফ্লেচনারের ধারণা অযোগ্যতা নয়, আরও অনেক বড় কোনো কারণ ছিল এফবিআই-এর এই কেস আর আগে বাড়াতে না চাওয়ার পিছনে। তিনি বলেন 'আমি জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে যতটুকু ক্ষমতাবান, এই ঘটনার পিছনে তারচেয়ে অনেক বড়, অনেক বেশি ক্ষমতাবান শক্তি কাজ করেছে। তারা চায়নি এফবিআই অভিযোগ গঠনে সফল হোক।'

নিউ ইয়র্কে এফবিআই তদন্তের গতিরোধ

২০০১ সালের ২৮ আগস্ট। ৯/১১-এর ঘটনায় জড়িত হাইজ্যাকারদের একজন ছিল খালিদ আলমিদার। নিউ ইয়র্ক এফবিআই-এর সন্দেহ আমেরিকান জাহাজ *ইউএসএস কোল*-এ বোমা হামলায়ও এই লোক জড়িত ছিল। নিজেদের সন্দেহের কথা হেডকোয়ার্টার্সকে জানায় তারা। লোকটার নামে তদন্ত শুরু করতে বলে। কিন্তু সে অনুরোধ নাকচ করে দেয়া হয় 'সেনসিটিভ ইন্টেলিজেন্স ইনফর্মেশনের অভাবে আলমিদারকে *কোল* ঘটনায় জড়ানো যাবে না বলে।

এই ঘটনায় নিউ ইয়র্ক এফবিআই এজেন্টদের একজন ই-মেইলে তার হতাশার কথা লেখেন 'কেন এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হলো... একদিন কেউ না কেউ মরবে... জনগণ ভাববে কেন আমরা আরেকটু তৎপর হতে পারি না। আশা করব এফবিআই-এর জাতীয় নিরপত্তা আইন বিষয়ক ইউনিট তাদের সিদ্ধান্তের পিছনে দৃঢ় অবস্থান নেবে। বিশেষ করে যখন আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু ওসামা বিন লাদেন নিজেই এখন সবার চেয়ে বেশি 'প্রোটেকশন পাচ্ছে।'

BanglaBook.org

স্পাই-এর জন্য ন্যায়বিচার

৯/১১-এর হামলার পর সিবেল এডমন্ডস ও ক্যান ডিকারসন নামে দুই অনুবাদক নিয়োগ করে এফবিআই। প্রথমজন মেয়ে সে তার সিনিয়র অফিশিয়ালদের জানায়, ডিকারসন আগে নির্দিষ্ট এক বিদেশী সংস্থায় কাজ করেছে। এফবিআই তদন্ত চালিয়েছিল সেটার কার্যক্রমের উপর। এই প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি ডিকারসন ভুল অনুবাদ করে থাকে, অথবা অনুবাদই করে না। এডমন্ডস আরও জানায়, ডিকারসন এখানে

তাকে সেই বিশেষ সংস্থার জন্য গোয়েন্দাগিরি করার নির্দেশসহ হুমকি দিয়েছে, তার কথা না শুনলে সে দেখে নেবে।

কিন্তু এডমন্ডস পরে জানায়, সে একাধিকবার অভিযোগ জানানোর পরও এফবিআই তার কথার গুরুত্ব দেয়নি। কাজেই মার্চ মাসে মেয়েটি জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর জেনারেল বরাবর একটা চিঠি লেখে এবং তার পরপরই তাকে বরখাস্ত করা হয় 'হুইসলব্লোইং' বা বাঁশি ফোকার অভিযোগে। এডমন্ডস এফবিআই-এর বিরুদ্ধে কেস করেন।

অক্টোবর মাসে অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাশক্রফট রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা আর 'বিদেশ নীতি সুরক্ষা এবং আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে' এডমন্ডসের আবেদন ছুড়ে ফেলে দেয়ার আবেদন জানান কোর্টের কাছে।

সমালোচকরা ভেবে অবাক হন, যে বিদেশী সংস্থার সন্দেহজনক কার্যকলাপ এফবিআই নিজে তদন্ত করেছে, সেই সংস্থার নিয়োজিত স্পাই এফবিআই-এরই তদন্ত স্যাবোটাজ করছে বলে ওঠা অভিযোগ অগ্রাহ্য করা হলে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষিত হবে কিভাবে?

স্কিপারস, এফবিআই এজেন্ট বনাম সরকার

অ্যাটর্নি ডেভিড স্কিপারস ১৯৯৮ সালের ইউএস হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস জুডিশিয়ারি কমিটির প্রধান তদন্তকারী কাউন্সেল এবং ১৯৯৯ সালে মনিকা লিউনিস্কি মামলায় প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে ইমপিচকারী চিফ প্রসিকিউটর ছিলেন। ২০০১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, এফবিআই-এর এজেন্টদের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে তিনি ৯/১১-এর ছয় সপ্তাহ আগেই জানতে পেরেছিলেন যে লোয়ার ম্যানহাটনে হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এবং সে ব্যাপারে তিনি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাশক্রফটকে সতর্ক করার উদ্যোগও নিয়েছিলেন।

সেদিন এবং পরের প্রতিটা বিবৃতিতে স্কিপারস দাবি করেন হামলার তারিখ, লক্ষ্যবস্তু এবং হাইজ্যাকার ও তাদেরকে যারা টাকা জোগান দিয়েছে, তাদের সবার নাম ইত্যাদি ঘটনার কয়েক মাস আগে থেকেই এফবিআই এজেন্টদের জানা ছিল। তারপরও এফবিআই বিষয়টা তদন্ত করেনি। উল্টে বরং যারা এসব জানত, তাদেরকে হুমকি দেয়া হয়, যদি তারা এসব তথ্য প্রকাশ করে তাহলে নানান অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি করা হবে তাদেরকে। স্কিপারস বলেন, এজেন্টরা নিরুপায় হয়ে তাকে অনুরোধ করে তিনি যেন সরকারের উঁচু মহলে প্রভাব খাটিয়ে সরকারকে হামলা ঠেকানোর ব্যবস্থা নিতে রাজি করান।

কিন্তু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন স্কিপারস। পরে এফবিআই-এর কয়েকজন এজেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ফেডারাল সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি নেন, যাতে তারা বিচারকের সামনে নির্ভয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারে। এই মামলায়

BanglaBook.org

আরেক আইনী প্রতিষ্ঠান জুডিশিয়াল ওয়াচ তাঁকে সহায়তা করে। স্কিপারসের মামলার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানানো হয়।

নাফিজ আহমেদ জানান, কনজারভেটিভ ম্যাগাজিন *দ্য নিউ আমেরিকান*-এ তাদের মধ্য থেকে তিনজন এজেন্টের ইন্টারভিউ ছাপান রিপোর্টার উইলিয়াম নর্ম্যান গ্রিগ। তিনি জানান, এজেন্টরা অ্যাটর্নি ডেভিড স্কিপারসকে যে সমস্ত তথ্য দিয়েছিল, তা এফবিআই-এর প্রায় প্রত্যেকেরই জানা ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল 'সবচেয়ে অভিজ্ঞ'। সে একদম সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল ১১ সেপ্টেম্বর কি কি ঘটবে। গ্রিগ এজেন্টদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন 'এফবিআই-এর কারও অজানা নেই যে এতসব সতর্কবাণী ওয়াশিংটন কিভাবে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছে।'

এসব রিপোর্ট পড়লে ধাঁধা লাগে, যৌথ তদন্ত কমিটির রিপোর্টের উপসংহার কিসের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল তাহলে? কেন তারা বলেছিল এসব খবরের কোনোটাই ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির জানা ছিল না?

ঘটনার সময়, স্থান এবং হামলার ধরন সম্পর্কে সবকিছু সুনির্দিষ্টভাবে জানা থাকার পরও এমন ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারে?

ভিসা এবং ওয়াচ লিস্ট অমান্য

৯/১১-এর পরপরই অভিযুক্ত হাইজ্যাকারদের ব্যাপারে বেশ কিছু অনিয়মের কথা জানাজানি হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এ ঘটনার রিং লিডার বলে পরিচিত মোহাম্মদ আতাকে ২০০১ সালে তিনবার আমেরিকা সফরের অনুমতি দেয়া হয়। অথচ তথ্য অনুযায়ী তার ভিসার মেয়াদ ২০০০ সালেই ফুরিয়ে গিয়েছিল।

তা সত্ত্বেও মানুষটা ইচ্ছেমতো আমেরিকায় আসা-যাওয়া করতে পেরেছে, প্লেন চালনা ট্রেইনিং নেয়ার সুযোগ পেয়েছে, সন্ত্রাসীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পেরেছে। অথচ দাবি করা হয়েছে, সে নাকি সব সময় এফবিআই-এর নজরদারীর আওতার মধ্যেও ছিল। আরও জানা গেছে, ৯/১১-এর হামলা পরিকল্পনার সাথে কম করেও ৫০ জন জড়িত ছিল।

অ্যাকিউরেসি ইন মিডিয়া (AIM) তার পর্যালোচনায় এর সমালোচনা করে বলে তারপরও ষড়যন্ত্রকারীরা বিনা বাধায় এগিয়ে যেতে পেরেছে। সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হলো, এরা আইন প্রয়োগকারী বাহিনীগুলোর হাত থেকে কতখানি নিরাপদ ছিল, কতটা হুমকিমুক্ত ছিল... তারা এ দেশে অব্যাহতভাবে আসা-যাওয়া করেছে। তাদের অনেকের নাম নাকি সরকারের তথাকথিত ওয়াচ লিস্টেও ছিল... তারপরও তাদের কোনো সমস্যা হয়নি।

সমালোচকরা মনে করেন, প্রশাসনের অযোগ্যতাই শুধু নয়, এর ভেতরে আরও কিছু ছিল। আরও অনেক কিছু, আরও গভীর কিছু।

BanglaBook.org

হাইজ্যাকারদের আসল পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন

আমি ৯/১১-এর 'হাইজ্যাকার' শব্দটার আগে প্রায় প্রতিবারই 'অভিযুক্ত' বিশেষণটি কেন যোগ করছি, কেন তাদেরকে সরাসরি অভিযুক্ত বলছি না, এখন তা ব্যাখ্য করার সময় এসেছে। তবে এটাও বলে রাখছি যে, ইসুটা এই অধ্যায়ের নয়। ৯/১১-এর অনেক প্রশ্নের জবাব এখনও সবার অজানাই রয়ে গেছে। তার মধ্যে বিশেষ একটা হলো এই 'অভিযুক্ত' মানুষগুলোর পরিচয়। হাইজ্যাকার হিসেবে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারাই সত্যিকারের হাইজ্যাকার কি না, সে রহস্য এখনও পর্যন্ত রহস্যের চাদরেই ঢাকা আছে।

ঘটনার পরপরই খবরের কাগজে যে সমস্ত কাহিনী ছাপা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে এফবিআই-এর সনাক্ত করা অন্তত পাঁচজন হাইজ্যাকার বেঁচে আছে। এবং সেসব কাহিনির সমর্থনে প্রমাণও পাওয়া গেছে 'স্টোলেন আইডেন্টিটি' বা চুরি যাওয়া পরিচয় সূত্রে। মেইসানের রিপোর্টে জানা যায়, ওয়াশিংটনের সউদি এমব্যাসি বলেছে, আব্দুল আজিজ আল-ওমারি (যাকে ফ্লাইট ১১-এর পাইলট বলে মনে করা হচ্ছে এবং যে ডাব্লিউটিসি-র উত্তর টাওয়ারে হামলা করেছে), মোহান্দ আল-শেহরি, সালেম আল-হাজমি ও সাঈদ আল-ভামদি, এরা সবাই বেঁচে রয়েছে এবং সউদি আরবে আছে।

মেইসান আরও জানান, পাঁচ নম্বর অভিযুক্ত হাইজ্যাকার, ওয়ালিদ এম. আল-শেহরি লন্ডন ভিত্তিক আরবি ভাষার দৈনিক, *আল-কুদস আল-আরাবি*-তে সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন। একটা রিপোর্টে এমন দাবিও করা হয় যে, সেদিনকার সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্যরা আসলে ভুয়া কি না, তদন্তকারীরা এখন সেই সম্ভাবনা যাচাই করে দেখছেন। এফবিআই পরিচালক মুলার দাবি করেছেন, এ ঘটনায় যতদূর জানা গেছে ১৯ জন হাইজ্যাকার জড়িত ছিল।

'তারপরও অনেকের নাম ও ছবি মিলছে না,' অভিযোগ করেছেন পল থম্পসন। 'তাদের সত্যিকারের নাম-ধাম জানতে পারলে বোধহয় প্রশাসনের জন্য আসল বিব্রতকর সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে।'

অন্য এক রিপোর্ট অফিশিয়াল ব্যাখ্যার ব্যাপারে নতুন সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। যাতে বলা হয়েছে, হাইজ্যাকাররা সবাই ফান্ডামেন্টালিস্ট মুসলিম বা মৌলবাদী মুসলমান। অথচ সে রিপোর্টে এ কথাও বলা আছে যে, ২০০১-এর মে ও আগস্ট মাসে মোহাম্মদ আতাসহ অভিযুক্ত হাইজ্যাকারদের কয়েকজন অন্তত ছয়বার লাস ভেগাস সফর করেছে। সেখানে গিয়ে তারা নাকি 'অ্যালকোহল পান করেছে, জুয়া খেলেছে এবং স্ট্রিপ ক্লাবেও গেছে। সেখানে তাদের জন্য ল্যাপ নাচের আয়োজনও করা হয়েছিল।'

প্রশ্ন মৌলবাদী মুসলমানরা সুইসাইড মিশনের মাধ্যমে তাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে যাওয়ার আগে এইসবই করে নাকি?

শুধু এ-ই নয়, আরও আছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, তারা মোহাম্মদ আতার দুটো ব্যাগ এয়ারপোর্টে 'পড়ে পেয়েছে' যেগুলো নাকি ফ্লাইট ১১ তে তোলার কথা ছিল। সে ব্যাগে অনেক কিছু ছিল। যেমন বোয়িং বিমানের ফ্লাইট সিমুলেশন ম্যানুয়ালস, এক খণ্ড

BanglaBook.org

কোরান শরিফ, একটা ধর্মীয় ক্যাসেট, অন্যান্য হাইজ্যাকারদের মানসিক প্রস্তুতি সম্পর্কিত নোট, তার উইল এবং ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স।

নিউ ইয়র্কার-এর এক রিপোর্টার লেখেন তদন্তকারীদের অনেকের বিশ্বাস, সন্ত্রাসীদের পরিচিতি আর প্রস্তুতির প্রাথমিক সূত্র; যেমন ফ্লাইট ম্যানুয়ালস ইত্যাদি পাওয়া যাবে জানা কথাই। একজন সাবেক হাই-লেভেল ইন্টেলিজেন্স অফিসার আমাকে বলেছেন 'তবে আতার ব্যাগে যা যা পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হচ্ছে, সব ইচ্ছে করেই ফেলে রাখা হয়েছিল। এফবিআই-এর অনুসরণের সুবিধের জন্য। এ ক্ষেত্রে থম্পসনের প্রশ্ন 'মোহাম্মদ আতা জানত আর কিছুক্ষণের মধ্যে প্লেনটা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সব যাত্রীর মতো তাকেও মরতে হবে। তারপরও নিজের উইল সাথে আনতে গেল কেন?'

সন্দেহ দেখা দিয়েছে আরেক অভিযুক্ত হাইজ্যাকারের পড়ে পাওয়া পাসপোর্ট নিয়েও। ৯/১১-এর পরদিন ডাব্লিউটিসি টাওয়ার থেকে কয়েক ব্লক দূরে পড়ে পাওয়া যায় সউদি নাগরিক সাতাম আল-সুকামির পাসপোর্ট। প্রথমে অনেক পত্রিকা ওটাকে ভুল করে আতার পাসপোর্ট বলে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল। কিন্তু আসল বিষয়টা হলো একটি পত্রিকার প্রশ্ন: 'ওই নারকীয় আগুনের মধ্যে তার ব্যাগটা অক্ষত থাকল কিভাবে?'

***

এই অধ্যায় থেকে অফিশিয়াল দুষ্কর্মের ৩ নম্বর ধারণা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়। দেশের অন্তত একটা গোয়েন্দা সংস্থা, ফেডারেল বুরো অব ইনভেস্টিগেশন আগে থেকে জানত কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এবং কিভাবে ঘটতে যাচ্ছে। তারা সেটা প্রতিহত করার চেষ্টাও করেছিল। টাইরন পাওয়ার্স নামে সংস্থার একজন সাবেক স্পেশাল এজেন্ট বলেন, 'একেক সময় সিদ্ধান্ত প্রণেতারা জেনেশুনেও ক্ষতি স্বীকার করে নেন আসন্ন বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে।'

দ্য নিউ আমেরিকান-এ ছাপা হওয়া উইলিয়াম নর্ম্যান গ্রিগের ইন্টারভিউতে দেখা গেছে যে, অন্য এক এফবিআই এজেন্ট বলেছেন 'আমরা চোখে যা-ই দেখে থাকি না কেন, আমার ধারণা ভেতরে তারচেয়েও অনেক বড় কিছু ছিল... অবশ্যই। বোধহয় কোনো এজেন্ডা পূরণের খাতিরে এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে বাধা দেয়া হয়নি।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

৯/১১ ঘটতে দেয়ার কারণ ছিল?

আমেরিকান সরকার আফগানিস্তান ও ইরাকে নিজেদের যে যুদ্ধে জড়িয়েছে, সেটাকে চিত্রিত করা হয়েছে 'ওয়ার অন টেররিজম' বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নামে। আরেক অর্থে এটাকে ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার জবাব বলে হালাল করার চেষ্টা হয়েছে আমেরিকার তরফ থেকে। কিন্তু অফিশিয়াল ব্যাখ্যার সমালোচকরা বলছেন, এসব যুদ্ধ অনেক আগে থেকেই বুশ প্রশাসনের এজেন্ডায় ছিল। তাদের দাবি, এ যুদ্ধ আরও বৃহত্তর এজেন্ডার একটা অংশ মাত্র।

আফগানিস্তানে হামলা পরিকল্পনা ৯/১১-এর আগের

আফগানিস্তানের ব্যাপারে নাফিজ মোসাদ্দেক আহমেদ বিভিন্ন সূত্র থেকে যে সমস্ত খবর সংগ্রহ করেছেন, তাতে বিষয়টা পরিষ্কার যে আমেরিকার নীতি আগে থেকেই তালেবানদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল এবং তারা সে দেশে সামরিক অভিযান চালানোর জন্য ৯/১১-এর অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিল। নাফিজ আর থম্পসন জানিয়েছেন, এর পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে, সেন্টগ্যাস (CentGas; বা Central Asia Gas Pipeline) নামের কয়েকটি তেল কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত বিশাল এক কনসোর্টিয়ামকে সুবিধা করে দেয়া।

সউদি আরবের ডেল্টা অয়েল সেই কনসোর্টিয়ামের অন্যতম অংশীদার। আর আমেরিকার অয়েল জায়ান্ট ইউনোকাল (Unocal) হচ্ছে কনসোর্টিয়ামের মাথা। ইউনোকালকে তুর্কমেনিস্তানের বিশাল প্রাকৃতিক ভাণ্ডারের তেল-গ্যাস আরব সাগর পর্যন্ত নিয়ে যেতে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ পাইপ লাইন বসানোর সুবিধা করে দিতে এই হামলা চালানো হয়েছে।

২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে; ৯/১১-এর ঠিক এক বছর আগে আমেরিকান সরকারের ছাপানো এক এনার্জি ইনফর্মেশন ফ্যাক্ট শিটে বলা হয় এনার্জি স্ট্যান্ডপয়েন্ট থেকে আফগানিস্তান তার ভৌগলিক অবস্থানের জন্য সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে রফতানি

BanglaBook.org

করা তেল ও গ্যাস আরব সাগর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য ট্রানজিট রুট হতে পারে। দেশটির ভেতর দিয়ে পাইপ লাইন নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবিত মাল্টি বিলিয়ন ডলার প্রকল্পটিও এই সম্ভাবনার অন্তর্ভুক্ত। ওয়াশিংটন আর ইউনোকালের আশা ছিল, আফগানিস্তানের তালেবান সরকার প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারবে। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত হয়নি।

অতীতের নথিপত্র ঘেঁটে নাফিজ আহমেদ আর থম্পসন দাবি করছেন, তালেবান আসলে সিআইএ-র সৃষ্টি। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই (ISI বা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স) এবং সউদি আরবের আর্থিক সহায়তায় এ কাজটি করেছিল সিআইএ। আহমেদ রশিদের বিখ্যাত বই *তালিবান*-এ এই পাইপ লাইনের সমর্থনে বলা আছে তৎকালীন উদীয়মান তালেবানদের নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি দেখে আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিল। তাই ভবিষ্যতের পাইপ লাইনের আশায় পাকিস্তানের সহায়তা নিয়ে তালেবানদেরকে প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র দিয়েছিল তারা। সউদি আরব দিয়েছিল আর্থিক সমর্থন। সবার মিলিত সহযোগিতা নিয়ে তালেবানরা ১৯৯৬ সালে কাবুল দখল করে।

সে সময় ইউনোকাল স্বভাবতই আশাবাদী ছিল পাইপ লাইন বসানোর সাফল্য নিয়ে। বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এই পাইপ লাইন প্রজেক্টের ব্যাপারে তালেবান ও ইউনোকালের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল কাবুলের পতনের অনেক আগেই। ইউনোকাল যথেষ্ট আর্থিক সহায়তাও করে তালেবানকে। কিন্তু তারা ইউনোকালের পরিবর্তে আইএসআই-এর স্বার্থেই বেশি কাজ করে যেতে থাকে বলে দাবি করা হয়। এ দাবির সমর্থনে থম্পসন জানান, ১৯৯৮ সালে তালেবান বাহিনী যখন উত্তর আফগানিস্তানের বড় শহর মাজার-ই-শরিফ দখল করতে যাচ্ছে, তখন আইএসআই-এর এক অফিসার মেসেজ পাঠিয়েছিলেন 'মাই বয়েজ অ্যান্ড আই আর রাইডিং ইনটু মাজার-ই-শরিফ (আমি ছেলেদের নিয়ে মাজার-ই-শরিফে ঢুকে পড়তে যাচ্ছি)।'

যা হোক, তালেবান বাহিনী মাজার-ই-শরিফ দখল করার পর প্রস্তাবিত পাইপ লাইন রুটসহ দেশের বেশিরভাগই তাদের দখলে চলে যায়। অতএব সেন্টগ্যাস ঘোষণা করে সে 'এগিয়ে যেতে প্রস্তুত।' কিন্তু বছরের শেষ নাগাদ ইউনোকালের সন্দেহ হয় দেশে প্রয়োজনীয় স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারবে না তালেবান। তাই ওয়াশিংটন সেন্টগ্যাসকে প্রত্যাহার করে নেয়। তখন থেকে, বলেন নাফিজ আহমেদ, তালেবান সরকারের ওপর থেকে মন উঠে যেতে শুরু করে আমেরিকার। সে দেশে নিজেদের আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্ব নিরাপদ করার সম্ভাব্য উপায় খুঁজতে থাকে তারা। একই সময় 'অ-সামরিক সমঝোতার' উপায় বের করার জন্য তালেবান সরকারের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে থাকে আমেরিকা।

২০০১ সালের জুলাই মাসে বার্লিনে বৈঠক হয় দু'পক্ষের মধ্যে। 'অ-সামরিক সমঝোতা' নিয়ে চারদিন ধরে চূড়ান্ত আলোচনা হয়। বুশ প্রশাসন তালেবানদেরকে দেশের ক্ষমতার অংশীদার করে 'জাতীয় ঐক্যের' সরকার গঠনের চেষ্টা করে। সেই বৈঠকে পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন নিয়াজ নায়েক। তিনি বলেন, একজন

BanglaBook.org

আমেরিকান মিটিঙে বলেন, 'তালেবানদের যা করা উচিত, হয় তারা তাই করবে, নইলে আমরা দ্বিতীয় অপশন, সামরিক অভিযানের দিকে যাবো।'

আরেক আমেরিকান হুমকি দেন, 'হয় আমাদের সোনার কার্পেট অফার মেনে নিন, নইলে আপনাদেরকে বোমার কার্পেটের নিচে কবর দেব আমরা।'

পরে আমেরিকান প্রতিনিধিদের একজন হুমকি দেয়ার কথা অস্বীকার করলেও আরেকজন স্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, এরকম কিছু কথা হয়েছিল সেখানে। আমেরিকান সরকার তালেবানদের প্রতি অসম্ভব বিরক্ত ছিল। তাই সামরিক অভিযানের কথা ভাবা হচ্ছিল।'

বিবিসি নিয়াজ নায়েকের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, এক সিনিয়র আমেরিকান অফিশিয়াল পরে তাঁকে বলেন, অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করা হবে। 'আফগানিস্তানে বরফ পড়া শুরু হওয়ার আগে।' অক্টোবরের ৭ তারিখ থেকে বোমা বর্ষণ শুরু হয় সেখানে। এ নিয়ে থম্পসন প্রশ্ন করেন 'এটা কি দৈব-সংযোগ যে সময়মতোই আফগানিস্তানে বোমা ফেলতে শুরু করল আমেরিকা?'

আসলে এটা যে দৈব-সংযোগ ছিল না, তার সমর্থন পাওয়া গেছে সাউথ ক্যারলাইনা ন্যাশনাল গার্ডের এক সাবেক সদস্যের কাছ থেকে। তিনি বলেন 'আমার ইউনিট ২০০১ সালের জুলাই মাসে ড্রিল করার জন্য রিপোর্ট করে। কিন্তু হঠাৎ করে, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদেরকে জানানো হয় ১৪ সেপ্টেম্বরের নির্ধারিত মবিলাইজেশন এক্সারসাইজের প্রস্তুতি পরের দু' মাসের জন্য বাতিল করা হয়েছে। দুই সপ্তাহ ধরে অনেক খেটেছি আমরা। সময়ের আগেই এক্সারসাইজ করতে এসেছি। আগস্টের শেষদিকে একটা টেলিফোন কলের অপেক্ষায় ছিলাম। ফোন এলেই ব্যাগ, যন্ত্রপাতি নিয়ে কনভয়ে উঠে পড়ব।'

নিয়াজ নায়েকও মনে করেন না এসব শুধুই দৈব-সংযোগ। তিনি বিবিসিকে বলেন, 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পরই আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে আমেরিকা এসবের পরিকল্পনা আগেই করে রেখেছিল। এবং পরিকল্পনার বাদবাকি অংশ দু'-তিন সপ্তাহের মধ্যে সেরে ফেলবে।' তালেবানরা যদি বিন লাদেনকে আত্মসমর্পণে বাধ্যও করত, তবু আমেরিকা তার পরিকল্পনা কার্যকর করা থেকে পিছু হটত কি না সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কারণ আমেরিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল তালেবান সরকারকে উৎখাত করে নিজেদের পছন্দমতো আর কোনো সরকারকে ক্ষমতায় বসানো। এটা ছিল ওয়াশিংটনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য।

নাফিজ আহমেদ আর থম্পসনের মতে তার সাথে আরও ছিল পাইপ লাইন বসানোর কাজ অনুমোদন করানোর বিষয়টা। এ নিয়ে এক ইসরাইলের বহুল প্রচারিত দৈনিক, *মা'রিভ*-এ এক লেখকের মন্তব্য উদ্ধৃত করে *শিকাগো ট্রিবিউন* লেখে আমেরিকা এশিয়া অঞ্চলে যে সমস্ত নতুন সামরিক ঘাঁটি বসিয়েছে, ম্যাপে সেগুলোর অবস্থানের ওপর চোখ বোলালে একটা বিস্ময়কর সত্য চোখে পড়বে। তুর্কমেনিস্তান থেকে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান হয়ে ইনডিয়ান ওশান পর্যন্ত তাদের তেল-গ্যাস

BanglaBook.org

সাপ্লাইয়ের প্রস্তাবিত পাইপ লাইন রুট, সেটা ঘেঁষে গেছে সেগুলো... আমি যদি ষড়যন্ত্র থিয়োরির বিশ্বাসী হতাম, তাহলে ভাবতাম বিন লাদেন মোটেই আমেরিকার শত্রু নয়, বরং এজেন্ট।

পল থম্পসন ও নাফিজ আহমেদ জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রি হামিদ কারজাই এবং সে দেশে প্রেসিডেন্ট বুশের বিশেষ দূত, জালামি খলিলজাদ, দু'জনই এক সময় ইউনোকালের নিয়মিত মাসিক ভাতা পেতেন। এদের নিয়োগই প্রমাণ করে, আফগানিস্তানে প্রেসিডেন্ট বুশের সামরিক অভিযানের পিছনের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল।

এরপর ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর, ৯/১১-এর মাত্র এক মাস পর আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট পাকিস্তানের তেল মন্ত্রিকে জানায় 'বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ইউনোকাল তার পাইপ লাইন প্রজেক্ট নিয়ে এগিয়ে যেতে আগ্রহী।

অতএব ৯/১১ যে আফগানিস্তানে হামলা চালানোর 'ট্রিগার' ছিল, তা এখন দিনের আলোর মত পরিষ্কার।

ইরাকে হামলার পূর্ব পরিকল্পনা

২০০২ সালের মার্চ মাসের শুরুর দিকে প্রেসিডেন্ট বুশ মন্তব্য করেন, তিনি ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নন। 'আমি বরং ইরাকের ব্যাপারে গভীর দুশ্চিন্তায় আছি।' বলেন তিনি।

কিন্তু ব্রিটিশ স্বাধীন গবেষক নাফিজ আহমেদ আর থম্পসন বলেন, বুশ যে তখনই ইরাক নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন, তেমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই। তিনি ইরাক নিয়ে অনেক আগে থেকেই মাথা ঘামাচ্ছেন। আফগানিস্তানে যেমন সু-পরিকল্পিত যুদ্ধ শুরু করেছেন, ইরাকের জন্যও সেইরকম এক যুদ্ধের পরিকল্পনা তখন তাঁর মাথায় গিজগিজ করছিল এবং সেটা ৯/১১-এর আগে থেকেই।

এই দাবির পক্ষে কিছুটা সমর্থন পাওয়া গেছে *রিবিল্ডিং আমেরিকা'স ডিফেন্স স্ট্রাটেজি, ফোর্সেস, অ্যান্ড রিসোর্সেস ফর এ নিউ সেঞ্চুরি* শিরোনামের ডকুমেন্টে যেটার কথা আমি এ বইয়ের পরিচিতিতে একটুখানি বলেছি। সেই ডকুমেন্ট ২০০০ সালে প্রকাশ করে প্রজেক্ট ফর দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি (PNCA) নামের একটা নিও-কনজারভেটিভ থিংক ট্যাংক। যাদের নিয়ে এই থিংক ট্যাংক গঠিত হয়, তারা হলেন ডিক চেইনি, ডোনাল্ড রামসফেল্ড, পল ওলফোউইৎজ (রামসফেল্ডের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট ডেপুটি) এবং লুইস 'স্কুটার' লিবি (ডিক চেইনির চিফ অব স্টাফ)। এঁরা সবাই পরে বুশ প্রশাসনের ইনসাইডার হয়ে ওঠেন।

এরা এক সময় দাবি করতেন ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ করা হয়েছিল সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতা থেকে সরাতে। কথাটা কতখানি সত্যি তা *রিবিল্ডিং আমেরিকা'স ডিফেন্স* (পল থম্পসনের উদ্ধৃতি অনুযায়ী)-এর এই অংশটুকু পড়লেই বোঝা যাবে 'আমেরিকা বহু দশক থেকে উপসাগরীয় এলাকার আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আরও

BanglaBook.org

বড় ভূমিকা পালন করার উপায় খুঁজছে। ইরাকের সাথে অমীমাংসিত সংঘাত সেখানে আমেরিকান সৈন্য মোতায়েনের সুযোগ এনে দিয়েছে, সাদ্দাম হোসেনের সরকারের বাড়াবাড়ি মোকাবেলায় গালফ অঞ্চলে পর্যাপ্ত আমেরিকান সৈন্য... ।'

এসবের অন্তর্নিহিত অর্থ কারও বুঝতে সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। এডওয়ার্ড হেরম্যান এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেন 'বুশ প্রশাসনের বাঘা বাঘা মেম্বাররা সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করার ঘোষণা ২০০০ সালেই দিয়ে রেখেছিলেন।'

এই দলটি ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে একই আবেদন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের কাছেও লিখিতভাবে পেশ করেছিলেন। 'সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতা থেকে হটানোর একটা কৌশল খোঁজার' অনুরোধ করে লেখা সেই চিঠিতে অন্যান্যের মধ্যে স্বাক্ষর করেছিলেন ডোনাল্ড রামসফেল্ড, পল ওলফোউইৎজ ও রিচার্ড পার্লে। তাতে বলা হয়, 'উপসাগরীয় অঞ্চলে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রক্ষায় সামরিকসহ প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদেরকে,' এবং 'আমেরিকান পলিসি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মত না হলেই অথর্ব হয়ে বসে থাকবে, এমনটা কিছুতেই হতে দেয়া উচিত না।'

৯/১১ কে কেন্দ্র করে ইরাকে আক্রমণের পিছনে 'কারণ' যতটা না ছিল, তারচেয়ে হাজারগুণ বেশি ছিল অজুহাত। থম্পসন বলেন, সেদিন পেন্টাগনে 'হামলার' কয়েক ঘণ্টা আগে ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফেল্ড একটা মেমো লিখেছিলেন। সেটায় তিনি বলেন Judge whether good enough hit S. H. [Saddam Hussein] at the same time. Not only UBL [Usama Bin Laden]. Go massive. Sweep it all. Things related and not.

ভেবে দেখুন একই সাথে এস. এইচ [সাদ্দাম হোসেন]-এর ওপরেও হামলা করলে ভালো হয় কি না। কেবল ওসামা বিন লাদেন নয়। ব্যাপক লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যান। সব ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিন। বিষয় সংশ্লিষ্ট হোক না হোক।

থম্পসন এর সাথে বব উডওয়ার্ডের একটা রিপোর্টও জুড়ে দিয়েছেন জন পিলজারের সহায়তায়। উডওয়ার্ড সেই রিপোর্টে বলেছিলেন, ৯/১১-এর পরদিন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিঙে রামসফেল্ড বলেন, আমেরিকার 'ওয়ার অন টেরর'-এর প্রথম রাউন্ডে সাদ্দাম হোসেনের ইরাকে আক্রমণ চালানো হবে।'

এর জবাবে সরকারী ব্যাখ্যার সমালোচকরা বলেন, যুদ্ধ চলার সময় এবং পরে এইসব বিবৃতি আর কাজ, দুটোতেই পরিষ্কার বোঝা যায় তারা যে উদ্দেশ্যের কথা বলে যুদ্ধ শুরু করেছে, সেটা ভুয়া ছিল। তাদের আসল লক্ষ্য ছিল আঞ্চলিক সর্দারী আর তেল সম্পদ কুক্ষিগত করা।

অন্যদিকে ইরাক আক্রমণের আগে এবং পরে জর্জ বুশ আর টনি ব্লেয়ার প্রশাসন অনবরত দাবি করে গেছেন, তাদের সামরিক অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ইরাকের তৈরি ব্যাপক বিধ্বংসী (মাস ডেস্ট্রাকশন) অস্ত্র উদ্ধার করা। সেসবের কারণে সাদ্দাম হোসেন নাকি প্রতিবেশী দেশগুলো ছাড়াও এমনকি ইংল্যান্ড আর আমেরিকার জন্যও বিরাট হুমকি হয়ে উঠেছেন। এ দাবির সমর্থনে আমেরিকান ও ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স

BanglaBook.org

এজেন্সিগুলো ক্রমাগত যে সমস্ত রিপোর্ট ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে, সেগুলো ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভুয়া।

ব্লেয়ার সরকারকে ইকোলজিক্যাল বা পরিবেশদূষণ বিষয়ে পরামর্শদানকারী সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট কমিশনের প্রধান, জোনাথন পোরিট প্রকাশ্যে বলেছেন, ইংল্যান্ডের জন্য ইরাকের তেল ক্ষেত্রে হাত দেয়ার সুযোগ পাওয়াটা ছিল 'এ ভেরি লার্জ ফ্যাক্টর' বা বিশাল ব্যাপার। 'ইরাক যদি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল রিজার্ভের দেশ না হতো, তাহলে আমি মনে করি না এ যুদ্ধ কখনও হতো।' প্রেসিডেন্ট বুশের সাবেক ট্রেজারি সেক্রেটারি পল ও'নিল বলেছেন, 'বুশ প্রশাসনের শুরু থেকেই লক্ষ্য ছিল তেলের জন্য ইরাক আক্রমণ করা।'

তেলের ব্যাপারটাকেই গুরুত্ব দেয়া হয় সবচেয়ে বেশি। স্টিফেন গোয়ানস জানান, পেন্টাগনের এজেন্ডার মূলে ছিল বাগদাদে জ্যাকবুট মার্চ শুরু হওয়ার সাথে সাথে দক্ষিণ ইরাকের সবক'টা তেল ক্ষেত্র দখল করে নিতে হবে। সেই অনুযায়ীই কাজ হয়। যখনই বাগদাদে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেল, অমনি আমেরিকান বাহিনী আগে থেকে প্রস্তুত রাখা লুটপাটকারী আর অগ্নিসংযোগকারীদের সাহায্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয় মিনিস্ট্রি অব প্ল্যানিং, মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন, মিনিস্ট্রি অব ইরিগেশন, মিনিস্ট্রি অব ট্রেড, মিনিস্ট্রি অব ইন্ডাস্ট্রি, মিনিস্ট্রি অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স, মিনিস্ট্রি অব কালচার এবং মিনিস্ট্রি অব ইনফর্মেশনে... কিন্তু মিনিস্ট্রি অব অয়েলে ছিল সুনসান নীরবতা। সেটার আর্কাইভসে দেশটির তেল সম্পদের ফাইল থরে থরে সংরক্ষিত আছে যেগুলো স্পর্শ করার জন্য ওয়াশিংটনের হাত চুলকাচ্ছিল। একদম শান্ত ছিল সেটা। কারণ সারি সারি আমেরিকান ট্যাংক ও আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (armoured personnel carrier) দিয়ে ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল সেটাকে।

প্রকাশ্যে যে লক্ষ্যের কথা বলে ইরাকে হামলা চালানো হয়, তা যে সত্যি ছিল না তা আজ সারা পৃথিবী জানে। তার সাথে এটাও শুরুতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বুশ প্রশাসনের ৯/১১ পরবর্তী 'ওয়ার অন টেররিজম' ছিল ইরাকসহ আরও কিছু দেশের তেলের ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করার একটা অজুহাত মাত্র। এর উদাহরণ হিসেবে *নিউজউইক*-এর একটা রিপোর্টের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে বলা হয়, ইরাক আক্রমণ করার আগে বুশ প্রশাসনের অ্যাডভাইজরদের কেউ কেউ সউদি আরব, ইরান, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া এবং ইজিপ্টে হামলা চালানোর পরামর্শও দিয়েছিল। এক সিনিয়র ব্রিটিশ অফিশিয়াল এই সূত্রে বলেন 'সবাই বাগদাদে যেতে চাইছিল, কিন্তু 'রিয়েল মেনরা' চাইছিলেন তেহরানে যেতে।'

এই 'রিয়েল মেনদের' একজন ছিলেন রিচার্ড পার্লে। প্রজেক্ট ফর দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। জানা গেছে, আমেরিকার 'ওয়ার অন টেররিজম'-কে তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন 'এটা সার্বিক যুদ্ধ। আমরা বিভিন্ন ধরনের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছি। তাদের মধ্যে অনেকেই আছে। সব কথার সার কথা হলো আমরা প্রথমে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, তারপর করব ইরাকে... আমরা যদি পৃথিবী সম্পর্কে নিজেদের ভিশনকে এগিয়ে যেতে দিই, এবং...একটা সার্বিক যুদ্ধে

BanglaBook.org

জড়িয়ে যাই, তাহলে আমাদের সন্তানরা আগামীতে আমাদের স্মরণে বীরগাঁথা গাইবে।'

এখন এ ধারণা দিন দিন স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে, ইউনাইটেড স্টেটস যে ধরনের 'ওয়ার অন টেররিজম' শুরু করেছে, তাতে 'টেররিজম' শব্দটা ব্যবহার করা হয় বাছাই করা ক্ষেত্রে এবং পুরোপুরি নিজেদের স্বার্থে। এ বিষয়ে থিয়েরি মেইসান বলেন, 'আমেরিকান নেতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ করাই টেররিজম, বুশ হয়তো এমন কোনো সংজ্ঞা তৈরি করেছেন শব্দটার। রিচার্ড ফকের দৃষ্টিতে তা এভাবে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে 'আমেরিকান বৈশ্বিক স্বার্থের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে, এমন প্রতিটা নন-স্টেট রেভোলিউশনারি শক্তির বিরুদ্ধেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে দেশটি।'

আমেরিকা যা করতে চাইছে, রিচার্ড ফকের ভাষায় তা হলো 'ওয়ার অন গ্লোবাল টেররের ধুয়া তুলে তার আড়ালে একটা সাম্রাজ্য-নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে আমেরিকা।'

ফিলিস বেনিসও এ ব্যাপারে একমত। তিনি বলেন: 'ওয়ার অন টেরর কাউকে ন্যায়বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানোর জন্য আরম্ভ করা হয়নি। এটা করা হয়েছে দিক-বিদিক জয় করতে এবং আমরিকার ক্ষমতাকে পৃথিবীময় মাশরুমের মত ছড়িয়ে দিতে—ন্যায় যুদ্ধের ছদ্মাবরণে।'

চমস্কোভস্কি, রাহুল মহাজনসহ আরও অসংখ্য সমালোচকও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এখন সারা বিশ্ব জানে, জর্জ বুশ আর টনি ব্লেয়ারের প্রশাসন ইরাক আক্রমণের কারণ হিসেবে যা বলেছে তা ডাহা মিথ্যা। আমেরিকা ৯/১১ প্রশ্নেও মিথ্যে বলেছে কি না, আফগানিস্তান আর ইরাকে হামলা চালানো ছাড়া এসবের পিছনে ওয়াশিংটনের আরও বৃহত্তর কোনো এজেন্ডা রয়েছে কি না, সে আলোচনার সময় এখনও আসেনি।

নতুন পার্ল হারবার ঘটলে ভালো হয়

বৃহত্তর এজেন্ডা সম্পর্কে আমেরিকার সাবেক ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর জিগনিউ ব্রেজেজিনস্কির ১৯৯৭ সালে লেখা বই; *দ্য গ্র্যান্ড চেজবোর্ড আমেরিকান প্রাইমেসি অ্যান্ড ইটস জিওস্ট্রাটেজিক ইমপারেটিভস*-এর রেফারেন্স টেনেছেন নাফিজ আহমেদ ও থম্পসন। ব্রেজেজিনস্কি বলেছিলেন, ইওরেশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল যার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তেল সম্পদে ভরপুর সেন্ট্রাল এশিয়া যার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, বিশ্বের মোড়লগিরির চাবিকাঠিও তার হাতে থাকবে।

আহমেদ ও থম্পসনের মতে ব্রেজেজিনস্কির অনুমানই ঠিক। 'আমেরিকান প্রাইমেসি' বজায় রাখার জন্যই এসব করা হচ্ছে। কাজটা সোজা পথে করতে হলে আইন অনুযায়ী দেশবাসীর কনসেনসাস বা ঐক্যমতের প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু সেটা তাদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয় কারণ 'আমেরিকা দেশের বাইরে যতই জোর যার মুলুক তার নীতি অবলম্বন করুক না কেন, দেশের ভেতরে অত্যন্ত গণতান্ত্রিক।' তাই দেশের বাইরে সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের, বিশেষ করে প্রয়োগের মাত্রার বেলায়

BanglaBook.org

দেশটির অনেক সীমাবদ্ধতা আছে।

বিষয়টাকে ব্রেজেজিনস্কি এভাবে ব্যাখ্যা করেন অকস্মাৎ হুমকি মোকাবেলা করা বা দেশের ভেতরের ভালো-মন্দ দেখাশোনা করা ছাড়া বহির্বিশ্বে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা তাড়া করে বেড়ানো আর প্রভাব বলয়ের প্রসার ঘটানোকে সাধারণ মানুষ স্বাগত জানায় না। তাই এসব ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে একমত করানো কঠিন। তবে 'বাইরের কোনো অপশক্তির বড় ধরনের হুমকি মোকাবেলার ক্ষেত্রে' সে সমস্যা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ব্রেজেজিনস্কি বলেন, 'দেশের বাইরে অযথা শক্তি দেখানোর ব্যাপারে আমেরিকানদের আপত্তি থাকলেও তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার যোগ দেয়াকে স্বাগত জানিয়েছিল। কারণটা ছিল পার্ল হারবারে জাপানি বিমান হামলার ভয়াবহতা।'

নাফিজ আহমেদ বলেন দেশের একজন সাবেক ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজরের লেখা এ ধরনের বই ভিন্ন মর্যাদার অধিকারী। এটাকে অন্যসব বইয়ের মতো দেখলে চলবে না। ১৯৯৭ সালে তিনি সেই বইতে লিখেছেন 'বাইরের কোনো অপশক্তির বড় ধরনের হুমকি মোকাবেলা করতে হলে আরেকটা পার্ল হারবার ধরনের ঘটনার প্রয়োজন পড়বে।'

এটা সম্ভবত কোনো দৈব-সংযোগ নয় যে জিগনিউ ব্রেজেজিনস্কি এ ধরনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করার তিন বছর পর *প্রজেক্ট ফর দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি*-এর একটা প্যাসেজেও সেটার কথা আবার ছাপা হয়। যদিও আগে এই প্যাসেজের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, তবু এখানে বিষয়টাকে গুরুত্ব দেয়া জরুরি কারণ সেটাতে *রেভোলিউশন ইন মিলিটারি অ্যাফেয়ার্স* শেষ করার আহবানও জানানো হয়েছে। যার মাধ্যমে *Pax Americana* বা American Peace আরও কার্যকরভাবে বহাল করা যেতে পারে।

তবে দুর্ভাগ্য যে, এই ডকুমেন্টের লেখকের মতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আসবে বেশ ধীরগতিতে। 'কিছু আকস্মিক বিপর্যয় বা পরিবর্তন সাধনে সহায়ক পরিবেশ-পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে – যেমন নতুন পার্ল হারবার ধরনের কিছু একটা না ঘটলে তা সম্ভব হবে না।

৯/১১-এর হামলা প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক, জন পিলজার লেখেন 'এই হামলা নতুন পার্ল হারবার ঘটিয়ে দিল।' আমেরিকার কর্তৃত্বের ক্ষেত্র বাড়াতে এটা কতখানি সাহায্য করবে, এখন তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

BanglaBook.org

ভিশন টুয়েন্টি টুয়েন্টি

রেভোলিউশন ইন মিলিটারি অ্যাফেয়ার্স প্রোগ্রামের সার কথা হচ্ছে আরও ব্যাপক অস্ত্র সজ্জিত হওয়া এবং শুধু মাটিতে আর সাগরে নয়, মহাশূন্যেও রাজত্ব করা। ব্রেজেজিনস্কি আর *প্রজেক্ট ফর দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি*, উভয় তরফ থেকেই বলা হয়, এই প্রোগ্রাম সফল করতে হলে 'প্রতিরক্ষা' ব্যয় অকল্পনীয় পরিমাণে বাড়াতে হবে।

এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যে ডকুমেন্টে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটার নাম 'ভিশন ফর টুয়েন্টি টুয়েন্টি।'

যেটা শুরু হয়েছে এভাবে ইউএস স্পেস কমান্ড—ডোমিনেটিং দ্য স্পেস ডাইমেনশন অব মিলিটারি অপারেশনস টু প্রোটেক্ট ইউএস ইন্টারেস্টস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস। অর্থাৎ, আমেরিকাকে সুরক্ষা করা নয়, বরং বহির্বিশ্বে আমেরিকার বিনিয়োগ সুরক্ষা করা। বর্তমানের সময়ে স্পেস নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব তুলনা করতে গিয়ে এই ভিশন বলেছে, অতীতে 'নৌ-বহিনী সৃষ্টি করা হতো নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থের সুরক্ষা ও প্রসারণ ঘটাতে।'

কিন্তু এটা সেরকম কিছু হবে না। এই 'রেভোলিউশন' হচ্ছে মহাশূন্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ও সারা বিশ্বে আমেরিকান এলিট শ্রেণীর বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করার একটা বিশেষ প্রোগ্রাম। এটা বাস্তবায়ন করার প্রাথমিক পর্যায়েই আমেরিকান করদাতাদেরকে সরকারের ফান্ডে ১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি জোগান দিতে হবে।

'ভিশন ফর টুয়েন্টি টুয়েন্টি' ডকুমেন্টে গণতন্ত্রে উত্তরণ বা মানবতার সেবা করার জন্য মহাশূন্যে আমেরিকার কর্তৃত্ব করা প্রয়োজন, এমন ধরনের গতানুগতিক কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তাতে খোলামেলাভাবেই বলা হয়েছে 'দ্য গ্লোবালাইজেশন অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইকনমি... উইল কন্টিনিউ উইথ এ ওয়াইডেনিং বিটুইন 'হ্যাভস' অ্যান্ড 'হ্যাভ-নটস', বা সোজা কথায় অর্থনীতিকে সর্বব্যাপী করতে গেলে... হ্যাভস ও হ্যাভ-নটসদের (ধনী-নির্ধনের) মাঝের ব্যবধান আরও বাড়তে থাকবে।

'বিশ্ব অর্থনীতির ওপর আমেরিকার কর্তৃত্ব যত বাড়তে থাকবে, ততই গরীব আরও গরীব হবে এবং ধনী আরও ধনী হবে। এবং এর ফলে বিশ্বের সর্বত্র গরীবদের কাছে আমেরিকা দিন দিন ঘৃণিত হয়ে উঠতে থাকবে। তাই তাদেরকেও সন্তুষ্ট রাখতে হবে। এটা আমরা করতে পারি এই প্রোগ্রামের আসল লক্ষ্য "গ্লোবাল ব্যাটলস্পেস ডোমিনেন্স"-এর পক্ষের যুক্তি দেখিয়ে (কিছু মানুষ এই টার্মকে খুব বেশি সুনির্দিষ্ট ভাবতে শুরু করেছে। তার বদলে রাহুল মহাজনের 'ফুল স্পেকট্রাম ডোমিনেন্স' বা পূর্ণ বিস্তৃত কর্তৃত্ব কথাটা তাদের পছন্দ)।

এই টার্মে কেবল মাটিতে, সমুদ্রে, আর আকাশে কর্তৃত্ব করাই বোঝায় না, মহাশূন্যকে নিয়ন্ত্রণ করাও বোঝায়। ইউএস মিলিটারি আরও আগে থেকেই এটা করে আসছে। এ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে রিচার্ড ফক বলেছেন 'বিশ্বে কর্তৃত্ব করার সাথে সাম্রাজ্য নির্মাণের বাসনায় মহাশূন্যকেও অস্ত্রসজ্জিত করার যে প্রকল্প নেয়া হয়েছে, তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী এই দেশটির জিওপলিটিক্যাল লালসার খুব খারাপ, নজিরবিহীন এক প্রদর্শনী। খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই আমেরিকার এ প্রকল্প থেকে সরে আসা উচিত।'

তবে এই প্রোগ্রামের কেবল একটা প্রতিরক্ষামূলক দিক অনেক আগে থেকেই মানুষের মনে আগ্রহের সৃষ্টি করে রেখেছে। প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের প্রশাসনের সময় সেটার নাম ছিল *স্ট্রাটেজিক ডিফেন্সিভ ইনিশিয়েটিভ*। বর্তমান নাম *মিসাইল*

BanglaBook.org

ডিফেন্স শিল্ড। এই ধরনের সরলসোজা নাম শুনে মনে হতে পারে আমেরিকার উদ্দেশ্য বুঝি খাঁটি আত্মরক্ষামূলক। বাইরের হামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এ পদক্ষেপ নিয়েছে দেশটি।

কিন্তু আসলে বিষয়টা ভিন্ন। এই তথাকথিত শিল্ড হচ্ছে তাদের থ্রি-পার্ট প্রোগ্রাম বা তিন অংশের প্রোগ্রামের একটামাত্র অংশ। আরেক পার্টের কাজ হচ্ছে মহাশূন্যে সার্ভেইল্যান্স টেকনোলজি বা নজরদারির যন্ত্রপাতি সেট করা। যার সাহায্যে প্ল্যানেটের প্রতিটা অংশকে এমনভাবে মুঠোয় নিয়ে আসা সম্ভব যাতে আমেরিকার প্রতিটা শত্রুকে শনাক্ত করা যায়। এ অংশের কাজ এরমধ্যেই অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

প্রোগ্রামের তৃতীয় অংশের অনানুষ্ঠানিক নাম হচ্ছে *স্টার ওয়ারস*। এটা মহাশূন্যে সত্যিকারের অস্ত্র সেট করার কাজ করছে। বিশেষ করে লেজার কামান বসানোর কাজ। এগুলোর ভয়ের কারণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রচুর। এক লেখকের মতে, এই কামান ক্রুজ মিসাইলকে পটকা-বাজিতে পরিণত করবে। কোনো বৈরী দেশ মহাশূন্যে মিলিটারি স্যাটেলাইট পাঠাতে চেষ্টা করলে আমেরিকা সেগুলোকেও ধ্বংস করে দিতে পারবে। এবং বিষয়টা আমেরিকা এরমধ্যে ঘোষণাও করেছে যে, ভবিষ্যতে সে কাউকে মহাশূন্য ব্যবহার করতে দেবে না।

'ইউএস স্পেস কমান্ড এভাবে চিরস্থায়ী এবং সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করতে পারবে মহাশূন্যে। কমান্ডের এই আগ্রাসী উদ্দেশ্যের কথা একটা লোগোতেও ব্যবহার করা হয়েছে। সেটা এরকম In Your Face from Outer Space.

কেবল এই একটা ডকুমেন্টেই এরকম আগ্রাসী লক্ষ্যের কথা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেনি তারা। রাহুল মহাজন জানিয়েছেন, প্রজেক্ট ফর দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরির ডকুমেন্টে এমন 'উল্লেখযোগ্য স্বীকারোক্তিও' তারা করেছে। সেসবের মূল কথা হচ্ছে যদিও *মিসাইল ডিফেন্স শিল্ড* নামটা পড়ে মনে হতে পারে এটার সৃষ্টি হয়েছে আমেরিকাকে বাইরের শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষা করতে। আসলে তা নয়। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমেরিকা যদি কাউকে আক্রমণ করে, তারা যেন সেটা ঠেকাতে না পারে, সেই জন্য।

এই স্বীকারোক্তিতে আরও বোঝা যায় যে, ইরান, ইরাক আর উত্তর কোরিয়া; প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ শেষের দিকে এই তিনটি দেশকে 'এক্সিস অব এভিল' আখ্যা দিতে চেয়েছিলেন, কারণ তারা আমেরিকার নেয়া পদক্ষেপের বিরুদ্ধে নিজেদের সামরিক বাহিনী দিয়ে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। ২০০২ সালে বুশ প্রশাসনের ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্রাটেজির *রিবিল্ডিং আমেরিকা'স ডিফেন্সেস*-এ বলা হয়েছে, 'আওয়ার বেস্ট ডিফেন্স ইজ এ গুড অফেন্স।' এই অফেন্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন উপাদান হবে *ফুল স্পেকট্রাম ডোমিনেন্স*। এটা হবে আমেরিকার সেনা, বিমান ও নৌ-বাহিনীর সাথে পুরোদস্তুর স্পেস-ফোর্সের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী।

ডোনাল্ড রামসফেল্ড ২০০১ সালের জানুয়ারিতে সেক্রেটারি অব ডিফেন্স পদের দায়িত্ব নেন। তার আগে কমিশন টু অ্যাসেস ইউএস ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্পেস

BanglaBook.org

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। অনানুষ্ঠানিকভাবে সেটা পরিচিত ছিল 'রামসফেল্ড কমিশন' নামে। এই কমিশন জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। সে কমিশনের লক্ষ্য ছিল 'ইউএস ফোর্স এবং অন্যান্য মিলিটারি শক্তির মধ্যকার বিভাজন আরও বৃদ্ধি করা।'

১৯৭২ সালের এবিএম চুক্তি বাতিল করার পক্ষে ওকালতিসহ এই রিপোর্টে আরও অনেক পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয় (বুশ প্রশাসন রামসফেল্ডের এবিএম চুক্তি বাতিল করার সুপারিশ খুব দ্রুত গ্রহণ করেছিল)। যেমন, সকল আর্মড ফোর্স ও ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোকে স্পেস ফোর্সের অধীনস্থ করা ইত্যাদি। এরকম কঠিন ও অচিন্তনীয় একটা সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গেলে যে আর্মড ফোর্সেস ও ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো প্রচণ্ডরকম বাধার সৃষ্টি করবে, তা বুঝতে পেরে সেই রিপোর্টে বলা হয় : সতর্ক সংকেত অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে বাধা দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না বাইরের কোনো 'অভাবনীয়' ঘটনা রেজিস্ট্যান্ট বুরোক্র্যাসিকে অ্যাকশনে যেতে বাধ্য করেছে—এমন সমস্ত ঘটনার নজির ইতিহাসে ভুরি ভুরি আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমেরিকা উপযুক্ত দায়িত্বশীল আচরণ করবে কি না এবং অরক্ষিত অবস্থা থেকে স্পেসকে বাঁচাতে অনতিবিলম্বে এগিয়ে আসবে কি না। নাকি অতীতের মত জনগণ ও দেশকে অক্ষম করে দেয়ার আক্রমণ – *একটা স্পেস পার্ল হারবার* – জাতিকে উদ্দীপ্ত করতে এবং সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য করবে।

আমরা জানি বুশ প্রশাসনের অন্য এক প্রাণ পুরুষ 'জাতিকে উদ্দীপ্ত করতে' আরও একটা 'পার্ল হারবারের' দরকার হতে পারে বলেছিলেন। সেই রিপোর্ট প্রকাশ হয় ২০০১ সালের ১১ জানুয়ারিতে—*আমেরিকা আকাশ থেকে চালানো হামলার ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর, যখন আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি অসহায় মনে হচ্ছিল*—তার ঠিক নয় মাস আগে। রিপোর্ট প্রকাশকারী কমিশনের চেয়ারম্যান সেই হামলা এবং তার ফলাফলের উপর 'ইউএস স্পেস ভালনারেবিলিটি' তত্ত্ব সময়মতো প্রকাশ করে ভালো ফল পেয়েছিলেন।

থিয়েরি মেইসান মনে করিয়ে দেন '৯/১১-এর দিন বিকেল ৬:৪২ মিনিটে এক প্রেস কনফারেন্স হয়। সদ্য নিয়োজিত সেক্রেটারি অব ডিফেন্স, ডোনাল্ড রামসফেল্ড সেখানে লাইভ ক্যামেরার সামনে সিনেট আর্মড সার্ভিসেস কমিটির চেয়ারম্যান, ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর কার্ল লেভিনের উদ্দেশে সকালে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলা প্রসঙ্গে চোখ রাঙিয়ে বলেন 'সিনেটর লেভিন, কংগ্রেসে আপনি এবং আরও যে ক'জন ডেমোক্র্যাট আছেন, আপনারা বলতে চাইছেন পেন্টাগন দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য যে বড় ধরনের বাজেট চাইছে, বিশেষ করে মিসাইল ডিফেন্সের জন্য, তা আপনাদের জোগান দেয়ার সামর্থ্য নেই? সে জন্য আপনাদেরকে সোশ্যাল সিকিউরিটি ফান্ডে হাত দিতে হবে? এই অবস্থা কি প্রমাণ করে, দেশে এ মুহূর্তে জরুরি অবস্থা চলছে? দেশকে তার প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়াতে সোশ্যাল সিকিউরিটি ফান্ডের মধ্যে হাত ডোবাতে হবে?' (সম্প্রতি বিদায় নেয়া ক্লিনটন প্রশাসনের উঁচু পদের কয়েকজন

BanglaBook.org

কর্মকর্তা তখনও কাজ করছিলেন নতুন ক্ষমতায় আসা বুশ প্রশাসনে)।

এসব খোঁচামারা কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে, ৯/১১ রামসফেল্ডকে তার আশা অনুযায়ী *স্পেস পার্ল হারবার* নিয়ে মাঠ গরম করার বড় ধরনের একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। এবং তিনি সে সুযোগ লুফে নেয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তবে যদি বুশ প্রশাসনের হাই অফিশিয়ালরা ৯/১১-এর হামলাকারীদের পক্ষে কাজ করে থাকেন, তাহলে স্পেস কমান্ডের ব্যাপারে রামসফেল্ড একাই উৎসাহী ছিলেন, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। আরও অনেকেই উৎসাহী ছিলেন। এ প্রোগ্রামের আরেক প্রবক্তা ছিলেন সেটার তখনকার কমান্ডার, জেনারেল র‍্যালফ ই. এবারহার্ট। নোরাড-এর কমান্ডার ছিলেন তিনি। ৯/১১-এর দিন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের ইন-চার্জ।

আরও ছিলেন জেনারেল রিচার্ড মেয়ার্স, ৯/১১ সম্পর্কিত কমিটির অ্যাকটিং চেয়ারম্যান এবং দ্য জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ-এর হবু চেয়ারম্যান। তার আগে ছিলেন ইউএস স্পেস কমান্ডের প্রধান। এছাড়া অনেকের কাছে শুধু 'জেনারেল স্টারওয়ার্স' নামেও পরিচিত তিনি। 'ভিশন ফর টুয়েন্টি টুয়েন্টি' লেখার সময় প্রকল্পের ইন-চার্জ ছিলেন জেনারেল রিচার্ড মেয়ার্স।

এই তিন মহারথীই খুব সম্ভব ৯/১১-এর দিন 'স্ট্যান্ড ডাউন' অর্ডার দিয়ে এয়ার ফোর্সকে খোঁড়া করে রেখেছিলেন। তাঁদের নির্দেশে স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর রহিত করা হয়েছিল না বলে সেদিন কোনো ফাইটার স্ক্র্যাম্বল করেনি। প্রসিডিওর অনুযায়ী কোনো কাজ হয়নি।

***

এই অধ্যায়ে যে সমস্ত প্রমাণের সারাংশ নিয়ে আলোচনা করা হলো, তাতে এটা স্পষ্ট যে আফগানিস্তান ও ইরাকের ব্যাপারে নিজেদের গোপন এজেন্ডা পূরণ ও স্পেসকে অস্ত্রসজ্জিত করতে প্রয়োজনীয় বিপুল ফান্ড জোগাড়ের স্বার্থে পেন্টাগন এবং বুশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা সম্ভবত কিছু কলকাঠি নেড়েছেন। ৯/১১-এর প্ল্যানিঙে জড়িত না থাকলেও তারা বিনা বাধায় এ ঘটনা ঘটতে দিয়েছেন। এসব পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, আমাদের তৈরি অফিশিয়াল দুষ্কর্মের সাত নম্বর সম্ভাব্য ধারণা হয়তো সত্যি।

এর অর্থ একটাই, হোয়াইট হাউজ আগে থেকেই ভালো করে জানত সেদিনের এই সন্ত্রাসী হামলার কথা। যেমন জানত সে বছরের প্রথম বরফ পড়ার আগেই আফগানিস্তানে হামলা চালানো হবে। কিছু কিছু আলামত প্রমাণ করে আমাদের দুষ্কর্মের তালিকার অষ্টম সম্ভাব্য ধারণাও সত্যি, যেটায় হোয়াইট হাউজও এর পরিকল্পনায় জড়িত ছিল বলা হয়েছে।

এরমধ্যে বিভিন্নভাবে প্রমাণ হয়েছে বুশ প্রশাসনের প্রাণপুরুষদের অনেকেরই 'একটা নতুন পার্ল হারবার' ঘটবে, মনে মনে এমন আশা ছিল। কাজেই এটাও অসম্ভব

BanglaBook.org

নয় যে, তারা ৯/১১-এর পরিকল্পনায় অংশ না নিলেও এরকম কিছু একটা যে ঘটতে যাচ্ছে, তা অন্য সূত্র থেকে জানতে পেরে হামলা যাতে কোনোভাবে প্রতিহত করা না হয়, এইটুকু নিশ্চিত করেছেন।

এ পর্যন্ত আলোচিত সবকিছুর দায় একটা নতুন পার্ল হারবারের কাঁধে তুলে দেয়া গেলেও আমেরিকার নিকট অতীত আর 'চলন-বলন' সম্পর্কে যারা সামান্য জ্ঞান রাখেন, তাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না হোয়াইট হাউজ এতকিছু স্রেফ চান্সের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে ছিল, এমনটা বিশ্বাস করা যায় না।

কারণ দেশটির অতীত কর্মকাণ্ড এমন ধারণাকে সমর্থন করে না।

দৃষ্টান্তঃ অপারেশন নর্থউডস

এ পর্যন্ত আলোচিত বিষয় আর সংশ্লিষ্ট তথ্য তর্কাতীতভাবে না হলেও মোটামুটি জোরালোভাবেই প্রমাণ করে ৯/১১-এর হামলার সাথে প্রধান প্রধান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি, পেন্টাগন আর হোয়াইট হাউজ জড়িত ছিল। এসব যুক্তি কতটা জোরাল তা প্রমাণসাপেক্ষ হলেও বেশিরভাগ আমেরিকান সম্ভবত প্রথমেই মানতে চাইবেন না যে 'আমেরিকার ওপর আক্রমণ' একটা 'ইনসাইড জব', এ কাজ আমেরিকার নির্বাচিত নেতাদের জানামতেই হয়ে থাকতে পারে।

এর দায়-দায়িত্ব পড়ে প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কেবিনেট, ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এবং আমেরিকার মিলিটারি নেতাদের ওপর, যাদের কাঁধে দেশ ও দেশের নাগরিকদের সুরক্ষা করার দায়িত্ব রয়েছে। ৯/১১ সম্পর্কে দেয়া অফিশিয়াল ব্যাখ্যা নিয়ে উদয় হওয়া সব প্রশ্নের জবাব যদি না-ও পাওয়া যায়, তবুও আমেরিকানদের বিশ্বাস হবে না তাদের রাজনৈতিক ও মিলিটারি নেতারা একজোট হয়ে ৯/১১-এর মতো ঘটনা ঘটিয়েছে। তাতে ভবিষ্যতে দেশের যতবড় লাভই হোক। আমরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানি এ ধরনের যত ষড়যন্ত্রের থিয়োরি হয়েছে, সবই মিথ্যে। কারণ আমেরিকান মিলিটারি ও রাজনৈতিক নেতারা এমন কাজ করবেন না।

তারপরও, ১৯৬২ সালে এরকম এক পরিকল্পনা হয়েছিল। সেটার কথা আমরা জেনেছি সিআইএ সম্প্রতি বেশ কিছু পুরনো 'টপ সিক্রেট' ডকুমেন্ট ডিক্লাসিফাইড করেছে বলে। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সিআইএকে জানানো একটা বিশেষ অনুরোধ হচ্ছে আলোচিত প্ল্যানের পটভূমি। নিজের শাসনামলের শেষদিকে তিনি কিউবায় অভিযান চালানোর একটা অজুহাত তৈরি করতে বলেন সিআইএকে। তাঁর নির্দেশ পালন করে সিআইএ। তৈরি করে এ প্রোগ্রাম নাম কভার্ট অপারেশনস এগেইনস্ট দ্য ক্যাস্ট্রো রেজিম।

এর উদ্দেশ্য ছিল ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে সরিয়ে আর কাউকে ক্ষমতায় বসানো যে কিউবানদের স্বার্থে আন্তরিকভাবে কাজ করবে এবং আমেরিকার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে আমেরিকা যে এই পরিকল্পনার সাথে জড়িত, তা যেন প্রকাশ হয়ে না

BanglaBook.org

পড়ে। সিআইএ এরকম এক পরিকল্পনা হাজির করলে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার অনুমোদন করেন। কিন্তু পরে প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি সেটা বাতিল করে সিআইএ-র আরেক পরিকল্পনা অনুমোদন করেন, যার ফলে বে অব পিগস-এর যুদ্ধে লজ্জাজনক পরাজয় এবং বেইজ্জতি বরণ করতে বাধ্য হয় আমেরিকা।

এরপর, ১৯৬২ সালের শুরুতে প্রেসিডেন্ট কেনেডি কিউবার দায়িত্ব সিআইএ-এর হাত থেকে নিয়ে জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ-এর চেয়ারম্যান, জেনারেল লিম্যান লেমিনৎজারের হাতে তুলে দেন। পরে জেনারেল কিউবা নিয়ে নতুন এক পরিকল্পনা করেন, যার নাম ছিল অপারেশন নর্থউডস।

সেটার ফাইল কভারে লেখা ছিল মেমোরেন্ডাম ফর দ্য সেক্রেটারি অব ডিফেন্স। সকল জয়েন্ট চিফের স্বাক্ষর করা সে প্ল্যান ছিল—টপ সিক্রেট প্ল্যান। কিউবা প্রজেক্ট। মিশনের বর্ণনা ছিল এরকম প্রিটেক্সটস হুইচ উড প্রোভাইড জাস্টিফিকেশন ফর ইউএস মিলিটারি ইন্টারভেনশন ইন কিউবা। যার অর্থ দাঁড়ায় মোটামুটি অজুহাত, যা কিউবায় সামরিক হস্তক্ষেপের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সত্যতা প্রতিপাদন করবে।

কিউবায় সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ 'কিউবার সাথে আমেরিকার এতদিন যাবৎ বিরাজমান উত্তেজনার ফলে যে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে আমেরিকাকে, দুঃখ-দুর্দশার শিকার হতে হয়েছে, এর মাধ্যমে তার ন্যায়সঙ্গত পরিসমাপ্তি ঘটানো।' এরপরই আছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটা বাক্য, 'টু ক্যামোফ্লাজ দ্য আল্টিমেট অবজেক্টিভ' – অর্থাৎ 'আসল উদ্দেশ্য আড়াল করতে।'

আড়াল করতে হবে কারণ 'পার্ট অব দ্য আইডিয়া ওয়াজ টু ইনফ্লুয়েন্স ওয়ার্ল্ড ওপিনিয়ন ইন জেনারেল অ্যান্ড দ্য ইউনাইটেড নেশনস ইন পার্টিকুলার।' কিছুটা বিশ্ব জনমতকে এবং বিশেষ করে জাতিসংঘকে প্রভাবিত করতে এটা করতে হবে; 'বাই ডেভেলপিং দ্য ইমেজ অব দ্য কিউবান অ্যাজ র‍্যাশ অ্যান্ড ইরেসপনসিবল, অ্যান্ড অ্যাজ অ্যান অ্যালার্মিং অ্যান্ড আনপ্রেডিক্টেবল থ্রেট টু দ্য পিস অব দ্য ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফেয়ার।'

অর্থাৎ কিউবান সরকারের ইমেজ দায়িত্বজ্ঞানহীন ও হঠকারী, এবং পশ্চিম গোলার্ধের শান্তির প্রতি দেশটিকে ভয়ঙ্কর এবং অপ্রত্যাশিত বিপদ হিসেবে চিত্রিত করতে হবে। পরিকল্পনায় এ ধরনের ইমেজ সৃষ্টি করার জন্য বেশ কিছু পরামর্শ দেয়া হয়। যেমন আমরা মায়ামি এলাকায় কিউবান কমিউনিস্ট টেরর ক্যাম্পেইন শুরু করতে পারি... ফ্লোরিডার বিভিন্ন শহরে করতে পারি, এমনকি ওয়াশিংটনেও করতে পারি... কিউবা থেকে মায়ামি আসার পথে কিউবান ভর্তি বোট ডুবিয়ে দিতে পারি (আসল হোক বা নকল)। বিষয়টা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কৌতূহল সৃষ্টি করার মতো, তাই নয় কি?

এমন ঘটনাও সাজানো সম্ভব যাতে বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখানো হবে, কিউবান এয়ার ক্র্যাফট একটা আমেরিকান চার্টার্ড সিভিল এয়ার লাইনারকে গুলি করে ভূপাতিত করেছে... পরের প্লেনটির ফ্লাইট প্ল্যান রুট হতে পারে কিউবা অতিক্রম করার কোনো এক সময়. যাত্রীরা হতে পারে কলেজ ছাত্র, ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে...

BanglaBook.org

ক. এগলিন এএফবিতে সিআইএ-র মালিকানাধীন কোনো প্লেনকে অবিকল একটা সিভিল এয়ার ক্র্যাফটের মতো পেইন্ট করে প্রস্তুত রাখতে হবে। সময়মতো একদল বাছাই করা যাত্রীসহ সেটাকে সিভিলিয়ান প্লেনের সাথে বদল করা হবে। আসল রেজিস্টার্ড প্লেনটাকে ড্রোনে রূপান্তরিত করা হবে।

খ. ড্রোন ও যাত্রীবাহী সিভিলিয়ান (ছদ্মবেশী সিআইএ) প্লেন ফ্লোরিডার নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় কাছাকাছি হবে। সেখান থেকে যাত্রীবাহী প্লেনটি হঠাৎ নিচে নেমে এসে এক অক্সিলারি ফিল্ডে জরুরি অবতরণ করবে। তারপর যাত্রী নামিয়ে দিয়ে প্লেনটাকে দ্রুত আগের মতো করে ফেলা হবে। ওদিকে ড্রোন তার নির্দিষ্ট ফ্লাইট প্ল্যান অনুযায়ী চলতে থাকবে। কিউবার আকাশে পৌঁছে আন্তর্জাতিক ডিসট্রেস ফ্রিকোয়েন্সিতে 'MAY DAY' সিগন্যাল পাঠিয়ে জানাবে, কিউবান MIG বিমান হামলা করেছে। ড্রোন ট্রান্সমিশন শেষ করতে পারার আগেই রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে ওটায় আগে থেকে পেতে রাখা বোমা ফাটিয়ে দেয়া হবে।

একই সাথে আরও কয়েকটা পরিকল্পনাও হাজির করা হয়েছিল প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডির সামনে। প্রতিটাতেই 'হতাহতের ব্যবস্থা করা' এবং তাদের নাম-ধাম ইত্যাদি পত্রিকায় ছাপিয়ে আমেরিকায় 'কিউবান সরকার বিরোধী একটা জোরাল হুজুগ' তোলার আয়োজন করার প্রস্তাব ছিল। সেসব প্ল্যানে প্রাণহানির কোনো পরিকল্পনা ছিল না বটে, কিন্তু সব প্ল্যান এক ধরনের ছিলও না। যেমন 'কিউবান ভর্তি বোট ডুবিয়ে দেয়া'।

এই প্ল্যান অনুমোদন করা হলে প্রাণহানির ঘটনা অবশ্যই ঘটত। সমস্ত জয়েন্ট চিফ সেই প্ল্যানে স্বাক্ষর করার পরও কেনেডি সেটা রিজেক্ট করেন। এই ঘটনায় কেউ কেউ হয়তো এই ভেবে তৃপ্তি পেতে পারেন যে, 'মিলিটারি লিডাররা এসব করতে পারে। কিন্তু দেশের প্রেসিডেন্টরা কখনও এমন ঘৃণ্য পরিকল্পনা অনুমোদন করেন না'। কিন্তু তারপরও কথা থাকে।

একেকজন প্রেসিডেন্ট আলাদা আলাদা পরিস্থিতিতে আলাদা আলাদা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এমন নজিরও কম নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৮৯০ এর দশকের শুরুর দিকে হাওয়াইকে আমেরিকার সাথে যুক্ত করার একটা পরিকল্পনা প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড 'একদল অ্যাডভেঞ্চারারের তৈরি স্বার্থপর, অত্যন্ত অসম্মানজনক স্কিম' বলে বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরের প্রেসিডেন্ট, উইলিয়াম ম্যাককিনলে কিন্তু উল্টোটা করেছিলেন। *মেইন ইনসিডেন্টকে* কেন্দ্র করে যাঁরা স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কিউবা, পুয়ের্টো রিকো ও ফিলিপিনসকে দখল করতে, ম্যাককিনলে তাঁদেরও একজন ছিলেন।

জন এফ. কেনেডি একটা বিশেষ পরিকল্পনা বিশেষ সময়ে বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য

BanglaBook.org

পরিচালিত সিআইএর ব্যর্থ মিশন, বে অব পিগস-কে কেন্দ্র করে যে লেজে-গোবরে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই চরম বিব্রতকর পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার পর।

এর অর্থ এই নয় যে প্রাণহানি; আরও স্পষ্ট করে বলতে কিছু আমেরিকানের প্রাণহানির 'ঘটনা'-র মধ্য দিয়ে বড়ো ধরনের জিওপলিটিক্যাল প্রাপ্তির সুবিধা আছে জেনেও সব প্রেসিডেন্ট, সব সময় এ ধরনের প্ল্যান বাতিল করবেনই।

***

৯/১১ পরবর্তী আমেরিকান যুদ্ধ 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান নয়। এটা দেশজয়ের যুদ্ধ... এবং আমেরিকান জনগণ তাদের সরকারের হাতে সচেতনভাবে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রতারিত হয়েছে।' মাইকেল চসুদোভস্কির আগে আংশিক উল্লেখ করা এই উদ্ধৃতি যে কতখানি সত্যি, এই অধ্যায়ের ঘটনাবলীই তা প্রমাণ করে। আগামী অধ্যায়ে সমালোচকদের হাজির করা আরেক ধরনের প্রমাণ সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করা হবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

জেরায় বাধা দেয়া হয়েছে?

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে ঘটে যাওয়া *দ্য নিউ পার্ল হারবার* ছিল আগে থেকে পরিকল্পনা করা একটি এজেন্ডা পূরণের প্রথম পদক্ষেপ। সমালোচকরা বলেন, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর বুশ প্রশাসনের প্রতিটা হাই-অফিশিয়ালের কথায়-কাজে এবং আচরণে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সবকিছুই আগে থেকে সাজানো ছক অনুযায়ী ঘটানো হয়েছে। তাদের কথা এবং কাজের মধ্যে বিস্তর অমিলেই বোঝা গেছে বিষয়টা আসলেই আরোপিত।

এই অধ্যায়ে তাদের দাবির বিপরীতে কিছু তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরা হবে যাতে পাঠক বুঝতে পারবেন, গোটা বিষয়টা নিয়ে কতবড় ধোঁকাবাজি করা হয়েছে বুশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

লাদেনকে 'না' ধরার অভিযান?

নাফিজ আহমেদ ও পল থম্পসন পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ হাজির করেছেন যাতে এটা একদম স্পষ্ট যে, আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল ওসামা বিন লাদেনকে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশের ভাষায় 'ডেড অর অ্যালাইভ' (জীবিত বা মৃত) পাকড়াও করা এবং আল-কায়েদা সংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করা। কিন্তু মুখে তিনি যা-ই বলুন, আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু ছিল। কারণ নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে আমেরিকান সরকার ও তার মিলিটারি নেতারা বিন লাদেন ও আল-কায়েদা নেতাদের হাতের মুঠোয় পেয়েও একাধিকবার পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

একটা উদাহরণ দেয়া যাক। কাবুলের অনেক অধিবাসীর মতে নভেম্বরের শুরুর দিকের এক রাতে আল-কায়েদার বড় বড় নেতাদের নিয়ে গাড়ির বিশাল এক কনভয় যাচ্ছিল শহরের ওপর দিয়ে। কম করেও ১ হাজার গাড়ি আর ট্রাক ছিল সেই বহরে। সেদিন খুব অন্ধকার ছিল, তারপরও সেই বহরের ওপর আমেরিকান বাহিনী কেন হামলা চালায়নি, সে এক বিরাট রহস্য। কারণ যত অন্ধকারই হোক, আমেরিকান পাইলটরা আকাশ থেকে গাড়ির হেড লাইটের আলো নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছিল! রাত

BanglaBook.org

আটটা থেকে ভোর তিনটা পর্যন্ত হাইওয়েতে জ্যাম লেগে ছিল।

থম্পসন প্রশ্ন করেন 'ওই সময় কাবুলের ওপর শ্যেন দৃষ্টি ছিল আমেরিকান বাহিনীর। তাদের প্রতিটা স্যাটেলাইটের দৃষ্টি কাবুলের ওপর স্থির ছিল। তারপরও এতবড় একটা গাড়িবহর কিভাবে বিনা বাধায় সরে পড়তে পারল?'

একই মাসের শুরুর দিকে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো জালালাবাদ শহরে আল-কায়েদা যোদ্ধা ও নেতাদের চলাচলের ওপর নজর রাখছিল। তাদের কাছে খবর ছিল, বিন লাদেন স্বয়ং জালালাবাদ এসেছেন। *নাইট রিডার* (Knight Ridder) পত্রিকার মতে তারপর যা ঘটে তা এরকম আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স বিশ্লেষকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, বিন লাদেন ও তাঁর সহযোদ্ধারা বর্ডার পার হয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়ে আছেন। তারপরও ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড তাদের আটকানোর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

'নভেম্বরের ওই সময় থেকে মোটামুটি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল সে ওই এলাকা তালেবান যোদ্ধাদের পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার প্রধান রুট হয়ে উঠতে যাচ্ছে,' বলেন নাম-পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স অফিসার। 'সবারই সবকিছু জানা ছিল। তারপরও চরম বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলাম কোনো পদক্ষেপই নেয়া হলো না।'

এর ক'দিন পর, নভেম্বরের ১৪ তারিখ নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের হাতে জালালাবাদ শহরের পতন হয়। সেই রাতে 'কয়েকশ গাড়ির একটা কনভয়' বিন লাদেনসহ ১ হাজারেরও বেশি তালেবান ও আল-কায়েদা যোদ্ধা নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে তোরা বোরা অঞ্চলে চলে যায়। আমেরিকান বাহিনী তাদেরকে 'ঠেকাতে' জলালাবাদ এয়ারপোর্টে বোমা ফেলে, কিন্তু কনভয় নিরাপদেই সরে পড়ে। দু'দিন পর, ১৬ নভেম্বর আনুমানিক ৬০০ আল-কায়েদা ও তালেবান যোদ্ধা এবং অনেক সিনিয়র নেতা তোরা বোরা হয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যায়।

ইউএস এয়ারফোর্স ওই অঞ্চলে প্রচুর বোমা বর্ষণ করেছে, কিন্তু তাতে কনভয়ের কোনো ক্ষতি হয়নি। কারণ তোরা বোরা অঞ্চলে পাকিস্তানে যাওয়ার দুটো মেইন রুট আছে। আমেরিকান বাহিনী কেবল তার একটায় বোমা ফেলেছে, অন্যটা দিয়ে ৬০০ আল-কায়েদা ও তালেবান যোদ্ধা একদম নির্বিঘ্নে সরে পড়েছে। পরের কয়েক সপ্তাহে একই রুট দিয়ে আরও শত শত যোদ্ধা পালিয়ে পাকিস্তানে চলে যায়। ইউএস এয়ারফোর্সের বোমা বা পাকিস্তানী বর্ডার গার্ডদের ব্যাপারে মোটেও উদ্বিগ্ন ছিল না তারা।

এক আফগান ইন্টেলিজেন্স অফিসার মন্তব্য করেন, এসব রুট দিয়ে তালেবান আর আল-কায়েদা যোদ্ধাদের চলাফেরা ঠেকাতে আমেরিকান বাহিনী কোনো রোড ব্লক বা চেকিং পোস্ট বসায়নি দেখে আমরা অবাক হয়েছি। পাকাই ছিল তাদের সবচেয়ে নিরাপদ এক্সিট রুট। *টেলিগ্রাফ* পত্রিকা মন্তব্য করে অতীত পর্যালোচনা করে মনে হয়, অংশগ্রহণকারী দুই পক্ষের বিভিন্নমুখী লাভ হবে বলে ১৬ নভেম্বর তোরা বোরায় যুদ্ধ নয়, ভণিতা করা হয়েছে।

BanglaBook.org

রিপোর্টে বলা হয়, প্রত্যক্ষদর্শীরা রীতিমতো হতবাক হয়েছেন তাই দেখে। ইউএস বাহিনী তিনদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেছিল আল-কায়েদা ও তালেবান যোদ্ধাদের। অনেক সিনিয়র নেতাও ছিল সে দলে। কিন্তু উন্মুক্ত চতুর্থদিক, অর্থাৎ পাকিস্তানের বর্ডারের দিকে যাওয়ার পথ খোলা ছিল। নতুন আফগান সরকারের এক ইন্টেলিজেন্স অফিসার এ ব্যাপারে বলেছেন, 'চতুর্থটাই ছিল আসল। অথচ ওটার দিকে কারও নজর ছিল না।'

২৮ নভেম্বর তোরা বোরায় ছিলেন, ইউএস স্পেশাল ফোর্সের এমন এক সৈন্য পরে ফায়েতেভিল, নর্থ ক্যারোলাইনায় বলেন, সেদিন তোরা বোরার এক গুহায় বিন লাদেনকে ঘেরাও করে ফেলেছিল তাদের বাহিনী। কিন্তু কিছু করতে পারেনি। তিনি বলেন, তাদের বাহিনী যখন হাই কম্যান্ডের পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল, তখন পাকিস্তানের দিক থেকে দুটো কালো হেলিকপ্টার এসে ঘেরাওয়ের মধ্যে যেখানে বিন লাদেন আটকা পড়েছিলেন, সেখানকার সবাইকে তুলে নিয়ে যায়। সেই সৈন্য নিজের পরিচয় জানাতে রাজি হননি, তবে তার এ দাবিকে হালকা করে দেখার উপায় নেই।

থম্পসন বলেছেন, পরে *নিউজউইক* ম্যাগাজিনেও এই খবর ছাপা হয়। তাতে তোরা বোরার স্থানীয়দের সূত্র ধরে বলা হয়, রহস্যজনক কালো হেলিকপ্টার পাহাড়ের ওপর দিয়ে 'লো আলটিচিউডে' বা নিচু দিয়ে সারারাত ধরে সেখানে আসা-যাওয়া করেছে এবং ঘেরাওয়ের মধ্যে আটকে পড়া আল কায়েদার মাথাদের পাকিস্তানে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

থম্পসন এর সাথে যোগ করেছেন, 'সম্ভবত দৈব-সংযোগই হবে; এই খবরটি যেদিন প্রকাশিত হয়, সেদিন আরও একটা বিশেষ খবর ছাপা হয় যাতে বলা হয়, ফায়েতেভিলের স্পেশাল ফোর্সেস-এর পাঁচজন সৈন্য, যারা সম্প্রতি আফগানিস্তান থেকে ফেরৎ এসেছেন, তাদের মধ্যে তিনজন এবং তাদের স্ত্রীরা গত জুন মাস থেকে এ পর্যন্ত নানান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে অথবা আত্মহত্যা করেছে।'

২০০১ এর ডিসেম্বরের শেষদিকে আফগান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রি ইউনিস কানুনি দাবি করেন, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই বিন লাদেনকে আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। অফিশিয়াল ব্যাখ্যার সমালোচকরা বলেন, ইউনিস কানুনির এই কথায় বুঝতে অসুবিধা হয় না বুশ প্রশাসন ৯/১১ পরবর্তী কর্মকাণ্ডে পাকিস্তানকে তার পার্টনার করে নিয়েছিল। ২০০২ সালের মার্চ মাসে জর্জ বুশ বলেন, বিন লাদেনকে ধরার বা হত্যা করার আগ্রহ তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। সেদিন এক ভাষণে তিনি বলেন, 'সে এমন এক লোক যার পৃথিবী অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়ে গেছে...! তার পিছনে বেশি সময় নষ্ট করবেন না... আমি তার ব্যাপারে আর ততটা আগ্রহী নই।'

আফগানিস্তানে ইউএস বাহিনীর হামলা যে কখনই বিন লাদেনকে ধরার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়নি, তা বুশের এই কথাতেই পরিষ্কার প্রমাণ হয়। থম্পসন বলেন, বুশের এই মন্তব্যের এক মাস পর জেনারেল রিচার্ড মেয়ার কথাটা আরও স্পষ্ট করে দেন। তিনি বলেন, 'বিন লাদেনকে ধরার লক্ষ্য আমাদের কখনও ছিল না।' এরচেয়ে আরও কৌতূহল জাগানো মন্তব্য করেছিলেন আরেক অফিশিয়াল। তিনি বলেন, যদি

BanglaBook.org

মিস্টার লাদেন বাই চান্স ধরা পড়ে যেতেন, তাহলে একটা আন্তর্জাতিক প্রয়াস অপরিণত অবস্থায় মাঠে মারা যেত।' এ খবর ছাপা হয় *ডেইলি মিরর*-এ, ২০০১ এর ১৬ নভেম্বর।

এইসব উল্টাপাল্টা বক্তব্যের মধ্য থেকে সারমর্ম বের করার পথ দেখিয়েছেন জর্জ মনবিয়ট। ৯/১১-এর এক সপ্তাহ পর তিনি লেখেন 'ওসামা বিন লাদেনের অস্তিত্ব যদি একেবারেই না থাকত, তাহলে তাকে আবিষ্কার করার প্রয়োজন পড়ত। কারণ গত চার বছরে আমেরিকার প্রেসিডেন্টরা যখনই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজেছেন, অথবা প্রতিরক্ষা খরচ আরও বাড়ানোর উপায় বের করার চেষ্টা করেছেন, তখনই তারা বিন লাদেনের নাম ধরে টানাটানি করেছেন। এমনকি প্রেসিডেন্ট বুশের মিসাইল ডিফেন্স প্রোগ্রামের প্রতি সমর্থন আদায়ের কাজেও লাদেনকে ব্যবহার করা হয়েছে... এখন ওসামা বিন লাদেন এমনই এক অপশক্তি বনে গেছে যাকে দমন করতে তাঁকে ক্রুসেড শুরু করতে হবে। অবয়ববিহীন সন্ত্রাসের পিছনের অবয়ব... পশ্চিমি সরকারগুলোর তাকে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নিহীত আছে তার বিশ্বকে আতঙ্কিত করার ক্ষমতার মধ্যে। যখন মিলিটারির পিছনে খরচ করা বিলিয়ন বিলিয়ন পাউন্ড ঝুঁকির মুখে, তখন দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র এবং সন্ত্রাসী ওয়ার লর্ডরা তাদের যথার্থ সম্পদ হয়ে ওঠে, কারণ তারা আসলে বোঝা।

মনবিয়টের এই বক্তব্য এবং এক সিনিয়র অফিশিয়ালের, যদি মিস্টার লাদেন বাই চান্স ধরা পড়ে যেতেন, তাহলে একটা আন্তর্জাতিক প্রয়াস অপরিণত বয়সে মাঠে মারা যেত' মন্তব্যের মধ্যেই সম্ভবত লুকিয়ে আছে কেন 'বিন লাদেনকে ধরার' অভিযান 'না ধরার অভিযানে' পরিণত হয়েছিল।

আইএসআই-এর ভূমিকা আড়াল করার চেষ্টা

আমরা আগেই দেখেছি, সিআইএ আর পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই মিলে ১৯৯০-এর দশকে তালেবান সৃষ্টি এবং তাদের বিজয় নিশ্চিত করে। মাইকেল চসুদোভস্কি বলেছেন, 'পাকিস্তানের আইএসআই-এর মাধ্যমে পাঠানো আমেরিকার বিপুল সাহায্য-সহযোগিতা না পেলে তালেবানরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করতে পারত কি না সন্দেহ আছে।' আইএসআই না থাকলে কাবুলে যেমন কোনো তালেবান সরকার ক্ষমতায় বসতে পারত না, তেমনি আমেরিকার সীমাহীন সহযোগিতা না পেলে পাকিস্তানের শক্তিশালী মিলিটারি-ইন্টেলিজেন্স অ্যাপারেটাসটি অবাধে বেড়ে উঠতে পারত না।

সিআইএ আর আইএসআই, এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে ১৯৮০-এর দশকে। ওই সময় আইএসআই একটা স্বাধীন সংগঠন ছিল। সিআইএ সেটাকে ব্যবহার করত আফগানিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে থাকা সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত চোরাগোপ্তা হামলার কাজে। ১৯৭৯ সালে শুরু হয় সেটা। সিআইএ ও আইএসআই সারা পৃথিবী থেকে সংস্কারপন্থি মুসলমানদের রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই

BanglaBook.org

করার জন্য সংগ্রহ করত। এ কাজে সাহায্য করার জন্য বিন লাদেনকে পাকিস্তানে নিয়ে আসা হয়। অবশ্য সিআইএ-র সাথে তাঁর আলাদা এক সমঝোতা ছিল।

সিআইএ আফগানিস্তানের ব্যাপারে বিন লাদেনকে লাগামহীন ছাড় দিয়েছে। পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্সের জেনারেলরাও দিয়েছেন। জন কে. কুলি ১৯৯৯ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত নিজের বই *আনহোলি ওয়ারস আফগানিস্তান, আমেরিকা অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল টেররিজম*-এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এই সুযোগে বিন লাদেন তাঁর বিপুল ধন-সম্পদ কাজে লাগিয়ে ১৯৮৫ সালের দিকে আল-কায়েদা গঠন করেন। এর সাথে থম্পসন মনে করিয়ে দিচ্ছেন, সিআইএ, আইএসআই এবং বিন লাদেন, সবারই পাকিস্তান ভিত্তিক 'কুখ্যাত' ব্যাংক অব ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল (বিসিসিআই)-এ অ্যাকাউন্ট আছে।

যা হোক, '৮০-এর দশকের শেষদিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, বেনজির ভুট্টো পরিস্থিতি সম্পর্কে বুশ সিনিয়রকে বলেছিলেন, 'আপনারা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করছেন।' তারপর '৯০-এর দশকে সিআইএ পাকিস্তানের আইএসআই-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে তালেবান সৃষ্টি করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সেলিগ হ্যারিসনের সাথে সিআইএ এজেন্টদের পরিচয় আছে। জানা যায়, তিনিও তাদের সতর্ক করেছিলেন 'তোমরা দানব তৈরি করছ' বলে।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয় কেবল আল-কায়েদা আর তালেবানই দিনে দিনে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন হয়ে ওঠেনি, আইএসআই-ও হয়েছে। অভিযোগ আছে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে থাকার সময় তাদেরকে ড্রাগ অ্যাডিক্ট করে তোলার জন্য সিআইএ-র পরামর্শে আইএসআই সীমান্ত এলাকায় ব্যাপকভাবে হেরোইন উৎপন্ন করত। পরে সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়া হলে সেই হেরোইন তারা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে পাচার করতে থাকে এবং সেই টাকা আইএসআইকে আরও সুসংগঠিত করার কাজে ব্যবহার হয়।

এক বিশ্লেষক বলেন, এর ফলে আইএসআই ক্রমে প্রচণ্ড ক্ষমতাধর হয়ে ওঠে এবং সরকারের ভেতরে আরেক সমান্তরাল সরকারে পরিণত হয়। *টাইম* ম্যাগাজিন এই বিশ্লেষকের মন্তব্য সমর্থন করে বলে, 'নটোরিয়াস আইএসআই ইজ কমনলি ব্র্যান্ডেড এ স্টেট উইদিন দ্য স্টেট অর পাকিস্তান'স ইনভিজিবল গভর্নমেন্ট।' এর বাংলা হচ্ছে কুখ্যাত আইএসআই সাধারণভাবে 'রাষ্ট্রের ভেতরকার রাষ্ট্র' হিসেবে মার্কামারা হয়ে যায়, অথবা পাকিস্তানের অদৃশ্য সরকার হিসেবে।' *নিউ ইয়র্কার* পত্রিকায়ও আইএসআইকে 'সমান্তরাল সরকার' উল্লেখ করা হয়।

একদিকে সিআইএ এবং অন্যদিকে আল-কায়েদা ও তালেবানের সাথে সম্পর্ক রেখে আইএসআই-এর চলার বিষয়টা যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ কখনও চোট খায়নি তাদের এ সম্পর্ক। অনেকের অভিমত, ওসামা-সিআইএ সম্পর্ক ছিল সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের 'বাইগন এরা' বা ভুলে যাওয়া আমলের কথা। কিন্তু চমস্কি জোর দিয়ে বলেন, ইসলামি গ্রুপগুলোর সাথে আমেরিকার সম্পর্ক কোনোকালেও ছিল না। তবে আইএসআই-এর সাথে সিআইএ-র সম্পর্ক ছিল এবং আছে।

BanglaBook.org

চসুদোভস্কির এই মতের প্রতি এমন আরেকজন সমর্থন জানিয়েছেন, যাঁর রাজনৈতিক দর্শন নাফিজ আহমেদ ও তাঁর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর নাম জেরাল্ড পজনার। এর আগে আমরা এই লোকের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেছি আবু জুবায়দাকে দুই আমেরিকান-আরবের জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে। যে দাবি করেছিল, আল-কায়েদার কার্যক্রম সউদি অফিশিয়ালদের অজানা থাকে না। সেই লোকের বরাত দিয়ে জেরাল্ড পজনার জানান, ১৯৯৬ সালে পাকিস্তানে বিন লাদেন ও মুশারফ আলি মির নামে আইএসআই-এর সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তার মধ্যে একটা অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী বিন লাদেন ও আল-কায়েদার সদস্যরা সম্ভবত এখনও বহাল তবিয়তেই থাকতে পারে আইএসআই-এর আশ্রয়ে। নিয়মিত অস্ত্রও সরবরাহ পেয়ে থাকে।

পজনার আরও জানিয়েছেন, আবু জুবায়দার স্বীকারোক্তির পর নানান 'দুর্ঘটনায়' নিহত সেই তিন সউদির মতো পরিণতি মুশারফ আলি মিরকেও বরণ করতে হয়েছে। বিন লাদেনের সাথে সেই চুক্তি স্বাক্ষরের সাত মাস পর, ২০০৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের একটা প্লেন বিধ্বস্ত হয়ে মারা যান তিনি। সাথে তাঁর স্ত্রী এবং বেশকিছু ঘনিষ্ঠ সহচরও ছিলেন। প্লেনের যান্ত্রিক কোনো সমস্যা ছিল না। বরং রুটিন ইন্সপেকশনে পাস করেছিল সেটা এবং সেদিনের আবহাওয়াও যথেষ্ট ভালোই ছিল।

যা হোক, এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সিআইএ এবং আল-কায়েদার সাথে আইএসআই-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলা। এই কারণেই ৯/১১-এর ক'দিন পরই জানা যায় যে, সাঈদ শেখ নামে আইএসআই-এর এক এজেন্ট আল-কায়েদার মোহাম্মদ আতার ফ্লোরিডা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১,০০,০০০ ডলার ট্রান্সফার করেছে। এবং সে কাজ আর কারও নয়, সংস্থার স্বয়ং ডিরেক্টর জেনারেল মাহমুদ আহমাদের নির্দেশে। যাকে ৯/১১-এ হামলাকারী সন্ত্রাসীদের রিং লিডার মনে করা হয়, তার অ্যাকাউন্টে গোপনে টাকা পাঠানোর এই ঘটনা যথেষ্ট উত্তাপ সৃষ্টি করে তখন। ফরাসি সংবাদ সংস্থা এএফপি আইএসআই-সিআইএ সংযোগকে 'ড্যামিং লিংক' আখ্যা দিয়ে জানায়, এই মানি ট্রান্সফারের কথা আমেরিকান সরকারকে প্রথমে জানায় ইনডিয়ান সরকার।

বিষয়টা আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন জানা যায় জেনারেল মাহমুদ আহমাদ ৯/১১-এর দিন ওয়াশিংটনেই ছিলেন। আরও সত্যি যে তিনি ৪ সেপ্টেম্বর থেকে, অর্থাৎ ঘটনার এক সপ্তাহ আগে থেকেই সেখানে ছিলেন। ৯ সেপ্টেম্বর সিআইএ-র ডিরেক্টর জর্জ টেনেটের সাথে দেখা করেন তিনি। পেন্টাগন, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল (এনএসসি) আর স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। হাউজ অ্যান্ড সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটিজ-এর চেয়ারম্যানও ছিলেন তাদের মধ্যে।

পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান ইংরেজি পত্রিকা *দ্য নিউজ* ১০ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে একটা তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে জেনারেল আহমাদের এই ওয়াশিংটন সফর কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে অতীতের একই ধরনের আরেক সফরের জন্য। সেই সফরে

BanglaBook.org

জেনারেল আহমাদের আগের চিফ যখন ওয়াশিংটনে ছিলেন, পাকিস্তানের রাজনীতিতে তখন বড় ধরনের ওলট-পালট ঘটে গিয়েছিল। ১৯৯৯ সালের ১২ অক্টোবর ঘটে সেই ওলট-পালট। সেদিন জেনারেল পারভেজ মোশাররফ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন এবং কু সফল করার প্রধান ব্যক্তি, জেনারেল আহমাদকে আইএসআই-এর প্রধানের পদে বসান।

জেনারেলের সেবারের ওয়াশিংটন সফরের সময়ও বড় একটা ঘটনা ঘটে, তবে সেটা আফগানিস্তানে। ৯ সেপ্টেম্বর সে দেশের নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের নেতা, আহমেদ মাসুদ আততায়ীর হাতে নিহত হন। নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের অভিযোগ, কাজটা ছিল আইএসআই-এর। মাসুদ নিহত হওয়ার পরপরই সিআইএ প্রধান ও আইএসআই প্রধান জেনারেল আহমাদের মধ্যে দীর্ঘ বৈঠক হয়, যার গুরুত্ব অবশ্যই আছে। কারণ হিসেবে চসুদোভস্কি বলেন, 'আমেরিকা অনেকদিন ধরেই চাইছিল মাসুদকে দুর্বল করতে। কারণ তিনি ছিলেন সংস্কারপন্থি জাতীয়তাবাদী নেতা। তাঁর মৃত্যুতে আমেরিকার লাভ হয়।'

মাসুদ নিহত হওয়ার পর নর্দার্ন অ্যালায়েন্স বিভিন্ন উপদলে ভাগ হয়ে যায়। তিনি বেঁচে থাকলে আফগানিস্তানে তালেবান পরবর্তী সরকার গঠন করতে পারতেন এবং নিজে হতেন নতুন সরকারের প্রধান ব্যক্তি। ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি জুলি সারস-এর সাথে যে আচরণ করেছে, এসব ঘটনায় তার কিছুটা প্রতিফলন সম্ভবত পাওয়া যায় (৬ অধ্যায়ে দেখুন)।

মাসুদ হত্যাকাণ্ডের তাৎপর্য সম্ভবত এফবিআই এজেন্ট জন ও'নিলের আচরণে কিছুটা পাওয়া যায়। আল-কায়েদা সম্পর্কে তদন্ত করতে গেলে বাধা দেয়া হয় বলে তিনি এফবিআই থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। মাসুদ নিহত হওয়ার পরদিন, ১০ সেপ্টেম্বর ডাব্লিউটিসি-র উত্তর টাওয়ারে নিজের নতুন অফিসে উঠেছিলেন জন ও'নিল। সেখানে ডিরেক্টর অব সিকিউরিটি পদে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে ৯/১১-এর নিহতদের তালিকায় তিনিও আছেন। তার আগেরদিন রাতে ও'নিল এক সহকর্মীকে বলেছিলেন, 'বড় ধরনের কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আফগানিস্তানে যা ঘটছে আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

৯/১১-এর সমালোচকদের অবস্থানগত দিক থেকে দেখতে গেলে আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না যে, আফগানিস্তানে যে সময় আহমেদ মাসুদ আততায়ীর হাতে নিহত হলেন, ঠিক সেই সময় আইএসআই চিফের ওয়াশিংটনে হাজির থাকার ব্যাপারটা সন্দেহের উদ্রেক করবে বলে তারা চায়নি বিষয়টা জানাজানি হোক। তাছাড়া ২০০২ সালের ১৬ মে এক প্রেস কনফারেন্সে কন্ডোলিৎসা রাইস যেসব কথা বলেন, তাতেও প্রমাণ হয় বুশ প্রশাসন চাইছিল না আইএসআই চিফের ওয়াশিংটনে থাকার ব্যাপারটা বেশি প্রচার পাক।

সেই কনফারেন্সে ফেডারাল নিউজ সার্ভিসের পক্ষ থেকে মিস রাইসকে যেসব প্রশ্ন করা হয়, সেই ট্রান্সক্রিপ্টের শুরুটা এরকম আপনি কি জানতেন তখনকার রিপোর্টে এসেছে ৯/১১-এর দিন আইএসআই চিফ ওয়াশিংটনে ছিলেন, এবং তার আগেরদিন

BanglaBook.org

পাকিস্তান থেকে ১ লাখ ডলার মোহাম্মদ আতার অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছিল? আইএসআই চিফ ওয়াশিংটনে কি করছিলেন? প্রশাসনের আপনাদের মধ্যে কারও সাথে আলোচনা করছিলেন?

মিস রাইস জবাব দেন : আমি সেই রিপোর্ট দেখিনি। তবে তিনি অবশ্যই আমার সাথে মিটিং করেননি।

আইএসআই চিফ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সাথে বৈঠক করেছেন, অথচ প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজরের সাথে দেখা করেননি, এ কথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তারওপর সেই ট্রান্সক্রিপ্টের হোয়াইট হাউজ ভার্শন শুরু হয়েছে এভাবে ডক্টর রাইস, আপনি কি জানতেন (নাম শোনা যায়নি) ১১ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে ছিলেন?

প্রথমটা ছিল ফেডারাল নিউজ সার্ভিসের ট্রান্সক্রিপ্ট। সেটায় 'আইএসআই চিফ' কথাটা যেভাবে স্পষ্ট উচ্চারণ করা হয়েছে, পরেরটায় সেরকম ছিল না। তবে সিএনএন-এর ইনসাইড পলিটিক্স অনুষ্ঠানে তার উল্লেখ ছিল। তাই চসুদোভস্কির সন্দেহ, ইউএস অফিশিয়ালরা এর সাথে আইএসআই সংযোগ গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এফবিআই তার রিপোর্টে জেনারেল আহমেদ, সাঈদ শেখ বা আইএসআই, কারও নাম উল্লেখ করেনি।

এবিসি নিউজ-এর ব্রায়ান রস রিপোর্ট করেন, ফেডারাল কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছে যে ৯/১১-এর আগে পাকিস্তান থেকে ১ লাখ ডলারেরও বেশি পাঠানো হয়েছিল আতার অ্যাকাউন্টে। *টাইম* ম্যাগাজিনের খবরে বলা হয়, 'সেই টাকার কিছু অংশ ওসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ লোকজন পেয়েছে।' এফবিআই-এর রিপোর্টে কথাটা এসেছে এভাবে : টাকাটা এসেছে বিন লাদেনের সাথে ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে। এসব রিপোর্টে জেনারেল আহমাদ, সাঈদ শেখ বা আইএসআই, কোনো নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

পরে প্রমাণ পাওয়া গেছে সাঈদ শেখ আসলে অনেক বেশি টাকা পাঠিয়েছিল মোহাম্মদ আতার ফ্লোরিডা অ্যাকাউন্টে। থম্পসন জানান, ২০০০ সালে পাঠানো হয় ১ লাখ ডলার। আরও ১ লাখ পাঠানো হয় ২০০১ সালের ১১ আগস্ট। ৯/১১-এর ঠিক একমাস আগে। এই দুটো টাকা পাঠানোর ঘটনার মধ্যে কোনটা যে অক্টোবর মাসে ফাঁস হয়েছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। অন্যদিকে *নিউ ইয়র্ক টাইমস* জানিয়েছে আতার ফ্লোরিডা অ্যাকাউন্টে জনৈক 'মুস্তাফা আহমাদ' মোট ৩,৫৫,৩০০ ডলার ট্রান্সফার করে। সিএনএন ও *গার্ডিয়ান*-এর মতে মুস্তাফা আহমাদ সাঈদ শেখের আরেক নাম।

মোহাম্মদ আতার অ্যাকাউন্টে শেষবার টাকা জমা হয় সেপ্টেম্বরের ৮ ও ৯ তারিখ। থম্পসন বলেন, এই টাকাকে আখ্যা দেয়া হয়েছিল 'ওয়াকিং গান।' এবং এই টাকা ট্রান্সফারের ঘটনাই প্রমাণ করে ৯/১১-এর সাথে আল-কায়েদা অবশ্যই জড়িত ছিল। কেননা সাঈদ শেখ পরিচিত ছিল ওসামা বিন লাদেনের ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজার হিসেবে। থম্পসনের প্রশ্ন, সাঈদ শেখ যেহেতু আইএসআই-এর চাকরি করে, সেহেতু সেটাও কি ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার অন্যতম অংশীদার ছিল না?

BanglaBook.org

চসুদোভস্কি চিন্তাটাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে আতার অ্যাকাউন্টে আইএসআই-এর টাকা ট্রান্সফার এবং হামলার সময় আইএসআই চিফের ওয়াশিংটনে হাজির থাকার বিষয়টিকে 'দ্য মিসিং লিংক বাহাইন্ড ৯-১১' আখ্যা দিয়েছেন। তার বিবৃতির সারাংশ ছিল এরকম ৯/১১ এর সন্ত্রাসীরা তাদের নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেনি। সুইসাইড হাইজ্যাকাররা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পাতা ইন্টেলিজেন্স অপারেশনের হাতিয়ার ছিল। এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ বলে, এই হামলার ব্যাপারে আল-কায়েদাকে পাকিস্তানের মিলিটারি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই সাহায্য করেছে এবং এই সংস্থা তার অস্তিত্বের জন্য সিআইএ-র কাছে চিরঋণী থাকবে।

চসুদোভস্কির বিশ্বাস এই দুষ্কর্মের সাথে 'ইউএস মিলিটারি-ইন্টেলিজেন্স এস্টাবলিশমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা জড়িত ছিলেন।' তবে টাকাগুলো বুশ প্রশাসনের পক্ষ থেকেই পাঠানো হয়েছিল কি না, তা তদন্ত ও প্রমাণ সাপেক্ষ। টাকা ট্রান্সফার করার বিষয়টা এই হামলার সাথে ইউএস সরকারের সম্ভাব্য সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করে, এমন ধারণা কেবল চসুদোভস্কিরই নয়, আরও অনেকের। নাফিজ আহমেদ ও জারড ইসরায়েলের প্রশ্ন আইএসআই-এর সাথে সিআইএ-র দীর্ঘদিনের সম্পর্কের ফলে এটাও হতে পারে আমেরিকা আইএসআই-এর মাধ্যমেই আল-কায়েদাকে টাকা পাঠানো হয়েছে।

পিটসবার্গ ট্রিবিউন রিভিউ পত্রিকায় এ ব্যাপারে লেখা হয়েছে 'মোশাররফ সরকারের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যারা মনে করেন সাঈদ শেখ আইএসআই-এর ক্ষমতায় চলেন না। তার ক্ষমতার উৎস খোদ সিআইএ। সাঈদ শেখকে কিনে নিয়েছে সিআইএ, তার বেতনও তারাই দেয়।'

আইএসআই প্রধান বুঝতে পারেন, তাদের মাধ্যমে আল-কায়েদাকে টাকা দেয়ার বিতর্কে জড়িয়ে সিআইএ বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। তার সাথে সম্পর্ক আর ধরে রাখতে আগ্রহী নয় সিআইএ। তাই ৮ অক্টোবর, আফগানিস্তানে বোমা বর্ষণ শুরু হওয়ার একটু আগে জেনারেল মাহমুদ আহমাদ আইএসআই থেকে পদত্যাগ করেন। সংস্থার পক্ষ থেকে যদিও বলা হয়, এটাই উপযুক্ত সময় মনে করে তিনি পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু *টাইমস অব ইনডিয়া* বলে অন্য কথা। তাদের মতে, ইউএস অফিশিয়ালরা যখন ইনডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারে যে জেনারেল আহমাদের নির্দেশেই মোহাম্মদ আতার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছে, তখন তাঁর অপসারণ দাবি করে সিআইএ এবং তাঁকে রিজাইন করতে হয়।

সে যা হোক, আহমাদের আকস্মিক পদত্যাগকে তাঁর তরফ থেকে মুখ রক্ষার চেষ্টা হিসেবে ধরা যেতে পারে। বিভিন্ন মহল থেকে আইএসআই-এর ভূমিকা নিয়ে ফুল-স্কেল তদন্তের যে দাবি উঠেছিল, তার প্রেক্ষিতে কেউ কেউ পর্দার আড়ালে নীরবে রিজাইন করার পরামর্শ দিয়ে থাকতেও পারে। তিনিও দেরি না করে প্রতিষ্ঠানের রিশাফল বা পদ পুনর্বিন্যাসের কারণ দেখিয়ে রিজাইন করেন যাতে কোনো স্ক্যান্ডালের মুখোমুখি হতে না হয়। এর মাধ্যমে হাইজ্যাকার মোহাম্মদ আতার অ্যাকাউন্টে টাকা

BanglaBook.org

পাঠানো নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই যে ব্যাপক প্রচারের মুখে তাঁর পড়ার কথা ছিল, তা-ও এড়ানো গেছে। এদিকে সিআইএ এসব নিয়ে মুখ না খোলায় ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার সাথে নিশ্চিতভাবে জড়িত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন নীরবে সটকে পড়ার সুযোগ পেয়ে যান।

তবে জেনারেল আহমাদ যে কারণেই রিজাইন করে থাকুন না কেন, এর সবকিছুর পিছনে যে ইউএস সরকারের নোংরা চাল জড়িত আছে, ওয়াশিংটন যে পরোক্ষভাবে হলেও আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়েছে, তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তা না হলে যে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রধান আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলাকারীদের নগদ টাকার জোগান দিয়েছিলেন, তাঁকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় না করিয়ে নীরবে চলে যেতে দিত না সিআইএ। এতবড় একটা ঘটনার সাথে আইএসআই-এর জড়িত থাকার বিষয়টা বুশ প্রশাসন তদন্ত করে দেখতে রাজি হলো না, বিষয়টা অস্বস্তিকর।

আইএসআই ও ৯/১১-এর মধ্যে আরেক সম্ভাব্য যোগসূত্র হতে পারে খালিদ শেখ মোহাম্মদ। যাকে আমেরিকান সরকার ৯/১১-এর হামলার পিছনের মাথা বলে সনাক্ত করেছে। প্রোজেক্ট বোয়িনকার একজন পরিকল্পনাকারী, ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে এবং *ইউএসএস কোল*-এ বোমা হামলার জন্যও দায়ি করা হয় খালিদ শেখকে। বিভিন্ন সূত্রের খবর অনুযায়ী এই লোক ১৯৯৯ সালে মোহাম্মদ আতার হামবুর্গের অ্যাপার্টমেন্টে অনেকবার আসা-যাওয়া করেছে। আমরা জেনেছি, এনএসএ খালিদ শেখ ও মোহাম্মদ আতার টেলিফোন ইন্টারসেপ্ট করে নিশ্চিত হয়েছে ৯/১১-এর আগের দিন খালিদ শেখ হামলা চালানোর চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মোহাম্মদ আতাকে। এসব মোটামুটি সবাই জানে। যদিও এনএসএ দাবি করেছে যে তারা সেই ফোন কলে কি কি কথা হয়েছে দুজনের, তা ৯/১১-এর আগে অনুবাদ করেনি।

এখানে যে বিষয়টা নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি, তা হলো মোহাম্মদ নামে এক পাকিস্তানীর আইএসআই-এর সাথে সংযোগ। তার প্রসঙ্গ না ওঠার অন্যতম কারণগুলোর একটা হচ্ছে জোসেফ বোদানস্কি, দ্য কংগ্রেশনাল টাস্ক ফোর্স অন টেররিজম অ্যান্ড আনকনভেনশনাল ওয়ারফেয়ার-এর ডিরেক্টর। ২০০০ সালে বোদানস্কি বলেছিলেন যে মোহাম্মদ আইএসআই-এর সাথে এবং তাকে আড়াল করে রেখেছে আইএসআই।

যদি এ তথ্য সঠিক হয়, তাহলে ৯/১১-এর আগেরদিন মোহাম্মদ আতাকে আইএসআই এজেন্ট সাঈদ শেখ টাকা দিয়েছে এবং হামলা চালানোর চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে আরেক আইএসআই এজেন্ট, খালিদ শেখ মোহাম্মদ।

পরের কাহিনীতে আমরা জানতে পারব যে, সাঈদ শেখ আর খালিদ শেখ এর আগে আইএসআই-এর অন্য এক মিশনে ঘনিষ্ঠভাবে একযোগে কাজ করেছে।

BanglaBook.org

আইএসআই-এর জড়িত থাকার আরও প্রমাণ

৯/১১-এর অফিশিয়াল ব্যাখ্যার সমালোচকরা অভিযোগ তুলেছেন, সেই হামলায় জড়িত আইএসআই আর আল-কায়েদার অপারেটিভদের মধ্যে যে একটা যোগসূত্র আছে, আমেরিকান সরকার সেটা অফিশিয়ালি চাপা দিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল। তবে আইএসআই-এর আরও এক কাহিনী আছে, ৯/১১-কে বুঝতে হলে সেদিকে নজর দেয়া উচিত।

২০০১ সালের নভেম্বরে সাংবাদিক ক্রিস্টিয়ানা ল্যাম্ব পাকিস্তানে গিয়েছিলেন আইএসআই-এর সাথে তালেবানের কোনো যোগসূত্র আছে কি না তা খুঁজে দেখতে। কিন্তু আইএসআই তদন্ত চালানোর সুযোগ না দিয়ে মহিলাকে আটক করে এবং দেশ থেকে বের করে দেয়। জানুয়ারি ২০০২-এর শেষদিকের কথা। *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এর সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্ল *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ ছাপা হওয়া একটা খবরের সত্যতা যাচাই করতে পাকিস্তানে গিয়ে অপহৃত হন। তথ্যটা ছিল পাকিস্তানী এক চরমপন্থি গ্রুপের সাথে ব্রিটিশ সাংবাদিক রিচার্ড সি. রিড-এর সংযোগ আছে। এই লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়, জুতোর মধ্যে লুকিয়ে রাখা বোমা মেরে আমেরিকান এয়ারলাইনার উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল সে।

বোস্টন গ্লোব-এ একটা রিপোর্ট পড়েছিলেন ড্যানিয়েল পার্ল। যাতে সংশয় প্রকাশ করা হয় পাকিস্তানের গোঁড়া ইসলামী দল আল-ফুকরার সাথে সম্ভবত কোনো সংযোগ ছিল সাংবাদিক রিডের। তিনি হয়তো সেই দলের নেতা, আলি গিলানির সাথে দেখা করতে যাওয়ার পথে অপহরণের শিকার হন। জানা যায়, সাঈদ শেখ আর আইএসআই-এর সাথে জিলানির যোগাযোগ ছিল।

ওয়াশিংটন পোস্ট-এ ছাপা হওয়া সেই খবরের শেষ অংশে ছিল তথ্য অনুসন্ধানে গিয়ে তিনি হয়তো পাকিস্তানের সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির নিজস্ব এলাকায় ঢুকে পড়েছিলেন। তার আগে আমেরিকান প্রেস সন্দেহ করে পার্লের পরিণতির জন্য আইএসআই দায়ি। ওদিকে অপহরণকারীরা ড্যানিয়েল পার্লের মুক্তির বিনিময়ে যা দাবি করে, তা কোনো সাধারণ সন্ত্রাসী সংঠনের হতে পারে না বলে সবার ধারণা।

তাদের দাবি ছিল পাকিস্তানের কাছে এফ-১৬ ফাইটার প্লেন বিক্রি করতে আমেরিকাকে রাজি করাতে হবে। কিন্তু তার সাথে আরও যে সমস্ত দাবি জানানো হয়, তার সবই পাকিস্তান আর্মি ও আইএসআই-এর দাবি।

জানুয়ারির একেবারে শেষদিকে ইউপিআই-এর এক খবরে বলা হয়, ইউএস ইন্টেলিজেন্সের মতে পার্লের অপহরণকারীদের সাথে আইএসআই-এর যোগাযোগ আছে। এরপর সেই সাংবাদিকের প্রসঙ্গ আর তেমন ওঠেনি। এক সময় খবর পাওয়া যায় ড্যানিয়েল পার্লকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ-ও জানা যায়, আইএসআই এজেন্ট সাঈদ শেখ, যে ৯/১১-এর আগে মোহাম্মদ আতার অ্যাকাউন্টে ১ লাখ ডলার ট্রান্সফার করেছিল, তার হাত ছিল এই অপহরণের সাথে।

আইএসআই তাকে অপহরণ করে এক সপ্তাহ ধরে একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে

BanglaBook.org

রাখে। তারপর না সাঈদ শেখ, না আইএসআই, কেউ বলেনি সেই এক সপ্তাহ কি গেছে ড্যানিয়েল পার্লের ওপর দিয়ে। এরপর পাকিস্তানী পুলিশ পার্ল হত্যার দায় সাঈদ শেখের ঘাড়ে চাপায়। সাঈদ প্রথমে অভিযোগ স্বীকার করে, কিন্তু পরে যখন তার ফাঁসির আদেশ হয়, তখন আগের স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নেয়। এ নিয়ে থম্পসন প্রশ্ন করেন সেই 'হারানো এক সপ্তাহে' সাঈদ কি আইএসআই-এর সাথে কোনো চুক্তিতে আসার চেষ্টা করেছে যাতে তার হালকা সাজা হয়? পরে সেই চুক্তি ভেঙে গেছে?

সে যাই হোক, সাঈদ শেখের গ্রেপ্তার এবং পার্লকে হত্যা করার দায়ে তাকে অভিযুক্ত করার মাঝে কিছু কিছু সূত্রে প্রকাশ পেতে থাকে তার সাথে আল-কায়েদার যোগাযোগ আছে। কিছু সূত্র থেকে জানা যায় আইএসআই-এর সাথে তার যোগাযোগ আছে। আবার কোনো কোনো সূত্রে জানা যায় দুটোর সাথেই যোগাযোগ আছে। যদিও প্রতিটা সূত্রই শেষ পর্যন্ত নিজেদের দাবি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে ২০০২ সালের জুলাই মাসের শেষদিকে চূড়ান্তভাবে অভিযুক্ত করা হয় সাঈদ শেখকে।

সে সময় আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় এ খবর ছাপা হলেও কোনো পত্রিকায় সাঈদের আইএসআই বা আল-কায়েদার সাথে জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাই থম্পসন প্রশ্ন করেছেন সাঈদ শেখের কথা উঠলে অবধারিতভাবে আল-কায়েদা ও আইএসআই-এর কথা উঠে আসবে। সে প্রসঙ্গ তুললে ৯/১১-এর হামলার কথা উঠে আসবে বলেই কি মিডিয়া ভয়ে তার নাম মুখে আনল না?

একই প্রশ্ন করা যায় ড্যানিয়েল পার্ল কেসের আরেক অভিযুক্ত খালিদ শেখ মোহাম্মদের খবর নিয়েও। ১৯৯৭ সালে এক সাবেক সিআইএ এজেন্ট রবার্ট বায়েরকে কাতার-এর এক সাবেক পুলিশ চিফ বলেন, ফিলিপিনসের বোয়িনকা প্লট জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর মোহাম্মদ পালিয়ে গিয়েছিলেন। সেই মোহাম্মদ হচ্ছে বিন লাদেনের অন্যতম প্রধান এইড। এরপর বায়ের সাংবাদিক পার্লকে জানান মোহাম্মদের কথা। এবং পার্ল হয়তো ব্রিটিশ সাংবাদিক রিচার্ড সি. রিড-এর সাথে মোহাম্মদের কোনো সংযোগ আছে কি না খুঁজে দেখতে পাকিস্তানে গিয়ে সাঈদ শেখের খপ্পরে পড়েন।

পরে অবশ্য জানা যায় রিড কাজ করছিলেন মোহাম্মদের তত্ত্বাবধানে। ধারণা করা হয় তার অপহরণের পিছনে মোহাম্মদই ছিল নাটের গুরু। তারপর ২০০২ সালে আইএসআই-এর সাথে মোহাম্মদের যোগসূত্র আছে বলে দাবি করা জোসেফ বদানস্কি জানান, আইএসআই-এর সাথেও মোহাম্মদের যোগাযোগ আছে। তার নির্দেশেই সাংবাদিক পার্লকে হত্যা করা হয়েছে। এরপর ২০০৩ সালের অক্টোবরে আরেক রিপোর্টার, জন লুপকিন জানান, 'এখন ইউএস অফিশিয়ালদের হাতে তথ্য-প্রমাণ আছে, যাতে প্রমাণ হয় সাঈদ শেখ নয়, মোহাম্মদই সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লকে হত্যা করেছে। লুপকিনের রিপোর্টে অবশ্য আইএসআই সংযোগের কথা ছিল না।

তাতে বলা হয় একটা ইসলামিক মিলিট্যান্ট গ্রুপের নিউজ সংগ্রহ করছিলেন ড্যানিয়েল পার্ল। এবং মোহাম্মদ একমাত্র আল-কায়েদার সাথেই জড়িত ছিল। যাই হোক, যে খালেদ শেখ মোহাম্মদকে ৯/১১-এর পিছনের প্রধান মাথা ভাবা হয়, তাকেই শেষ পর্যন্ত পার্লের অপহরণ ও হত্যার জন্য দায়ি বলে মনে করা হতে থাকে। তাহলে

BanglaBook.org

এটা মনে করা নিশ্চয়ই অমূলক হবে না যে পার্ল সম্ভবত ৯/১১-এর সাথে খালেদ শেখ মোহাম্মদের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। এবং সে আইএসআই-এর সাথে জড়িত, এটা ফাঁস হলে সবাই নিশ্চিত হতে পারবে যে ৯/১১-এর সাথে আইএসআই জড়িত ছিল।

আইএসআই ও সাংবাদিকদের নিয়ে অপর এক খবর। ২০০২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানে নামকরা ইংরেজি দৈনিক, *নিউজ* পত্রিকায় এ সম্পর্কিত একটা খবর ছাপাতে বাধা দেয়ার অনেক চেষ্টা করে সরকার। কিন্তু ব্যর্থ হয়। খবরটা ছেপে দেয় *নিউজ*। সেটা ছিল আইএসআই-এর সাথে সাঈদ শেখের যোগাযোগ সম্পর্কে। সে খবরে সাঈদ স্বীকার করেছেন বলে দাবি করা হয় যে, ইনডিয়ান পার্লামেন্টে হামলার সাথে সে জড়িত ছিল।

আইএসআই সেই হামলার যাবতীয় খরচসহ, হামলার পরিকল্পনা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে তাকে সহায়তা করেছে। খবর ছাপা হওয়ার পর তার সাথে জড়িত চার সাংবাদিককে বরখাস্ত করার দাবি জানায় আইএসআই। তারপর *নিউজ*-এর সম্পাদককে নিঃশর্তভাবে ক্ষমাও চাইতে বলে। সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকরা চাকরি হারান এবং সম্পাদক দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। সেই বিখ্যাত খবরটির শিরোনাম ছিল There's Much More To Daniel Pearl's Murder Than Meets the Eye. বিষয়টা সেরকমই ছিল বটে।

আইএসআই-এর খবরটা লুকাতে চেষ্টা করার একাধিক কারণ ছিল। একজন আমেরিকান সাংবাদিককে আইএসআই-এর এজেন্ট অপহরণ করেছে এবং হত্যা করেছে, যে এজেন্ট ৯/১১-এর ঠিক আগে আল-কায়েদার মোহাম্মদ আতার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১ লাখ ডলার পাঠিয়েছে। *নিউজ*-এ ছাপা হওয়া খবরকে কেন্দ্র করে হয়তো কেউ ভাবতে পারে, এর ফলে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি সাঈদকে নিজেদের দেশে নিয়ে জেরা করতে উৎসাহী হয়ে উঠতে পারে। যেমন *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকায় লেখা হয় 'এই হরর ভর্তি ঘরটা (আইএসআই) ভেঙে পড়ার অপেক্ষায় আছে। সাঈদের পেটে অনেক গল্প জমে আছে।'

২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে *টাইম* ম্যাগজিনে একটা রিপোর্ট ছাপা হয়। তাতে বলা হয়, তালেবান অফিশিয়ালদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা, হাজী আব্দুল সামাত খাকসার কয়েক মাস থেকে আমেরিকার জেলে বন্দি অবস্থায় আছেন। এখনও তার সাথে সিআইএ কথা বলেনি। যদিও হাজী খাকসার নিজে থেকেই বুশ প্রশাসনকে জানিয়েছেন যে তালেবান ও আল-কায়েদার মধ্যে এখনও অনেক আইএসআই এজেন্ট ঢুকে আছে।

এর কয়েক মাস পর *ইনডিয়ান এক্সপ্রেস* বিস্ময় প্রকাশ করে বলে সাঈদ শেখ এখনও পাকিস্তানের কারাগারে বসে আছে কেন? আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো তাকে আর খাকসারকে এখনও জেরা করছে না কেন? এর জবাবে প্রশাসনের অফিশিয়াল ব্যাখ্যার সমালোচকরা বলেছেন, তাদের পেটে যে তথ্য আছে, ওরা তা অনেক আগেই হজম করে বসে আছে। এজেন্সিগুলো জানে, উগরানোর মত নতুন আর কোনো তথ্য নেই তাদের পেটে।

BanglaBook.org

২০০২ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেট কলিন পাওয়েল ঘোষণা করেন, পার্ল হত্যার সাথে আইএসআই-এর 'এলিমেন্টদের' কোনো হাত ছিল বলে প্রমাণিত হয়নি। এরপর *গার্ডিয়ান* পত্রিকা মন্তব্য করে, 'পাওয়েলের এই মন্তব্য শকিং।'

অবশ্য এর ক'দিন পর আমেরিকার অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাশক্রফট সাঈদের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল চার্জ অভিযোগের কথা ঘোষণা করেন। তাতে যদিও ৯/১১-এর আগে পাঠানো টাকার উল্লেখ ছিল না। এতেই বোঝা যায় সরকার আইএসআই-এর জড়িত থাকার বিষয়টা প্রকাশ করতে নারাজ। এর সাথে ১৯৯৯ সালের আরেক বিস্ময়কর ঘটনাও আছে। সেটা এরকম র‍্যানডি গ্লাস নামে আমেরিকার এক গোয়েন্দা এক ডিনার পার্টিতে উপস্থিত কিছু লোকের বিশেষ কিছু কথাবার্তা রেকর্ড করে। পার্টিটা হয় ১৪ জুলাই, ১৯৯৯।

পাশের টেবিলে কাস্টমারের বেশে এফবিআই-এর এক এজেন্ট বসা ছিল। সেখান থেকে ডাব্লিউটিসি ভবন দেখা যায়। এজেন্ট যাদের ওপর নজর রাখছিল, তারা সবাই আর্মস ডিলার। তাদের সাথে আইএসআই-এর রাজা গোলাম আব্বাস নামে একজন ছিল। আব্বাস বলছিল, সে বিন লাদেনের জন্য এক জাহাজ চোরাই আমেরিকান অস্ত্র কিনতে আগ্রহী। তারপর সে টুইন টাওয়ার ইঙ্গিত করে বলে, ওগুলো আর দাঁড়িয়ে থাকবে না। ২০০২ সালে জুন মাসে আব্বাস সেই অস্ত্র কেনার জন্য প্রস্তুতও ছিল। কিন্তু ২০০৩ সালের মার্চে যখন অভিযোগ দাখিল করা হয়, তখন সেসবের কিছুরই উল্লেখ ছিল না।

যদি এই গল্পের কিছু অংশও সত্যি হয়, তাহলে বুঝতে হবে টাওয়ারে হামলা চালানোর পরিকল্পনা অনেক আগেই হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট বুশ ক্ষমতায় বসার বেশ আগে। এমনকি ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরেরও আগে—যখন *দ্য প্রজেক্ট ফর দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি* প্রকাশিত হয়, যার মেনিফেস্টোয় 'নতুন পার্ল হারবার' ঘটলে কি কি সুবিধা হবে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিল।

তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ৯/১১-এর পরিকল্পনা করার সাথে আইএসআই-এর জড়িত থাকার বিষয়টা আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার সাথে একটা কৌতূহলোদ্দীপক উপসংহারেও পৌঁছানো যায়, তা হলো বুশ প্রশাসন ৯/১১-এর কাহিনীতে আইএসআই-এর সংশ্লিষ্টতার গন্ধও যাতে না থাকে, তা নিশ্চিত করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি।

BanglaBook.org

ফ্লাইট স্কুল ইনভেস্টিগেশন

৯/১১-এর হামলা সম্পর্কে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর এফবিআই চারদিন আগে প্রকাশ করেছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ গা করেনি। সেটা হলো, অভিযুক্ত হাইজ্যাকারদের অনেকে আমেরিকান মিলিটারি ইন্সটলেশন থেকে ফ্লাইট ট্রেইনিং নিয়েছে। এসব

ইন্সটলেশনের একটা হচ্ছে পেনসাকোলা নেভাল এয়ার স্টেশন, সান অ্যান্টোনিওর ব্রুকস এয়ার ফোর্স বেস, আলাবামার ম্যাক্সওয়েল এয়ার ফোর্স বেজ এবং মন্টেরি, ক্যালিফোর্নিয়ার ডিফেন্স ল্যাঙ্গোয়েজ ইন্সটিটিউট। তাদের তিনজনের ড্রাইভিং লাইসেন্সে স্থায়ী ঠিকানা হিসেবেও পেনসাকোলা স্টেশনের কথা লেখা আছে। এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে এয়ার ফোর্সের এক মুখপাত্র বলেন, 'নাম এক শোনালেও তারা বোধহয় এক না।'

এক টিভি প্রডিউসার, লেখক এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিক ড্যানিয়েল হপসিকার জানান, তিনি এয়ার ফোর্সের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অফিসে এক মেজরকে এ নিয়ে জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি বলে, 'বায়োগ্রাফিক্যালি তারা একই মানুষ না। তাদের কারও কারও বয়স সত্যিকারের টেররিস্টদের চেয়ে বিশ বছরেরও বেশি।' হপসিকার বলেন, তিনি কেবল মোহাম্মদ আতার ব্যাপারে আগ্রহী। 'ম্যাক্সওয়েল এয়ার ফোর্স বেজের ইন্টারন্যাশনাল অফিসার্স স্কুলে ফ্লাইট ট্রেইনিং নেয়া মোহাম্মদ আতা। তার বয়সও কি ওইরকম বেশি?' প্রশ্ন করেন তিনি। মেয়েটি জবাব দিতে না পেরে আমতা আমতা করতে থাকে।

হপসিকার মেজরকে বলেন, আমাকে মোহাম্মদ আতা সম্পর্কে ইনফর্মেশন দিন, আমি তার সাথে যোগাযোগ করব। মেজর জবাব দেয়, সে মনে করে না এ ব্যাপারে কোনো তথ্য তাকে (হপসিকারকে) দেয়া সম্ভব হবে। ১৬ সেপ্টেম্বর কিছু রিপোর্টে জানা যায়, আতা এবং তার সঙ্গী হিসেবে যে ইউএস মিলিটারি স্কুলে ফ্লাইং শিখেছে বলে রিপোর্ট বেরিয়েছে, তাদের বয়স বা কে কোন দেশের নাগরিক বা আর কোনো বর্ণনা, ইত্যাদি কিছুই প্রকাশ করা হবে না। এ বিষয়ে জানতে এসে এমনকি ইউএস সিনেটরদের অনেকে পর্যন্ত দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছেন।

ফ্লোরিডার সিনেটর যখন জানতে পারেন পেনসাকোলায় নেভাল স্টেশনে তিনজন হাইজ্যাকার ট্রেইনিং নিয়েছে, তখন অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাশক্রফটকে চিঠি লেখেন তিনি। জানতে চান, কথাটা সত্যি কি না। হপসিকার জানিয়েছেন, সিনেটরের মুখপাত্রকে এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমরা এ প্রশ্নের সুনিশ্চিত জবাব কখনই পাইনি। পরে আমরা এফবিআইকে জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছে, তারা এসবের জবাব বের করার চেষ্টায় আছে। বিষয়টা 'কম্প্লিকেটেড অ্যান্ড ডিফিকাল্ট।'

অক্টোবরের ১০ তারিখ এই 'কম্প্লিকেটেড অ্যান্ড ডিফিকাল্ট' সমস্যার সাথে আরও অনেক 'কম্প্লিকেটেড অ্যান্ড ডিফিকাল্ট' সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে বিপাকে পড়েন এফবিআই প্রধান, মুলার। ঘোষণা করেন ৯/১১ প্রশ্নে মাসব্যাপী তদন্ত শুরু করতে যাচ্ছে তাঁর সংস্থা। দাবি করেন সে তদন্ত হবে 'এফবিআই এর ইতিহাসের সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত এখন এগিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে।'

অফিশিয়ালরা তার বোলচাল শুনে বলেন, মুলারের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর এজেন্টরা এতদিনে ৯/১১-এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে।

BanglaBook.org

ওয়াশিংটন পোস্ট-এর এক খবর অনুযায়ী মুলার নাকি বলেছেন, 'খবর বেরিয়েছে হাইজ্যাকারদের কয়েকজন নাকি এ দেশেই ফ্লাইট ট্রেইনিং নিয়েছে। আমরা সেসব খবর যাচাই করে দেখতে লোক লাগিয়েছি।'

সমালোচকরা তাঁর এ বক্তব্যের জবাবে বলেন, আগে এসব তদন্ত করতে রাজি না হয়ে বিষয়টাকে শুধু ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টাই করেনি এফবিআই, বরং হাইজ্যাকাররা যে ফ্লোরিডার ভেনিসের দুটো স্কুলে ট্রেইনিং নিয়েছে, সে তথ্যও পুরোপুরি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। অনুসন্ধানী রিপোর্টার হপসিকার জানিয়েছেন, ওই স্কুলের ছাত্রদের অনেকেই বলেছে ৯/১১-এর হামলার আঠারো ঘণ্টা পর, রাত দুটোর দিকে এফবিআই এজেন্টরা সেই দুই স্কুলে হানা দিয়ে সেই 'ছাত্রদের' ফাইলপত্র নিয়ে গেছে।

এই ঘটনা ও পেন্টাগনের মেইন গেটের গ্যাস স্টেশনের সিকিউরিটি ক্যামেরা থেকে এফবিআই-এর ফিল্ম কেড়ে নেয়া, এই দুই ঘটনা থেকে প্রমাণ হতে আর বাকি থাকে না যে, সংস্থাটি আগে থেকেই জানত কি ঘটতে যাচ্ছে।

ওমর আল-বেইউমিকে দ্রুত ছেড়ে দেয়া

তদন্তের ক্ষেত্রে একটা সত্য সমালোচকদের কাছে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। তা হলো, হাইজ্যাকারদের সাথে বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই, এমন অনেককে ধরে দীর্ঘ সময় হাজতে আটকে রাখা হয়েছে। আর যাদের সাথে স্পষ্ট বোঝা গেছে যে হাইজ্যাকারদের সম্পর্ক আছে, তাদের কাউকে ধরা হলেও খুব তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয়া হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে পল থম্পসনের একটা পুরনো রিপোর্টের দৃষ্টান্ত টানা যেতে পারে।

৯/১১-এর দুই হাইজ্যাকার, নাওয়াজ আলহাজমি ও খালিদ আলমিধার ১৯৯৯ সালে যখন প্রথম আমেরিকায় পা রাখে, তখন লস অ্যাঞ্জেলিসের এয়ার পোর্টে তাদেরকে রিসিভ করে ওমর আল-বেইউমি নামে এক সউদি নাগরিক। তাদেরকে সে গাড়িতে করে সান ডিয়েগো পৌঁছে দেয় এবং একটা অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থাও করে দেয়। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতেও সাহায্য করে। তারপর ইনশিওরেন্স করা, সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড পাইয়ে দেয়া এবং ফ্লোরিডা ফ্লাইট স্কুলে ভর্তি করে দেয়া, সবই করে দেয় ওমর আল-বেইউমি।

পরে কংগ্রেশনাল যৌথ তদন্ত কমিটি জানতে পারে, সান ডিয়েগোতে এফবিআই-এর অন্যতম সেরা সোর্স তার সংস্থাকে জানিয়েছিল যে, সে ভেবেছিল 'ওমর আল-বেইউমি নিশ্চয়ই সউদি ইন্টেলিজেন্স অফিসার হবে।' বড় বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে কারবার করত লোকটা। ৯/১১-এর দু' মাস আগে ইংল্যান্ডে চলে যায় সে। এবং ৯/১১-এর পর এফবিআই-এর সাথে একজোট হয়ে কাজ করতে থাকা ব্রিটিশ এজেন্টের হাতে ধরা পড়ে। পরে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আল-বেইউমি

BanglaBook.org

এফবিআইকে জানায়, আলহাজমি ও আলমিধারের সাথে তার পরিচয় হয়েছে বাই চান্স। এক সপ্তাহ পর এফবিআই কোনো অভিযোগ না এনে আল-বেইউমিকে ছেড়ে দেয়ায় রেগে যায় সেই ইংরেজ এজেন্ট।

থম্পসন বলেন '৯/১১-এর পর শত শত মুসলমানকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আমেরিকায়। বিনা কারণে আটকে রাখা হয়েছে। যাদের অনেকের সাথে সন্ত্রাসের কোনো সংশ্রবই ছিল না। সেই তুলনায় আল-বেইউমিকে এভাবে দ্রুত ছেড়ে দেয়ার ঘটনা একটা রেকর্ড হয়ে রইল।'

এনএসএ-র কিছু লুকানোর চেষ্টা?

২০০১-এর অক্টোবর মাসের শেষদিকে *বোস্টন গ্লোব*-এ ছাপা হয়, কিছু সরকারী ইন্টেলিজেন্স অফিশিয়াল ভীষণ ক্ষেপে গেছে। কারণ, তারা জানতে পেরেছে ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা তদন্তের অনেক আলামত ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি (এনএসএ) ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা আরও দাবি করে, তদন্তের সম্ভাব্য সূত্র তারা অনুসরণ করতে পারেনি এনএসএ উপযুক্ত সহযোগিতা করেনি বলে। এখানে থম্পসনের সরবরাহ করা এরকম একটা খবর তুলে ধরা হলো।

অনুসন্ধানী রিপোর্টার জেমস বামফোর্ড জানান, হামলার সাথে জড়িত হাইজ্যাকার; যারা ওয়াশিংটন থেকে ফ্লাইট ৭৭-এ ওঠে বলে পরে সনাক্ত করা হয়, তাদের অন্তত ছয়জন আগস্ট মাস থেকে ৯/১১ পর্যন্ত তাদের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের প্রতিটা কাজ করেছে লরেল, মেরিল্যান্ডে বসে। যেটা এনএসএ-র জন্মস্থান বলে পরিচিত। তারা মানে এই ছয়জন হাইজ্যাকার এনএসএ-র কর্মচারীদের মাঝে থেকে ৯/১১-এর প্লট তৈরি করেছে।

এটা খাঁটি দৈব-সংযোগও হতে পারে। তবে এনএসএ অফিশিয়ালরা তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে কি না, সে ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

জাকারিয়া মুসাওইর আরও খবর

২০০২ সালের ২ জুলাই জাকারিয়া মুসাওইর মোশন ফেডারাল কোর্টে খোলা হয়। তাতে দাবি করা হয়, আমেরিকা সরকার চাইছিল ৯/১১-এর হামলা যেন প্রতিহত করা না হয়। মুসাওই আভাস দেন গ্র্যান্ড জুরি ও কংগ্রেস, উভয়ের সামনে এ ব্যাপারে সাক্ষী দিতে রাজি আছেন। এরপর তিনি আর কিছু বলেছেন কিনা, তা প্রকাশ করা হয়নি।

২০০২ এর সেপ্টেম্বরে অনুসন্ধানী সাংবাদিক সেইমুর হারশ জানতে পারেন, আগের বছর নভেম্বরে জাকারিয়া মুসাওই আটক হওয়ার পর থেকে ফেডারাল প্রসিকিউটররা তার প্লি বার্গেইন (plea bargain) বা অভিযুক্ত ব্যক্তির কৈফিয়ৎ নিয়ে

BanglaBook.org

আলোচনা করেননি। হারশ জানান, এ ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার কারণে মুসাওইর আইনজীবীরা এবং এফবিআই-এর অফিশিয়ালরা রীতিমত হতভম্ব। তিনি বলেন, এ কথা শুনে এক ফেডারাল লইয়ার বলেছেন, 'আমি এমন ষড়যন্ত্র মামলা আর দেখিনি যাতে অভিযুক্তের কাছ থেকে তথ্য আদায় করতে সরকার এত অনাগ্রহ দেখিয়েছে, বা ষড়যন্ত্রের ভেতরে আরও কিছু আছে কি না, তা জানার চেষ্টামাত্র না করে বসে থেকেছে।

জুলাই, ২০০৩। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস পরিবেশিত এক খবরে বলা হয় কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে সোমবার জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, জাকারিয়া মুসাওইকে শনাক্ত করতে কোনো আল-কায়েদা সাক্ষীকে কোর্টে হাজির করা হবে না। যদিও প্রসিকিউটররা ভালো করেই জানতেন, এর অর্থ হতে পারে লোকটার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খালাস হয়ে যাওয়া। ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপারে উত্থিত একমাত্র মামলা যদি ডিস্ট্রিক্ট জাজ লিওনি ব্রিনকেমা বাতিল করে দেন, তাহলে সেটাকে মিলিটারি ট্রাইবুনালে স্থানান্তর করা যেতে পারে...

সরকার জানায়, এই আপত্তির কারণে ১১ সেপ্টেম্বরের সন্দেহভাজন সংগঠক রামজি বিনালশিবকে আর আটকে রাখা যায় না। জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট তার সিদ্ধান্তে বলে, আর কোনো উপায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা না গেলে কোর্ট এই অভিযোগ বাতিল করে দিতে বাধ্য। ব্রিনকেমা রায় দেন, নিজেই নিজের প্রতিনিধিত্বকারী মুসাওইকে স্যাটেলাইট হুকআপের মাধ্যমে বিনালশিবকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ দেয়া উচিত।

এই দু'জনের কথাবার্তা রেকর্ড করে জুরিদের শোনানো যেতে পারে, যদি এ মামলা কোর্টে গড়ায়। যদিও সরকার মুসাওই-বিনালশিবের মধ্যে এ ধরনের কথাবার্তা হতে না দেয়ার প্রশ্নে অঙ্গীকারাবদ্ধ

সরকার সোমবার জানায়, ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে স্বীকার করে নেয়া এবং অনুশোচনাহীন এক সন্ত্রাসীকে তার দুষ্কর্মের সহযোগী আল-কায়েদা সদস্যকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হবে অননুমোদিত, ক্লাসিফাইড তথ্য জানাজানি হওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া। এই নাটক সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়; যে কেবল অভিযুক্তের বিচার নিষ্পন্ন করার দায়িত্বই বহন করে না, বরং এ দেশের কয়েক হাজার নিরীহ সাধারণ নাগরিকের হত্যাকারী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় জাতীয় নিরাপত্তার দায়িত্বও পালন করে চলেছে।

সমালোচকদের মতে এসব ঘটনাই বলে দেয়, জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের প্রধান কাজ ছিল ৯/১১-এর দিন কি ঘটেছে তা বের করা নয়, 'দ্য টুয়েন্টিয়েথ হাইজ্যাকার' বা বিশতম হাইজ্যাকার নামে পরিচিত মানুষটির বিচার করাও নয়, বরং নিশ্চিত করা যেন সে মানুষের সামনে মুখ বন্ধ রাখে।

BanglaBook.org

শাস্তির বদলে পদোন্নতি

৯/১১-এর হামলা ঠেকাতে না পারার দুটো বড় থিয়োরি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তার একটা হচ্ছে দুষ্কর্মে সহযোগিতা, অন্যটা উপযুক্ত যোগ্যতার অভাব। ব্যারি জুইকারের মতে, 'অযোগ্যতা স্বভাবতই কঠোর তিরস্কার অর্জন করে।' কাজেই অযোগ্যদের ভাগ্যে কঠোর তিরস্কার যদি না-ই জোটে, তাহলে সমালোচকদের চোখে অযোগ্যতার থিয়োরি দুর্বল হয়ে পড়ে।

এর উদাহরণ হিসেবে থম্পসন কিছু নমুনা হাজির করেছেন। ৯/১১-এর পরের এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সিআইএ, এনএসএ আর এফবিআই-এর ডিরেক্টররা সবাই কংগ্রেশনাল কমিটির সামনে স্বীকার করে এসেছেন, তাদের কোনো কর্মচারীকে সেদিনকার ভুল-ভ্রান্তির জন্য চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়নি বা কোনো ধরনের সাজাও দেয়া হয়নি।

থম্পসন বলছেন, কয়েকজনকে বরং পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। তাদের একজন হলো ম্যারিয়ন 'স্পাইক' বোম্যান। এফবিআই হেডকোয়ার্টার্সের সেই এজেন্ট, যে মিনিয়াপোলিসের এফবিআই এজেন্টদের জাকারিয়া মুসাওইর ল্যাপটপ পরীক্ষা করার জন্য সার্চ ওয়ারেন্ট ইসু করতে রাজি হয়নি, ২০০২ সালের ডিসেম্বরে সংস্থার 'এক্সেপশনাল পারফরমেন্স' পুরস্কার দেয়া হয় তাকে। এটা দেয়া হয় কংগ্রেশনাল রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর।

সেটায় বলা হয় বোম্যানের আরএফইউ ইউনিট মিনিয়াপোলিস এফবিআই এজেন্টকে 'ইনএক্সকিউজেবল কনফিউজড্ অ্যান্ড ইনঅ্যাকিউরেট ইনফর্মেশন সরবরাহ করেছে। যা প্যাটেন্টলি ফলস।' ক্ষমার অযোগ্য বিভ্রান্তিকর ও বেঠিক তথ্য সরবরাহ করেছে, যা ছিল স্পষ্টতই ভুয়া ছিল।

জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের এক সাবেক অফিশিয়াল বলেন, এফবিআই ডিরেক্টর মুলারও পদোন্নতি পেয়েছিলেন। কাজেই সমালোচকদের মতে ৯/১১ বুশ প্রশাসনের কোনো ব্যর্থতা ছিল না, ছিল বরং দর্শনীয় এক সাফল্য।

***

এই অধ্যায়ে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো, তাতে প্রমাণ হয়, বুশ প্রশাসনের অফিশিয়াল ব্যাখ্যা কেবল মিথ্যাই নয়, বরং অফিশিয়াল দুষ্কর্মের যে অভিযোগ উঠেছিল, সেটাই সত্যি। একটা বিষয় তো প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমেরিকান সৈন্যরা বিন লাদেনকে ধরার চেষ্টাই করেনি। আর বিন লাদেনের ব্যাপারটায় প্রমাণ হয়, আমেরিকার সাথে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এখনও শেষ হয়নি। এই অধ্যায়ে ৯/১১-এর সাথে আমেরিকার যে সমস্ত সরকারী ইনস্টিটিউশনের জড়িত থাকার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে এসবের সাথে

BanglaBook.org

সিআইএ পর্যন্ত জড়িত আছে।

এই অধ্যায়ে হোয়াইট হাউজের অন্তত একটা দুষ্কর্মের কথা প্রমাণ হয়েছে। তা হলো, এসবের সাথে আইএসআই ও সিআইএ-র সংযোগ ধামাচাপা দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে হোয়াইট হাউজ।

পরিশেষে বলতে হয়, হোয়াইট হাউজের ৯/১১-এর পরিকল্পনার সাথে জড়িত থাকার বিষয়টা যদি সত্যি হয়, ১৯৯৯ সালে কোনো আইএসআই এজেন্ট সত্যিই যদি ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে যে ডাব্লিউটিসি টাওয়ার আর দাঁড়িয়ে থাকবে না, তাহলে বুঝতে হবে এ পরিকল্পনা প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ ক্ষমতায় বসার অনেক আগেই করা হয়েছিল।

তিনি যদি এসবের সাথে জড়িত হয়েও থাকেন, তাহলে সম্ভবত মৌলিক পরিকল্পনা করার পরই বিষয়টা তাঁর সামনে উত্থাপন করা হয়েছিল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তৃতীয় খণ্ড

উপসংহার

লাভ কার হলো?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

৯/১১ সফল হলো কিভাবে?

৯/১১-এর অফিশিয়াল ব্যাখ্যার যারা সমালোচক, তাদের বিশ্বাস সেদিনের ঘটে যাওয়া সব কিছুই এ বিষয়ে লেখা থিয়েরি মেইসানের প্রথম বইয়ের নাম অনুসারে *এ বিগ লাই*। এই সমালোচকরা কেবল সমালোচকই নন, সংশোধনবাদীও বটে। তারা নাফিজ আহমেদের কথা অনুযায়ী বিশ্বাস করেন, '১২ সেপ্টেম্বর ২০০১-এর ঘটনা ও রেকর্ড থেকে ব্যাখ্যা যা দাঁড়ায়, তাতে ঘটনার দায়-দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে ইউএস স্টেটের ওপরেই বর্তায় বলে আঙুল নির্দেশ করে।'

এ পরিস্থিতিতে আমেরিকানদের সামনে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, সেটা হলো তারা সংশোধনবাদীদের এই সার্বিক যুক্তি ও বিতর্ককে রাষ্ট্রের দুষ্কর্মের প্রমাণ হিসেবে পর্যাপ্ত বলে ধরে নেবেন, নাকি সম্পূর্ণটাকে অস্বস্তিকর হিসেবে পর্যাপ্ত বলে বিবেচনায় নিয়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্তের কাজ শুরু করবেন?

কে লাভবান হলো?

সমস্ত বিবেচনার কেন্দ্রে আছে, সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে কিছু কিছু সন্দেহজনক প্রতিষ্ঠান অকল্পনীয় মুনাফা লুটে নিয়েছে বলে সমালোচকদের ধারণা এবং এসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য কিছু অফিশিয়াল দুষ্কর্ম। স্বাধীন গবেষক নাফিজ আহমেদ এ আলোচনা শুরু করছেন অনুসন্ধানী সাংবাদিক, প্যাট্রিক মার্টিনের এক বিবৃতি উদ্ধৃত করার মাধ্যমে। সেটা এরকম প্রশ্ন করাটা অযৌক্তিক হবে না যে, এই ভয়াবহ ট্রাজেডি থেকে কে লাভবান হয়েছে?

৯/১১-এর বেলায় এ প্রশ্নের জবাবটা হলো একদিকে লাভবান হয়েছে বুশ প্রশাসন, পেন্টাগন, সিআইএ আর এফবিআই, অন্যদিকে আমেরিকান অস্ত্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান এবং তেল ইন্ডাস্ট্রিগুলো লাভবান হয়েছে। প্রশ্ন তোলা যায় এত ভয়াবহ, এত বেদনাদায়ক এক ট্রাজেডির বিনিময়ে একটি গোষ্ঠীর এই যে অপরিসীম মুনাফা হলো, তা বিনা বাধায় ঘটাতে সেই গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো কোনোভাবে এই

BanglaBook.org

ধ্বংসযজ্ঞে অংশ নিয়েছে কি না। এসবের মধ্যে তাদের কোনো ভূমিকা ছিল কি না।

ভেতরের দিকে একটু নজর বোলানো যাক। সিআইএ ডিরেক্টর জর্জ টেনেট চেয়েছেন প্রশাসনের অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় ফান্ড। কারণ তাঁকে পৃথিবীর যেখানে প্রয়োজন সেখানেই গোপন সামরিক মিশনের বিস্তৃতি ঘটাতে হবে। বব উডওয়ার্ড তার রিপোর্টে বলেছেন, টেনেটের মিশনের নাম Worldwide Attack Matrix (ওয়ার্ল্ডওয়াইড অ্যাটাক ম্যাট্রিক্স)। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্বের ৮০ টি দেশের কোনো কোনোটায় সিআইএ-র গোপন ওয়ার্ল্ডওয়াইড অ্যাটাক ম্যাট্রিক্স চলছে, কোনোটায় বা শুরু হতে যাচ্ছে।

৯/১১-এর চারদিন আগে ক্যাম্প ডেভিডে বসে প্রেসিডেন্ট বুশের অনুমোদন পেয়েছেন জর্জ টেনেট। থিয়েরি মেইসান জানান, অনুমোদন চাওয়ার কিছু সময় পরই ওয়াশিংটন থেকে সিআইএ-র ফান্ড ৪২ শতাংশ বাড়ানো হয় যাতে বিশ্বব্যাপী অ্যাটাক ম্যাট্রিক্স সফলভাবে চলতে পারে।

এবার পেন্টাগন আর অস্ত্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রসঙ্গ। প্রেসিডেন্ট বুশের দৃঢ় ঘোষণা ছিল, আমেরিকান সৈন্য বাহিনীর লড়াই করার ক্ষমতা আরও অনেক বেশি বাড়াতে হবে। যাতে এই ওয়ার্ল্ডওয়াইড যুদ্ধে 'যে কোনো মূল্যে' তারা জয়ী হতে পারে। কাজেই সে জন্য সামরিক বাহিনীর বাজেট স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী প্রায় দুই দশক সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাড়াতে আগ্রহী ছিলেন তিনি। কিন্তু ৯/১১ না ঘটলে এতবড় ব্যয় বৃদ্ধি সম্ভব হতো কি না, তা নিয়ে গভীর সন্দেহ আছে।

এ প্রসঙ্গে ফিলিস বেনিস বলেন ২০০২ সালের জন্য পেন্টাগন বাজেটের সাথে বাড়তি ৪৮ বিলিয়ন ডলার অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল বুশ প্রশাসন। বাড়তি এই টাকাটাই অনেক দেশ তার সারা বছরের সামরিক বাজেটে বরাদ্দ করে না। বিশ্বের পরিবেশ শান্ত, নিরুত্তাপ থাকলে কংগ্রেস হয়তো ভাবত আমেরিকা এমনিতেই অনেক বেশি খরচ করছে সামরিক খাতে। তা আরও বাড়ানোর কোনো যুক্তি নেই।

৯/১১-এর হামলাকে ঘটতে দেয়া হয়েছে বিশেষ করে স্পেস ফোর্স খাতে খরচ বাড়ানোর জন্য। ডোনাল্ড রামসফেল্ড, জেনারেল এবারহার্ট এবং জেনারেল মেয়ার্সের পরামর্শে। তাদের 'মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমই' সম্ভবত এ ঘটনা থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে। ২০০১ সালের জুলাই মাসে চালানো এক জনমত জরিপে এর পক্ষে মত দেয় ৫৩ শতাংশ মানুষ। অক্টোবরের ২১ তারিখের আরেক জরিপে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭০ শতাংশে।

নাফিস আহমেদ মনে করিয়ে দিচ্ছেন, ৯/১১-এর আগে আমেরিকান সরকার নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত ছিল। দেশবাসীদের অনেকেরই জানা ছিল প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিলেন। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে অর্থনৈতিক মন্দা বেড়ে চলছিল দেশে। পররাষ্ট্র নীতির কারণে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে শুরু করেছিল বুশ প্রশাসন।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে অন্যান্য আন্তর্জাতিক বডিতে প্রস্তাব পেশ করার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হচ্ছিল আমেরিকা। গ্লোবালাইজেশন বিরোধী বড় বড়

BanglaBook.org

সমাবেশ চলছিল। বুশের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা, দুটোই আশঙ্কাজনকভাবে নিম্নমুখী হয়ে পড়ছিল। তাই সম্ভবত হাউজে আগে থেকে বিদ্যমান অস্বস্তিকর ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হুমকির মুখে পড়ে যায় বুশ প্রশাসনের। ঠিকমতো কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। দেশ ২০০২ সালে মিডটার্ম নির্বাচনের দিকে যাচ্ছিল সম্ভবত।

ফলে জিগনিউ ব্রেজেজিনস্কির *দ্য গ্রেট চেজবোর্ড* বইয়ে উল্লেখ করা স্ট্রাটেজিক ও মিলিটারি বা কৌশলগত ও সামরিক পরিকল্পনা এগিয়ে নেয়াও সম্ভব হচ্ছিল না বুশের পক্ষে। তাই ৯/১১-এর মতো ঘটনা ঘটিয়ে হতভম্ব, স্তম্ভিত জনসাধারণের আবেগকে কাজে লাগায় বুশ প্রশাসন, তার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায় এবং সরকার রাতারাতিই সাফল্যের সাথে তার বৈধতার সংকট কাটিয়ে ওঠে। এই কৌশলগত ও সামরিক পরিকল্পনা এগিয়ে নেয়ার জন্য বুশ প্রশাসন মনে হয় তলে তলে ভালোই প্রস্তুত ছিল। নন-স্টেট টেররিস্টদের হামলাকে অজুহাত বানিয়ে কিছু কিছু স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য মুখিয়ে ছিল।

৯/১১-এর দিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট বুশ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন 'যে সমস্ত সন্ত্রাসী এই হামলা চালিয়েছে এবং যারা তাদেরকে লালন-পালন করেছে, তাদের কাউকে আমরা আলাদা করে দেখব না।' তারপর, এই বইয়ের পরিচিতিতে যেমন বলেছি, জর্জ বুশের ভাষণ শেষ হতে না হতেই আমেরিকার এক সময়কার পররাষ্ট্র মন্ত্রি হেনরি কিসিঞ্জার ইন্টারনেটে তাঁর মন্তব্য পাবলিশ করেন। তাতে তিনি বুশের 'কাউকে আমরা আলাদা করে দেখব না' কথাটাকে সমর্থন করে বলেন, 'সবাই আশা করে পার্ল হারবার আক্রমণের ঘটনা যেভাবে শেষ হয়েছিল, এই ব্যাপারেও সরকারকে সেইরকম প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে এবং যে সমস্ত ব্যবস্থা (সিস্টেম) এ জন্য দায়ি, তাদেরকেও ধ্বংস করতে হবে। এ ব্যবস্থা হচ্ছে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর একটা নেটওয়ার্ক, যেগুলো নির্দিষ্ট কিছু দেশের রাজধানীতে আশ্রয় নিয়ে আছে। এ ধরনের আক্রমণ চালাতে সক্ষম সন্ত্রাসীদের যে সব সরকার আশ্রয় দেয়, এই হামলার সাথে তারা জড়িত আছে কি নেই প্রমাণ করা না গেলেও এই বাড়াবাড়ির মূল্য তাদেরকেও দিতে হবে।'

ঘটনার এক সপ্তাহ পর রিচার্ড পার্লে এক বিশেষ সম্পাদকীয় লেখেন State Sponsors of Terrorism Should Be Wiped Out Too বা সন্ত্রাস লালনকারী দেশকেও মুছে ফেলতে হবে শিরোনামে। পার্লে তাতে বলেন যে সব দেশ সন্ত্রাসীদের লালন করে; যাদের সরবরাহ করা পদ্ধতি নিরীহ মানুষের জীবন কেড়ে নেয়, তাদেরকেও ধ্বংস করে দেয়া উচিত। আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ সেইসব সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হওয়া উচিত।

কাজ হয় এতে। পরের পরিস্থিতি দেখে মনে হয় বুশ প্রশাসন এবং তার পরামর্শদাতারা বোধহয় লাফিয়ে পড়ার জন্য এরকম একটা সংকেতেরই অপেক্ষায় ছিল। তারপর প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন, আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে তিনি বিশ্বের সবার সমর্থন চান। ফিলিস বেনিস তারপরের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে জানান বিশ্বের নেতারা বা সরকারগুলো আপত্তি জানায়নি। অথচ ১১ সেপ্টেম্বরের আগে এ

BanglaBook.org

পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

১১ সেপ্টেম্বরের আগে হাইপারপাওয়ার বা অতি ক্ষমতাধর আমেরিকা সরকার বিশ্ব মাতবরের মতো আচরণ করছে কি না ভেবে ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বাড়ছিল। ১১ সেপ্টেম্বরের আগে আমেরিকার এবিএম (আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল) চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকির প্রতিবাদ জানিয়েছিল রাশিয়া। ১১ সেপ্টেম্বরের আগে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বস্ততার অভাবের কারণে ইওরোপিয়ানরা আমেরিকাকে শাস্তি দিতে সতর্ক পায়ে এগোচ্ছিল... কিন্তু সেপ্টেম্বরের সেই মঙ্গলবার, রাত ১০ টার দিকে তাদের সমস্ত 'হাঁটি হাঁটি পা পা' উদ্যোগ হঠাৎ করে থমকে যায়। উল্টে বরং তারাই উল্লাস করে আমেরিকাকে তার সাম্রাজ্য গড়ার লাইসেন্স দিতে তার পাশে এসে দাঁড়ায়।

আমেরিকার বিশেষ করে আফগানিস্তানে পরিকল্পিত হামলা চালানো প্রসঙ্গে মেইসান মন্তব্য করেন ১১ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনকে বৈধ অপারেশনের ছদ্মাবরণে একটা ক্লাসিক ঔপনিবেশিক অভিযান চালানোর সুযোগ করে দেয়।

এই *ট্রাজেডি* যে বুশ প্রশাসনের সামনে অনেকগুলো *সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছিল*, তা বুঝতে খুব বেশি সমস্যা হয়নি মানুষের। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক জন পিলজার প্রথমে বলেছিলেন, ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা 'নতুন পার্ল হারবার ঘটিয়ে দিয়েছে।' তার সাথে তিনি এটাকে 'অপারচিউনিটি অব এজেস' বা সুদীর্ঘকালের সুযোগ বলে মন্তব্য করেন। শুধু তিনিই নন, খোদ বুশ প্রশাসনও স্বীকার করেছে এ কথা। রিপোর্টে জানা গেছে, ৯/১১-এর রাতে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল বা জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মিটিঙে প্রেসিডেন্ট বুশ এই হামলা জাতিকে একটা 'বিশাল সুযোগ' এনে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন।

এক মাস পর, ডোনাল্ড রামসফেল্ড *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-কে বলেন 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে নতুন করে সাজানোর যে সুযোগ এনে দিয়েছিল, এই হামলাও আমাদের সামনে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে।' ডক্টর কন্ডোলিৎসা রাইস ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সিনিয়র সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, 'ভেবে দেখুন, এই সুযোগকে পুঁজি করে কিভাবে স্বার্থ উদ্ধার করা যায়।' সেপ্টেম্বর ২০০০-এ বুশ প্রশাসন এটাকে নিজেদের 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্রাটেজি অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা'-তেও এভাবে উল্লেখ করেছিল 'সেপ্টেম্বর ২০০১-এর ঘটনাবলী বিশাল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।'

পিলজার বলেন দিনটিকে বুশ প্রশাসন বারবার 'সুযোগ' বলে উল্লেখ করে। এই 'সুযোগ' নিয়ে আরও অনেকে মন্তব্য করে। *ইউএস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট* বলে তারপর আসে ৯/১১। সন্ত্রাসী 'হামলার হুমকি' বিশ্ব রাজনীতিকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয়ার 'ওয়ানস-ইন-এ-জেনারেশন-চান্স' বা এক-প্রজন্মে-একবারের-মতো-সুযোগ তুলে দেয় আমেরিকার হাতে। তৃতীয় বিশ্বের আমেরিকা পরিচালিত গ্লোবাল ইকনমির নামকরা একজন সমালোচক, ওয়ালডেন বেল্লো এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন আল-কায়েদার নিউ ইয়র্ক মিশন আমেরিকাসহ বিশ্বের আর সব মোড়লের হাতে বিরাট

BanglaBook.org

এক সুযোগ তুলে দিয়েছে। যার দল সিনেটের নিয়ন্ত্রণ হারাতে বসেছিল, সেই সংখ্যালঘু প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে সাম্প্রতিককালের ইতিহাসের সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্টে পরিণত করেছে সুযোগটা।

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস-এর ডিরেক্টর কারেন ট্যালবটের এক বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ব্রেজজিনস্কির *দ্য গ্রেট চেজবোর্ড* বইটি পড়েছেন। তিনি বলেন ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা জায়ান্ট তেল কোম্পানিগুলোর স্বার্থে কাজ করার জন্য আমেরিকার সামনে তুলনামূলকভাবে নতুন এক ধরনের সুযোগ এনে দিয়েছে, যাতে দেশটি সেন্ট্রাল এশিয়ার সমস্ত সাবেক সোভিয়েত রিপাবলিক এবং ট্রান্সককেশাসের বিশাল, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল রিজার্ভ ক্ষেত্রগুলোয় চিরস্থায়ীভাবে নিজের সৈন্য বাহিনীর ঘাঁটি বসাতে পারে। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে আরব সাগর পর্যন্ত তেল ও গ্যাস পাইপলাইন বসানোর প্রজেক্টগুলোর কাজ শুরু করার জন্য মাঠ এখন রেডি।

আমেরিকার জন্য এই সোনালি সুযোগের বিশাল পুরস্কার হচ্ছে তেল সমৃদ্ধ সেন্ট্রাল এশিয়ায় স্থায়ীভাবে মিলিটারি উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সফল হওয়া। প্রখ্যাত রাজনৈতিক ভাষ্যকার উইলিয়াম পাফ বলেছেন 'বেশিরভাগ আমেরিকান ছাড়াও অন্য অনেকেই মনে করেন যে আমেরিকা এরমধ্যেই একটা আধুনিক সংস্করণের ইউনিভার্সাল এম্পায়ারের প্রধানে পরিণত হয়েছে। এখন মৌলিক বিষয় হবে দেশটি আগামি দুই বা তিন দশক তাদের এই বিস্ময়কর ক্ষমতা দেশটি কিভাবে কাজে লাগায় তা দেখা।

৯/১১-এর আগে দেশটি জনগণের অর্পিত রাজনৈতিক ইচ্ছা পূরণেই অসমর্থ ছিল। ৯/১১ সেই সামর্থ্য ফিরিয়ে দিয়েছে। সোশ্যাল ফিলসফার জন ম্যাকমার্টির এক বিবৃতি উল্লেখ করে নাফিজ আহমেদ বলেন, 'এই অপরাধ থেকে কে সবচেয়ে বেশি লাভবান হলো?'

জবাবটা স্পষ্টভাবে বুশ প্রশাসনের দিকেই ইশারা করে।

কেউ যদি ভেবে থাকেন বুশের সাঙ্গ-পাঙ্গ এবং দেশের তেল, মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ওয়াল স্ট্রিটের পৃষ্ঠপোষকরা এই মাস-কিল এক্সপ্লোশন (mass-kill explosion) থেকে লাভবান হয়নি, তাহলে বলতে হবে তিনি বোকার স্বর্গে বাস করেন। এমন যদি হয় কেউ ৯/১১-এর হামলার আগে তার ইচ্ছা পূরণের একটা তালিকা তৈরি করে সু-সময়ের অপেক্ষায় ছিল, তাহলে বলতে হবে ৯/১১-এর এই অসাড় করা দিক পরিবর্তন সেসবও পূরণ করে দিয়েছে।

আমেরিকানরা একদিকে অর্থনৈতিক ফ্রি-ফলিং (প্যারাসুট ছাড়া লাফ) থেকে উদ্ধার পেয়ে ভিনদেশী 'শয়তানের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, অন্যদিকে জর্জ বুশের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। মিলিটারি, সিআইএ এবং এফবিআইসহ দেশের প্রতিটি আর্মড সিকিউরিটি অ্যাপারেটাসের হাতে বর্তমানে যে পরিমাণ টাকা আছে, এত বেশি টাকা আগে কখনও ছিল না। সাধারণ মানুষের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাতে যতদূর সম্ভব মাত্রাছাড়া ক্ষমতাও পেয়েছে তারা হোয়াইট হাউজের 'দ্য হোল নিউ এরা' ঘোষণা

BanglaBook.org

অনুযায়ী।

ঘটে যাওয়া অপরাধ থেকে যে বেশি লাভবান হয়, তাকেই অপরাধ ঘটানোর জন্য দায়ি মনে করা হয়। সেই অনুসারে বলা যায়, এ অপরাধে বুশ প্রশাসনই যে জড়িত ছিল তা এখন মোটামুটিভাবে প্রমাণিত।

অফিশিয়াল দুষ্কর্মের সার-সংক্ষেপ

নাফিজ আহমেদ, চসুদোভস্কি, থিয়েরি মেইসান ও পল থম্পসনসহ অন্যান্য গবেষকের তৈরি করা বুশ প্রশাসনের দুষ্কর্মের তালিকা এরকম

১. প্রমাণ হয়েছে আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধের পরিকল্পনা জিওপলিটিক্যাল কারণে আগে থেকেই করা ছিল। ৯/১১-এর কারণে তা হয়নি, ওটা স্রেফ অজুহাত।

২. প্রমাণ হয়েছে আল-কায়েদার সাথে জড়িত লোকদের আমেরিকায় ঢুকতে দেয়ার ব্যাপারে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ঢুকতে দেয়া হয়েছে।

৩. প্রমাণ হয়েছে আল-কায়েদার সাথে জড়িত লোকদের আমেরিকার ফ্লাইট স্কুলে ট্রেইনিং নিতে দেয়া হয়েছে।

৪. প্রমাণ হয়েছে প্লেন হাইজ্যাকিং প্রতিহত করার ব্যাপারে যে স্বাভাবিক অপারেটিং প্রসিডিওর আছে, প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহল থেকে তা স্থগিত রাখা না হলে ৯/১১-এর হামলাকারীরা কিছুতেই সফল হতে পারত না।

৫. প্রমাণ হয়েছে রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা হাইজ্যাকিঙের বিরুদ্ধে নেয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে ভুল পথে পরিচালিত করার মতো তথ্য, এমনকি মিথ্যা তথ্যও দিয়েছেন।

৬. প্রমাণ হয়েছে হাইজ্যাক হওয়া প্লেনগুলোকে ধাওয়া করতে জেট ফাইটার 'স্ক্র্যাম্বল' করলেও জায়গামত পৌঁছতে দেরি করে ফেলেছে বলে যে দাবি করা হয়, সে গল্প ৯/১১-এর কয়েকদিন পর আবিষ্কার করা হয়।

৭. প্রমাণ হয়েছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টাওয়ারগুলো বিস্ফোরকের সাহায্যে ধ্বংস করা হয়েছে এবং সে কাজে আমেরিকান সরকারের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ মুছে ফেলতে সেগুলোর ধ্বংসাবশেষ, বিশেষ করে স্টিলের পিলার প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখার সব ধরনের উদ্যোগ ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছে।

BanglaBook.org

৮. প্রমাণ হয়েছে, কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যতজন সম্ভব সাধারণ মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত করতে সময় থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ডাব্লিউটিসি বিল্ডিং এবং পেন্টাগন খালি করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বরং অনেকের মৃত্যু যাতে নিশ্চিত করা যায়, সে জন্য নিরাপত্তার ভুয়া আশ্বাসবাণী প্রচার করা হয়েছে।

৯. প্রমাণ হয়েছে পেন্টাগনে আঘাতকারী যানটি বোয়িং ৭৫৭ নয়, বরং গাইডেড মিসাইলজাতীয় অনেক ছোটো এয়ার ক্র্যাফট ছিল।

১০. প্রমাণ হয়েছে হাইজ্যাকাররা যাত্রীদের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে পরাজিত হতে যাচ্ছে নিশ্চিত হওয়ার পরই ফ্লাইট ৯৩-কে গুলি করে ফেলে দেয়া হয়।

১১. প্রমাণ হয়েছে সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ডোনাল্ড রামসফেল্ড দুটো হামলার ব্যাপারেই আগে থেকে জানতেন।

১২. প্রমাণ হয়েছে প্রেসিডেন্ট বুশ ঘটনা সম্পর্কে না জানার এবং সন্ত্রাসী হামলার ভয়াবহতা সম্পর্কে না জানার ভান করেছেন।

১৩. প্রমাণ হয়েছে প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তাঁর সিক্রেট সার্ভিস অফিসাররা আগে থেকেই জানতেন যে তাঁকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো হবে না।

১৪. প্রমাণ হয়েছে যে হামলার লক্ষ্যবস্তু ও সময় সম্পর্কে এফবিআই অন্তত এক মাস আগে থেকে সব জানত।

১৫. প্রমাণ হয়েছে যে সিআইএসহ অন্যান্য ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো ৯/১১-এর আগে ওয়াল স্ট্রিটে 'পুট অপশনস' কেনার ধুম দেখে আগেই এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট লক্ষণ বুঝতে পেরেছিল।

১৬. প্রমাণ হয়েছে বুশ প্রশাসন হামলা সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য জানত না বলে যে দাবি করেছে তা ডাহা মিথ্যা।

১৭. প্রমাণ হয়েছে এফবিআই ও অন্যসব ফেডারাল এজেন্সি ৯/১১-এর প্লট যাতে ফাঁস না হতে পারে, সে জন্য তদন্তে বাধা দিয়েছিল।

১৮. প্রমাণ হয়েছে আমেরিকান অফিশিয়ালরা তাদের ৯/১১-এর পরিকল্পনার সাথে আইএসআই জড়িত ছিল, এমন স্পর্শকাতর বিষয়টাকে ধামাচাপা দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

BanglaBook.org

১৯. প্রমাণ হয়েছে আমেরিকান অফিশিয়ালরা ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলা ঘটার সময় ওয়াশিংটনে আইএসআই চিফ, মাহমুদ আহমাদের উপস্থিত থাকার কথা গোপন রাখতে চেষ্টা করেছে।

২০. প্রমাণ হয়েছে এফবিআই এবং অন্যসব ফেডারাল এজেন্সি তদন্ত প্রতিহত করেছিল, কারণ তারা জানত তা না করলে হামলার আসল কারিগরদের নাম প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

২১. প্রমাণ হয়েছে আমেরিকা ওসামা বিন লাদেনকে হামলার আগে বা পরে, কখনই হত্যা বা পাকড়াও করার ব্যাপারে আন্তরিক ছিল না।

২২. প্রমাণ হয়েছে বুশ প্রশাসনের অনেক কেন্দ্রীয় চরিত্রই প্রচুর মুনাফার লোভে একটা 'নিউ পার্ল হারবার' ঘটার পক্ষে ছিল।

২৩. প্রমাণ হয়েছে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের 'দ্য নিউ পার্ল হারবার অব দ্য ২১ সেঞ্চুরি' ঘটানোর 'কৃতিত্ব' স্বয়ং বুশ প্রশাসনেরই।

২৪. প্রমাণ হয়েছে যে সমস্ত কর্মকর্তার 'অযোগ্যতার' কারণে ৯/১১ ঘটেছে, তাদের কেউ চাকরি হারায়নি বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পদোন্নতির মাধ্যমে তাদের কয়েকজনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

দুষ্কর্মের থিয়োরি নিয়ে সম্ভাব্য সমস্যা

নাফিজ আহমেদ এভাবে সাজিয়ে ঠিকই করেছেন। কারণ এর মধ্যে আরও কিছু ফ্যাক্টস থাকতে পারে এবং সংশোধনবাদীদের অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার ফলে সেগুলো থেকে ভিন্ন ফ্যাক্টস বেরিয়ে আসতেও পারে। আবার তাদের হাজির করা কিছু কিছু ফ্যাক্টস আসলে ফ্যাক্টস না-ও হতে পারে। আরও তদন্তে তা নির্ধারিত হবে। তাছাড়া একটা গবেষণা কনক্লুসিভ বা চূড়ান্ত হয়ে গেছে বলে রায় দেয়াটা সব সময়ই সাবজেকটিভ জাজমেন্ট বা আত্মনিষ্ঠ রায় হয়ে থাকে। বিষয়টা নির্ভর করে যারা রায় দিচ্ছেন, তাদের 'ঝোঁক' কোনদিকে বেশি তার ওপর।

এখানে যে প্রশ্ন, সেটা ৯/১১-কে কেন্দ্র করে অফিশিয়াল দুষ্কর্ম হয়েছে কি হয়নি, তা নিয়ে নয়। কেননা নাফিজ আহমেদ, চসুদোভস্কি, মেইঘান, থম্পসন ও অন্যান্যদের গবেষণায় যে সমস্ত ফ্যাক্টস বেরিয়ে এসেছে, তাতে বুশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে যে হাজারো অভিযোগ উঠেছে, 'দুষ্কর্ম' যে 'হয়েছে', তার চূড়ান্ত রায় হয়েই গেছে। কাজেই এখনকার প্রশ্ন হচ্ছে এই রায়কেই চূড়ান্ত বলে ব্যাপকভাবে 'ধরে নেয়া' যায় কি না।

BanglaBook.org

আমাদের এই থিয়োরির সমালোচকরা বলতে পারেন, ৯/১১-এর অফিশিয়াল ব্যাখ্যা সত্যি নয়, এ ছাড়া আর কিছু আবিষ্কার করতে পারলেন না সংশোধনবাদীরা? সেদিন সংশ্লিষ্ট সবাই একজোট হয়ে যে দুষ্কর্ম ঘটিয়েছিল, তার বিকল্প, বিশ্বাসযোগ্য একটা ব্যাখ্যা অবশ্যই তাদের হাজির করা উচিত ছিল। তাছাড়া এই সমালোচকরা কিছু প্রশ্নও তুলতে পারেন, যার সহজ উত্তর সহসা দেয়া সম্ভব না-ও হতে পারে।

যেমন ধরা যাক, বুশ প্রশাসনের লোকজন যদি একটা নিউ পার্ল হারবার কামনা করেই থাকে, তাহলে ৯/১১-এর দিন যে সমস্ত ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, যার পরিকল্পনার পিছনে হোয়াইট হাউস, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট, এফবিআই, সিআইএ ও পেন্টাগন প্রভৃতি জড়িত ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে, এত ঝামেলা, এত জটিল এক ষড়যন্ত্র কেন করতে গেল? ('করতে গেল' বলতে তারা সরাসরি জড়িত ছিল বোঝানো হচ্ছে না, বোঝানো হচ্ছে 'কেন ঘটতে দিল?')। স্ট্যান্ডার্ড এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল প্রসিডিওর চালু থাকা অবস্থায় হাইজ্যাক হওয়া প্লেনগুলো যদি পেন্টাগন ও ডাব্লিউটিসি টাওয়ারে আছড়ে পড়তে চাইত, তাহলে এত বেশি প্রসিডিওর অমান্য করার প্রয়োজন পড়ত যা কিছুতেই কর্তৃপক্ষের চোখ এড়িয়ে করা সম্ভব হতো না। ষড়যন্ত্রকারীরাও এতটা আশা নিশ্চয়ই করেনি।

তারা হয়তো ধরে নিয়েছিল সেই অচিন্তনীয় হামলার পরপরই সাধারণ মানুষের যে আকস্মিক ক্রোধ এবং দেশপ্রেম, আবেগ ইত্যাদি উথলে উঠবে, তার রেশ কাটতে কাটতে তারা নিজেদের আখের গুছিয়ে ফেলতে পারবে। নিজেদের পরিচিতি ধামাচাপা দিয়ে ফেলতে পারবে? কিভাবে নিশ্চিত হলো যে এক সময় তাদের মুখোশ মানুষের সামনে খুলে পড়বে না? তাহলে কেন সহজ পথ ছেড়ে তারা এত জটিল একটা স্কিম বেছে নিল, যেখানে কেমিকাল বা বায়োলজিকাল অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে সহজেই নিজেদের কাজ সেরে ফেলতে পারত? হাজার হোক, *নিউ পার্ল হারবার* ঘটাতে হলে আসল ঘটনার প্লেন দিয়েই হামলা চালাতে হবে, এমন তো কোনো কথা ছিল না।

তারপরও, যদি ধরেও নেয়া হয় যে কাজটা এভাবে ঘটানোর পিছনে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে টাওয়ারগুলোকে বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দিয়ে ঝুঁকি কেন নিতে গেল প্রশাসন, যাতে অল্প চেষ্টাতেই প্রমাণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে যে কাজটা 'ইনসাইড জব'? তা-ও কয়েক হাজার নিরীহ মানুষের করুণ মৃত্যু নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে? কেন তারা ডাব্লিউটিসি-৭ টাওয়ারকে ধ্বংস করল? কেন দাবি করল টুইন টাওয়ার বিধ্বস্ত হয়েছে প্লেনের ধাক্কা আর জেট ফিউয়েলের তীব্র আগুনের তাপে স্টিলের পিলার গলে যাওয়ার কারণে?

তাছাড়া, দেখা যাচ্ছে এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্তদের অযোগ্যতারও কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পেন্টাগন আক্রান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত ধারেকাছের কোনো এয়ার বেজ থেকে একটা এফ-১৬ বা এফ-১৫ জেট ফাইটার স্ক্র্যাম্বল করেনি। তার মানে এতে কোনো সন্দেহই নেই যে, সেদিন বাধ্যতামূলক স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরকে সিজ অ্যান্ড ডিসিস্ট (cease and desist) বা বিরত ও নিবৃত্ত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

BanglaBook.org

তাহলে কেন তারা এ কথা আগ বাড়িয়ে জানাতে গেল স্ক্র্যাম্বল করেছে? তারপর যখন বুঝল এ কাহিনি তাদেরকে ঝামেলায় ফেলবে, তখন আরেক উদ্ভট কাহিনী কেন বানাতে গেল যে—কাছের এয়ার ফোর্স বেজ বাদ দিয়ে দূরের বেজ থেকে প্লেন স্ক্র্যাম্বল করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৫০০ মাইল গতিসীমার এফ-১৬ ফাইটার অর্ধেকেরও কম গতিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছে?

গোটা অপারেশনের পরিকল্পনা পাকা করতে নিশ্চয়ই মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে অনেককে। তাহলে এসব খুঁটিনাটির বেলায় আগে থেকেই একটা বিশ্বাসযোগ্য কাহিনি দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হলো না কেন? তাছাড়া ষড়যন্ত্রকারীরা মিডিয়ার সামনে বোকার মতো উল্টোপাল্টা কথা বলতে গিয়ে অহেতুক বাড়তি সন্দেহের উদ্রেকই বা কেন করতে গেল? যে সাধারণ একটা তথ্য একজন শিক্ষানবিশ সাংবাদিকও ইচ্ছে করলেই বের করে ফেলতে পারে, সেখানে তারা কেন বলতে গেল হাইজ্যাক হওয়া প্লেন ইন্টারসেপ্ট করতে প্রেসিডেনশিয়াল লেভেলের অনুমোদন প্রয়োজন হয়?

সত্যি কথাটা ফাঁস হয়ে যাবে জেনেও কেন বলতে গেল আক্রমণ সম্পর্কে আগে থেকে কোনো আভাস তারা পায়নি? জাতির ওপর কোনো ধরনের আঘাত এলে প্রেসিডেন্টকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করার নিয়ম আছে সবাই জানে। তারপরও কেন তারা প্রেসিডেন্টকে দিয়ে এমন একটা ভাব করাল যেন তিনি কিছুই জানেন না? তারপর অফিশিয়ালি যখন জানানো হলো 'আধুনিক কালের পার্ল হারবার ঘটতে শুরু করেছে,' তখনও প্রেসিডেন্ট 'রিডিং থিং' চালিয়ে যান কিভাবে?

এবং সন্ত্রাসী হামলা চলছে জেনেও তিনি এবং তাঁর দেহরক্ষীরা সবার জানা অবস্থানে কিভাবে থাকেন? এতে কি প্রমাণ হয় না যে, তাঁর জানা ছিল তাঁকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীরা কোনো হামলা চালাবে না? তাছাড়া, যদি ধরে নেয়া হয় ডিক চেইনি, ডোনাল্ড রামসফেল্ড, ওলফোউইৎজ আর লিবি ২০০০ সালে থেকে *প্রজেক্ট ফর দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি*-এর ডকুমেন্ট তৈরির কাজে জড়িত ছিলেন, তাহলে তারা *দ্য নিউ পার্ল হারবার* নাম একটা পাবলিক ডকুমেন্টে কেন ব্যবহার করতে গেলেন, যেটা ইচ্ছে করলেই যে কেউ পড়তে পারবে? এবং যদি রিপ্রেজেন্টিটিভ কক্স-এর জবানবন্দি সত্যি হয়, যদি প্রথম ডাব্লিউটিসি টাওয়ারে হামলা হওয়ার পর রামসফেল্ড ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন, 'বিলিভ মি, ঘটনা এখনও শেষ হয়নি। আরও একটা হামলা হতে যাচ্ছে। এবার বোধহয় আমরা তার লক্ষ্য হবো'—তাহলে কি মনে হয় না তিনি পেন্টাগনে হামলা হবে জানতেন। এবং কখন ঘটবে, তা-ও জানতেন?

পেন্টাগনে হামলাকে কেন্দ্র করে আরও এক ধরনের প্রশ্নও তোলা যেতে পারে। সবাই জানে, পেন্টাগনের নিরাপত্তা মূলত মিসাইলের ওপর নির্ভরশীল এবং পৃথিবীর বুকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার একমাত্র জায়গা হচ্ছে পেন্টাগন। এই সত্য জানার পরও কেন সেটাকে তাদের টার্গেটের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করল ষড়যন্ত্রকারীরা? অথবা যদি তারা সেটাকে টার্গেট না করে স্রেফ 'বাইরের হামলায় ঘটতে দিয়েছে' ধরনের কিছু করে থাকে, তাহলে হাইজ্যাক করা জেট বোয়িং দিয়েই কেন? অথবা যদি ষড়যন্ত্রকারীরা

BanglaBook.org

পরিকল্পনা করে থাকে মিলিটারি এয়ার ক্র্যাফটের সাহায্যে ঘটনা ঘটিয়ে হাইজ্যাক হওয়া বোয়িং ৭৫৭-এর ঘাড়ে দোষ চাপাবে, তাহলে এত ছোটো এয়ার ক্র্যাফট কেন বেছে নিল, যা বোয়িঙের মত যথেষ্ট বড় গর্ত সৃষ্টি করতে পারবে না? বা যার ধ্বংসাবশেষের টুকরো-টাকরা কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা দেখিয়ে নিজেদের দাবি প্রমাণ করা সম্ভব হবে? বিশেষ করে আজকালকার যুগে যখন এয়ারপ্লেনও পাইলট ছাড়াও চালানো সম্ভব?

অথবা যদি এমন হয়ে থাকে, হাইজ্যাক করা যাত্রীবাহী বোয়িং দিয়ে হামলা করানোর ইচ্ছা থাকলেও ফ্লাইট ৯৩-এর মতো যাত্রীদের বাধার কারণে সম্ভব না হওয়ায় ফ্লাইট ৭৭-কেও গুলি করে ফেলে দিতে হয়েছে এবং বিকল্প উপায় হিসেবে তড়িঘড়ি করে মিসাইল দিয়ে কাজ সারার চেষ্ট হয়েছে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে—আগে থেকে কেন একটা ভালো বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়নি? তারচেয়েও বড় প্রশ্ন, যখন বোঝা গেল তাদের পেন্টাগন 'হামলা' ব্যর্থ হতে যাচ্ছে, তখন কেন সে প্ল্যান কার্যকর করা থেকে পিছিয়ে এল না ষড়যন্ত্রকারীরা? কেন এমন একটা কাজ করতে গেল যার ফাঁক ফ্রান্সের মতো দূরত্ব থেকেও মানুষের চোখে পড়বে?

কেন তারা এমন হাস্যকর দাবি করতে গেল মৃত যাত্রীদের তখনও সনাক্ত করা সম্ভব ছিল? তা-ও প্রথমে প্লেনের স্টিল আর অ্যালুমিনিয়াম পর্যন্ত আগুনের প্রচণ্ড তাপে গলে গেছে দাবি করার পর? তারপর টেড ওলসেনের অদ্ভুত ভূমিকার কি ব্যাখ্যা হতে পারে? আমাদেরকে কি এ কথা বিশ্বাস করতে হবে ঊর্ধ্বতন অফিশিয়ালদের ষড়যন্ত্রে নিজের স্ত্রী প্রাণ হারিয়েছেন জানার পরও তিনি নিজের ইচ্ছায় ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষেই সাফাই গাইবেন? নাকি পুরোটাই সাজানো? বারবারা ওলসেন আসলে মারা যাননি? যার অর্থ হতে পারে বাকি জীবন তাঁকে আত্মপরিচয় গোপন করে কাটাতে হবে?

তাছাড়া এ ধরনের অবিশ্বাস্য গল্প ফাঁদার প্রয়োজনটাই বা কি ছিল, যে গল্পে যাত্রীদের সবাইকে যার যার আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলতে উৎসাহিত করার পরও সবাই বাদে একমাত্র বারবারা ওলসেনই তাঁর স্বামীকে টেলিফোন করেছিলেন? আর কেউ করেনি? ফ্লাইট-৭৭ ক্র্যাশ করেনি এবং সম্ভবত ওয়াশিংটনের দিকে ফিরে যাচ্ছিল, এটা বিশ্বাস করাতে আরও ভালো একটা কাহিনি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই দাঁড় করানো যেত। সবশেষে, যদি ফ্লাইট-৭৭ কোথাও ক্র্যাশ করে থাকে; সম্ভবত ওহায়ও বা কেন্টাকির কোথাও, সেটার ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে কোনো রিপোর্ট প্রকাশ করা হলো না কেন?

ফ্লাইট ৯৩ নিয়েও এরকম অনেক প্রশ্ন তোলা যায়। যেমন অফিশিয়ালদের ভাষ্য অনুযায়ী সেটার যাত্রীরা হাইজ্যাকারদের হাত থেকে প্লেনের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিতে শুরু করেছে জানার পর সেটাকে কেন গুলি করে ফেলে দেয়া হলো? ফেলে দেয়া যদি এতটা জরুরিই ছিল, তাহলে রিমোট কন্ট্রোল বোমা পেতে রেখে পরে সুইচ টিপে দূর থেকে অনায়াসেই তো কাজটা সেরে ফেলতে পারত। পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে সেরা মিলিটারি ও সিআইএ এক্সপার্টরা থাকার পরও ষড়যন্ত্রকারীরা এরকম পদক্ষেপ কেন নিতে গেল যাতে থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ার এত বেশি ঝুঁকি ছিল—বিশেষ করে জেট ফাইটার

BanglaBook.org

দেখা যাওয়ার মতো হাস্যকর কাহিনি?

এসব ছাড়া আরও আছে। সরকারী ব্যাখ্যার সমালোচনাকারীরা বুশ প্রশাসনের হাই অফিশিয়ালদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অযোগ্যতার অভিযোগ তুলেছেন, তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা যদি কোনো ষড়যন্ত্রেরই ফল হয়ে থাকে, তাহলে কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়নি কেন? বুশ প্রশাসনের অফিশিয়াল ব্যাখ্যাতেই এ ঘটনাকে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অযোগ্যতার উদাহরণ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিছু এফবিআই এজেন্ট, এফএএ-র ফ্লাইট কন্ট্রোলার, এনএসসিসি ও নোরাড-এর অফিশিয়াল এবং জেট ফাইটারের পাইলটদের যোগসাজশে এটা সফল হয়েছে। কাজেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর মতো স্কেপগোটের অভাব ছিল না। গোটা ষড়যন্ত্রকারী টিমকে বাঁচানোর স্বার্থে হলেও তো তাদের কয়েকজনের 'বিরুদ্ধে' অভিযোগ দায়ের করে যেমন-তেমন একটা ব্যবস্থা নেয়া যেত সবার সন্দেহ দূর হয়।

অথচ বুশ প্রশাসন সে পথের ধার দিয়েও হাঁটেনি। অফিশিয়াল ব্যাখ্যা সত্যি হলে এইসব অভিযুক্তদের অন্তত চাকরি যাওয়ার কথা ছিল। তা তো যায়ইনি, বরং এমনকি অভিযুক্তদের 'কঠোর তিরস্কার' পর্যন্ত করা হয়নি। আরও মজার কথা, তাদের অনেককে পদোন্নতি পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। যা দেখে সাধারণ মানুষের সন্দেহ জাগতেই পারে যে, তারা আসলে কোনো অপরাধ করেনি, বড় কর্তাদের হুকুম পালন করেছে মাত্র। প্রশাসনের এই আচরণ কি অতিরিক্ত 'ডোন্ট কেয়ার' ধরনের ছিল না? বুশ প্রশাসনের অনেক মাথা এতবড় এক দুষ্কর্মে জড়িত ছিল, তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে অন্তত লোক দেখানোর স্বার্থে হলেও বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো গেল না?

বুশ প্রশাসনের অফিশিয়াল ব্যাখ্যার মধ্যে কি কি দুষ্কর্ম পাওয়া যায়, তা খুঁজতে গিয়ে এই প্রশ্নগুলো আমার মনে উদয় হয়েছে। যদিও জানি এসবের জবাব কোনোদিনও পাওয়া যাবে না। এসব নিয়ে ভাবতে বসলে মনে হয়, আমরা কেবল অযোগ্যতার থিয়োরি আর দুষ্কর্মে সহযোগিতার থিয়োরির মধ্যে কোনটাকে বেছে নেবো, সেই কঠিন সিদ্ধান্তের মুখোমুখিই পড়িনি। বরং একদিকে কিছু সময়ের জন্য আকস্মিকভাবে অযোগ্য হয়ে ওঠা একদল অধস্তন কর্মচারী, অন্যদিকে আরেকদল চরম অযোগ্য হাই-অফিশিয়ালদের অবিশ্বাস্য এক ষড়যন্ত্রের থিয়োরির মুখে পড়েছি আমরা, যে দু' দল মিলেমিশে একটা ষড়যন্ত্রকে সফল করতে দুষ্কর্মের চূড়ান্ত করে ছেড়েছে। এসব সত্যিই বিশ্বাস করা কঠিন।

দুষ্কর্মে সহযোগিতার থিয়োরির সমালোচকরা বলতে পারেন, বিশ্বাস করতে অতিরিক্ত সরল বিশ্বাস থাকা চাই। আর যারা উচ্চপদস্থ ষড়যন্ত্রকারীদের থিয়োরি মেনে নেবেন, তারা ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনার ভেতরের অযোগ্যতার সাথে 'বিগ লাই'-এর থিয়োরির তুলনা করতে পারেন—অর্থাৎ যাতে সাধারণ মানুষ ছোটো মিথ্যার বদলে বড় মিথ্যাকেই বেশি বিশ্বাস করে। কারণ তারা মেনে নিতে পারে না যে কেউ 'এত বড় মিথ্যা' বলে তাদেরকে 'বোকা বানাতে' পারে।

BanglaBook.org

উদাহরণ হিসেবে গোর ভিডাল-এর কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন 'মনে হয় হিটলারও সাধারণ মানুষের এই সরল বিশ্বাস নিয়ে খেলা করার কৌশল ভালোই জানতেন। জানতেন, মিথ্যা যত বড় হয়, মানুষ ততই সহজে বিশ্বাস করে।'

তারপরও, আমার এত বিস্তারিত ব্যাখ্যার পরও যে সাধারণ মানুষের মন থেকে সন্দেহ পুরোপুরি দূর হয়ে যাবে, সে ব্যাপারে আমি ততটা ভরসা করি না। যে সমস্ত পলিটিশিয়ান এ দেশে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে গেছেন, যেসব মিলিটারি ও ইন্টেলিজেন্স অফিশিয়াল সর্বোচ্চ পদে বসে আছেন, তাদের দ্বারা এমন একটা অবিশ্বাস্য পরিকল্পনা করা এবং তা কার্যকর করা কি সম্ভব? এই সহজ জিনিসটা সাধারণ মানুষের পক্ষে হজম করা খুব সহজ একটা কাজ হবে না। তবু আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত, ৯/১১ নিয়ে যে অকল্পনীয় অফিশিয়াল দুষ্কর্ম হয়েছে, তা আমার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণ করা হয়তো সম্ভব হবে না।

নাফিজ মোসাদ্দেক আহমেদ স্বীকার করেছেন, নিজের বক্তব্যের পক্ষে উপস্থাপন করা তথ্য-উপাত্ত বা ধারণা ইত্যাদি মিলিয়ে তিনি যা দাঁড় করাতে পেরেছেন, তাকে নিজেই কনক্লুসিভ বা চূড়ান্ত বলে রায় দিতে পারছেন না। আমি সেটাকে এনলার্জ বা আরেকটু বড় পরিসরে উপস্থাপন করলাম। নাফিজ আহমেদ, চসুদোভস্কি, মেইসান ও থম্পসনসহ অফিশিয়াল ব্যাখ্যার অন্য সব সমালোচকরা এ পর্যায়ে একটা সতর্কবাণী হয়তো ঢোকাতে চাইবেন। তা হলো, এ বইয়ে কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলোর জবাব তাঁরা দিতে পারেননি। তাই পাঠক যেন এমনটা ধরে না নেন যে সেগুলোকে আমরা দুটো হাইপোথিসিসের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি, যার দুটো প্রশ্ন একই রকম গুরুত্বপূর্ণ।

বুশ প্রশাসনের অফিশিয়াল ব্যাখ্যা নিয়ে তাঁরা সবাই যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছেন, সেসব এখানে আলোচিত ব্যাখ্যার সাথে সংঘাতমূলক এবং সবই স্বীকৃত সত্য। তবে এখন দুষ্কর্মে সহযোগিতার থিয়োরি নিয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠছে, তার সবই বাগাড়ম্বরপূর্ণ; যার কোনোটারই জবাব কখনও পাওয়া যাবে না। তবে অন্তত কিছু কিছু প্রশ্নের জবাব হয়তো পাওয়া যাবে।

যেমন, আরও অনেক নির্ঝঞ্ঝাটে, আরও অনেক সহজ কায়দায় সন্ত্রাসী হামলা চালানোর উপায় থাকতেও এয়ারপ্লেনের সাহায্যেই তা কেন ঘটানো হলো? এর একটা জবাব এরমধ্যেই পাওয়া গেছে। তা হলো, হামলা যদি মিসাইল ডিফেন্স শিল্ডের পিছনে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করার পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের কৌশল হিসেবে চালানো হয়ে থাকে, তাহলে হামলাটা আকাশ পথেই আসতে হবে। যাকে *স্পেস প্রুফ হারবার* হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে।

যদিও কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল আক্রমণ চালানো হলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত হামলাকারীদের, ষড়যন্ত্রে বেশি লোকের অংশগ্রহণের প্রয়োজনও হতো না। কিন্তু বিমান হামলায় যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তার কিছুই হতো বলে মনে হয় না। তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তা হলো, বিমান হামলার ষড়যন্ত্রে অনেকেই অংশ নিয়েছে। তাদের সবাই মুখ বন্ধ রাখবে, তা কি সম্ভব? সংশোধনবাদীরা জবাব দিতে পারে, যারা এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, তাদেরকে যে ধরনের

BanglaBook.org

ভয়-ভীতি, বিচারের ভয় ইত্যাদির মুখে পড়তে হয়েছে, তা সংশ্লিষ্টদের কল্পনারও বাইরে ছিল। কাজেই মুখ বন্ধ না রেখেই বা উপায় কি তাদের?

তাছাড়া সংশোধনবাদীরা আরও যোগ করতে পারেন, ৯/১১-এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রশ্নের জবাব নির্ভর করে এমন অনেক কিছু ফ্যাক্টস-এর ওপর, যা আমরা এ মুহূর্তে জানি না। হয়তো পূর্ণ তদন্তের পর সেসবের জবাব পাওয়া যাবে। কেউ নিশ্চয়ই এমনটা আশা করতে পারে না যে স্বাধীন গবেষকরা; যাদের ক্ষমতা নেই, বাজেটও সীমিত, তারা প্রতিটা প্রশ্নের জবাব বের করতে পারবেন। মেইসান উদাহরণ হিসেবে বলেছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফ্যাক্টস উন্মোচিত হয়ে পড়ায় ভেতরের সত্যটা আমাদের চোখে পড়ে গেছে, বাকি সব ক্ষেত্রে 'আমাদের প্রশ্ন এখনকার মতো জবাববিহীন রয়ে গেছে।'

এমন একগাদা প্রশ্নের মধ্যে তিনি নিজেও কিছু প্রশ্নের জবাব পেতে আগ্রহী 'আমেরিকান এয়ারলাইনস ফ্লাইট ৭৭-এর ভাগ্যে কি ঘটেছিল? ওটার যাত্রীরা সবাই কি মরে গেছে? যদি তাই হয়, তাহলে কে তাদেরকে হত্যা করেছে এবং কেন? যদি হত্যা না করা হয়ে থাকে, তাহলে মানুষগুলো কোথায় আছে?' মেইসান অকপটে স্বীকার করেন, এসব প্রশ্নের জবাব তার জানা নেই। এবং বলেন, 'এটা এমন নয় যে আমাদেরকে বিশ্বাস করতেই হবে, সমস্ত মিথ্যা অফিশিয়ালরাই সাজিয়েছেন।'

আমরা জানতে পারব না ৯/১১-এর দিন সত্যি সত্যি কি ঘটেছিল। আরেক কথায়, যতক্ষণ না আমরা বুঝতে পারব অফিশিয়াল ব্যাখ্যা মিথ্যা ছিল এবং ঘটনার পূর্ণ তদন্ত দাবি করব। বাকি বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রশ্নগুলো বলে, দুষ্কর্মে সহযোগিতার থিয়োরি মেনে নেয়া হবে এতবড় ষড়যন্ত্রের হোতাদের অবিশ্বাস্য অযোগ্যতার অধিকারীদের ডিগ্রি প্রদান করা। তবে কথাটা সত্যিও হতে পারে যে, তারা আসলেই চরম অযোগ্য।

ইরাকে আগ্রাসন চালানো সম্পর্কে বলা যায়, সামরিক আক্রমণে বিজয়ী হওয়া আর অয়েল ফিল্ড ও মিনিস্ট্রিগুলো দখল করায় সাফল্য ছাড়া সব ক্ষেত্রেই বুশ প্রশাসনের পরিকল্পনায় চরম অযোগ্যতার ছাপ ছিল। যে কাভার স্টোরিকে কেন্দ্র করে ৯/১১-এর পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল, হয়তো তাতেও অযোগ্যতার ছাপ ছিল। এ সত্য ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়নি কারণ আমেরিকান মিডিয়া অফিশিয়াল ব্যাখ্যা আর প্রমাণিত সত্যের ভেতরকার ফাঁক সম্পর্কে জনসাধারণকে জানাতে সম্ভবত ব্যর্থ হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো প্লেন হাইজ্যাক করা হলে ইন্টারসেপ্ট করার স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর কি, আমাদের মাস মিডিয়া তা কখনও সাধারণ মানুষকে শেখায়নি। তারা কখনও গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেনি যে, অফিশিয়াল ব্যাখ্যায় পরে যা যা বলা হয়েছে, তার সাথে ৯/১১-এর পরের কয়েকদিন যাবৎ প্রশাসনের বলা 'ঘটনার' মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তারা সাধারণ মানুষকে ফাইটার প্লেনগুলোর সময়মতো সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে না পারার যে যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করেছে, তা একেবারে ডাহা মিথ্যা। তাছাড়া পেন্টাগনে হামলার ব্যাপারে প্রশাসনের দাবি আর সত্যের মধ্যে যে অনেক ব্যবধান আছে, সেসবও তারা কাউকে জানতে দিতে চায়নি।

সমালোচকদের মতে যখন এসব ধাপ্পাবাজি ধরা পড়ে যাবে, সব ফাঁক মানুষের

BanglaBook.org

চোখে পড়ে যাবে, তখনই কেবল নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে বুশ প্রশাসন দেশের মানুষের সাথে কতবড় শঠতা আর প্রতারণা করেছে।

দৈব-সংযোগ থিয়োরির সমস্যা

ষড়যন্ত্রের থিয়োরি নির্ভর করে সাধারণত উপলব্ধির উদাহরণ বা নমুনার ওপর। তার সাথে সেই নমুনাসমূহের উপস্থিতির প্রমাণ এবং দুই বা তারচেয়ে বেশি লোকের সম্মিলিত উদ্যোগের ফলে ঘটেছে বলে দাবি উত্থাপন করা। কোনো নির্দিষ্ট ষড়যন্ত্রের থিয়োরিকে অস্বীকার করতে হলে অভিযোগের বিপরীতে পাল্টা প্রমাণ দেখাতে হবে যে, সে দাবির কোনো সত্যতা নেই। অথবা দাবি করা যে, যে নমুনাকে ষড়যন্ত্র বলা হচ্ছে, সেটা নির্ভেজাল দৈব-সংযোগ।

বুশ প্রশাসনের পক্ষে প্রমাণ করা কষ্টকর হবে যে সমালোচনাকারীরা এ ক্ষেত্রে তাদের উপলব্ধি বা দাবির সমর্থনে নমুনা উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসী হামলার আগে, হামলার সময়ে এবং পরে, নানারকম বিভ্রান্তিকর কথা বলা হয়েছে, অপতৎপরতা চালানো হয়েছে। কাজেই প্রশাসনের হাই অফিশিয়ালদের সমর্থনেই হয়তো হামলা ঘটেছে এবং পরে তারা বিষয়টাকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছে, বিষয়গুলোকে এর আলামত হিসেবে বিবেচনা করা হলে তাতে দোষ হবে না।

এসব যুক্তিকে ষড়যন্ত্র হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করার অর্থ হবে *দৈব-সংযোগ* থিয়োরি মেনে নেয়া। কিন্তু তাতেও সমস্যা বাড়বে ছাড়া কমবে না। কারণ সমালোচকদের ঝুলিতে এরকম দৈব-সংযোগের ভুরি ভুরি নমুনা আছে। একটা ঘটনাকে ঘিরে এত দৈব-সংযোগ ঘটে কিভাবে, তখন সেটাও আরেক জটিল প্রশ্ন হয়ে দেখা দিতে পারে। যা হোক, নিচে দৈব-সংযোগের একটা সম্পূর্ণ তালিকা দেয়া হলো

১. ৯/১১-এর দিন বেশ কিছু এফএএ ফ্লাইট কন্ট্রোলার দায়িত্ব পালনে চরম অযোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে। এবং আমেরিকার ইতিহাসে এমন অস্বাভাবিক ঘটনা একমাত্র সেইদিনই ঘটেছে।

২. NMCC আর NORAD-এর অফিশিয়াল ইন-চার্জরাও ৯/১১-এর দিন কাজের ক্ষেত্রে প্রচুর অযোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং সেটাও ওই একদিনই।

৩. বিশেষ করে NMCC আর NORAD-এর অফিশিয়ালরা সেদিন যখন নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটনকে রক্ষার জন্য ফাইটার প্লেন স্ক্র্যাম্বল করার নির্দেশ দেন, তখন দুই শহরের বেলাতেই কাছের এয়ার ফোর্স বেজ; যথাক্রমে ম্যাকগোয়ার ও অ্যান্ড্রুজ বাদ দিয়ে দূরের বেজ, যথাক্রমে ল্যাংলি ও ওটিসকে নির্দেশ দেয়া হয়।

BanglaBook.org

৪. পরে প্রশাসনের ব্যাখ্যায় বলা হয় অ্যান্ড্রিউজ এয়ার ফোর্স বেজে কোনো ফাইটার ছিল না। যদিও অ্যান্ড্রিউজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ওয়াশিংটনকে রক্ষা করার জন্যই। বেজের ওয়েবসাইটে হামলার আগে ফাইটার প্লেন অনেক 'আছে' বলা থাকলেও পরে সংশোধন করে 'নেই' লেখা হয়েছে।

৫. যে সব পাইলট দাবি করেছে যে তারা তিন মিনিটের মধ্যে আকাশে উঠে 'ফুল স্পিডে' হাইজ্যাক হওয়া প্লেন ইন্টারসেপ্ট করতে ছুটছিল, তাদের জায়গামতো পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়।

৬. শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন ফাইটার; এফ-১৫ আর এফ-১৬ ঘণ্টায় যথাক্রমে ১,৮৫০ ও ১,৫০০ মাইল বেগে ছুটতে পারে। কিন্তু সেদিন ঘণ্টায় ৩০০ আর ৭০০ মাইল বেগে ছুটেছিল সেগুলো।

৭. ডাব্লিউটিসি-র টাওয়ারগুলো শুধু ধসেই পড়েনি, বরং সেখানে মিহি পাউডারের ছড়াছড়ি, আগুনের তাপে গলে যাওয়া স্টিলের বার, ভূ-কম্পনের রেকর্ড ইত্যাদির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ডিমোলিশনের প্রমাণও পাওয়া গেছে।

৮. ভিডিও-র ছবিতে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা গেছে, দূর নিয়ন্ত্রিত (রিমোট কন্ট্রোলড্) বিস্ফোরণ ঘটিয়েই ডাব্লিউটিসি-র উত্তর ও দক্ষিণ টাওয়ার ফেলে দেয়া হয়েছে। যারা সেগুলোর ধারেকাছে উপস্থিত ছিল, তারা বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছে, মাটির জোর কাঁপন অনুভব করেছে এবং বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়াও দেখেছে বলে স্বীকার করেছে। টাওয়ার পড়ে যাওয়ার সময় যে বিশাল সাদা মেঘের মত ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল, সেই ধোঁয়া বিস্ফোরণেরই ফল ছিল। প্লেনের ধাক্কায় বা আগুনে ওরকম ধোঁয়া হতে পারে না।

৯. ডাব্লিউটিসি ১ ও ডাব্লিউটিসি ২-এর সাথে ডাব্লিউটিসি ৭-এর পতনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয়ে মিল থাকলেও শেষেরটার সাথে জেট ফিউয়েলের কোনো সংযোগ পাওয়া যায়নি।

১০. ডাব্লিউটিসি-র উত্তর ও দক্ষিণ টাওয়ার যখন বিধ্বস্ত হয়, তখন দুটোরই আগুন নিভে আসছিল। এবং দক্ষিণ টাওয়ারে আঘাত পরে লাগলেও সেটাই আগে বিধ্বস্ত হয়।

১১. ডাব্লিউটিসি-র তিন টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ, বিশেষ করে গলে যাওয়া স্টিলের পিলার কোনোরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই খুব দ্রুত সরিয়ে ফেলা হয়। এতে প্রমাণ হয় সরকারের ভয় ছিল, পরীক্ষা করতে দিলে ওগুলোর মধ্যে বিস্ফোরকের অস্তিত্ব

BanglaBook.org

পাওয়া যাবে।

১২. প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় পেন্টাগনে যে এয়ার ক্র্যাফট আঘাত করেছিল, সেটা কিছুতেই বিশালাকার বোয়িং ৭৫৭ হতে পারে না। অনেক প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর জবানীতে জানা গেছে, সেটা বোয়িং-এর চাইতে অনেক ছোটো কিছু ছিল।

১৩. পেন্টাগনে যে এয়ারক্র্যাফট বিধ্বস্ত হয়েছে বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, সেটার সাথে কেনটাকি অথবা ওহায়য়োতে বিধ্বস্ত হওয়া ফ্লাইট ৭৭-এর খবরের সহাবস্থান আছে।

১৪. বুশ প্রশাসনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এমন এক অ্যাটর্নির সরবরাহ করা তথ্যের সাথেও ফ্লাইট ৭৭-এর সহাবস্থান আছে। কারণ তাঁর দাবি অনুযায়ী ফ্লাইট ৭৭ বিধ্বস্ত হয়নি।

১৫. ফ্লাইট ৭৭ পেন্টাগনে হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে দিক পাল্টে ওয়াশিংটনে ফিরে আসেনি বলে যে দাবি করা হয়েছে, সেই খবরের সাথে সহাবস্থান পাওয়া গেছে অন্য এক খবরের—কর্তৃপক্ষ ওটার যে কন্ট্রোল ট্রান্সক্রিপ্ট প্রকাশ করেছে, তাতে শেষের ২০ মিনিটের রেকর্ড নেই। তাতে প্রমাণ হয় সেই ২০ মিনিটে প্লেনের ভেতরে এমন কিছু ঘটেছিল বা বাক্য বিনিময় হয়েছিল, যা প্রশাসন কাউকে জানতে দিতে চায় না।

১৬. যে এয়ার ক্র্যাফট পেন্টাগনে হামলা চালিয়েছে, সেটা অনেক উঁচু থেকে ঝাঁপ দিয়ে এমন জায়গায় বিধ্বস্ত হয়, যেখানে সামরিক নেতাদের মধ্যে কেউ বসেন না। তাই ধারণা করা হয় কেবল মৃতের সংখ্যা আর ধ্বংসের পরিমাণ বাড়াতেই এটা করা হয়েছে।

১৭. ওইদিন জেট ফাইটার বহর পোন্টগনে হামলা চালাতে উদ্যত একটামাত্র প্লেনকে ঠেকাতে যেমন ব্যর্থ হয়, পেন্টাগনের প্রতিরক্ষার জন্য বসানো মিসাইল বহরও তেমনি ব্যর্থ (!) হয়।

১৮. সেল ফোনে ফ্লাইট ৯৩-এর ভেতরের শব্দ শুনে যেমন মনে হয়েছে ওটাকে ধ্বংস করতে মিসাইল ছোড়া হয়েছে। মাটি থেকে ঘটনা নিজের চোখে দেখেছে, এমন অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষীতেও সেরকমই প্রমাণ হয়েছে।

১৯. ফ্লাইট ৯৩-কে গুলি করে ফেলে দেয়া হয়েছে খবরের সাথে মিলিটারি ও সিভিলিয়ান সূত্রের বিভিন্ন রিপোর্টের সহাবস্থান লক্ষণীয়। ফ্লাইটটাকে গুলি করে ফেলে দেয়ার ইচ্ছে ছিল কর্তৃপক্ষের।

BanglaBook.org

২০. একমাত্র ফ্লাইট ৯৩-কে গুলি করে ফেলে দেয়া হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে, এবং সেটা যাত্রীরা হাইজ্যাকারদের পরাজিত করে প্লেনের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে, এমন খবর জানার পর।

২১. ফ্লাইট ৯৩-কে মিসাইল ছুড়ে ফেলে দেয়া হয় হাইজ্যাকাররা যাত্রীদের কাছে পরাজিত হচ্ছে, এমন খবর জানাজানি হওয়ার পর। এটার সাথে অন্য এক খবরের সহাবস্থান আছে–তা হলো একমাত্র সেই ফ্লাইটের ফ্লাইট কন্ট্রোল ট্রান্সক্রিপ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রকাশ করা হয়নি। গোপন করে যাওয়া হয়েছে সেটার কথা।

২২. দৈব-সংযোগের সহাবস্থান আছে এই ফ্যাক্টস-এর সাথে যে ফ্লাইট ৯৩-এর যে ককপিট রেকর্ড প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে শেষ তিন মিনিটের কথাবার্তা নেই।

২৩. প্রমাণিত হয়েছে ৯/১১-এর দিন কি ঘটবে, সে ব্যাপারে আগে থেকে খুব ভালো করে জানা থাকা সত্ত্বেও বুশ প্রশাসন তা স্বীকার করেনি—এর সাথে সহাবস্থান করে এই সত্য যে, তারা নিজ উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে তদন্ত আটকে দেয় যা চলতে দিলে সন্ত্রাসীদের পরিকল্পিত হামলা হয়তো ঠেকিয়ে দেয়া হতো।

২৪. এফবিআই এজেন্ট মিনিয়াপোলিসে তদন্ত আটকে দিয়েছিল সহাবস্থান করে শিকাগো ও নিউ ইয়র্কেও একই ঘটনা ঘটেছে খবরের সাথে।

২৫. ৯/১১-এর আগের সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সাথে সহাবস্থান করে ৯/১১-এর পরও একইভাবে তদন্তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে খবরের সাথে।

২৬. প্রতিবন্ধকতার এইসব রিপোর্ট সহাবস্থান করে আরও অজস্র রিপোর্টের সাথে যেগুলোয় বলা হয়েছে আমেরিকা সরকার ৯/১১-এর আগে বা পরে কখনই ওসামা বিন লাদেনকে ধরার চেষ্টা করেনি। যাতে প্রমাণ হয় আমেরিকা ওসামা বিন লাদেনের হয়ে কাজ করে, নয়তো ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার হয়ে।

২৭. এসব রিপোর্ট সহাবস্থান করে হাইজ্যাকারদের সাথে সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের যোগাযোগ আছে বা ভিসা ভায়োলেশনের ব্যাপার আছে জেনেও তাদেরকে দেশে ঢোকার অনুমতি দেয়ার রিপোর্টের সাথে।

২৮. ইমিগ্রেশন ভায়োলেশনের রিপোর্টের সাথে সহাবস্থান করে একই ব্যক্তিদের আমেরিকায় ঢুকতে দেয়ার ও ফ্লাইট ট্রেইনিং নিতে দেয়ার রিপোর্টের সাথে। বিশেষ করে তাদের কয়েকজনকে মিলিটারি বেজে ফ্লাইট ট্রেইনিং নেয়ার সুযোগ দেয়ার সাথে।

BanglaBook.org

২৯. আমেরিকার বিভিন্ন ফ্লাইট স্কুলে হাইজ্যাকারদের ট্রেইনিং নেয়ার সুযোগ করে দেয়ার রিপোর্টের সাথে সহাবস্থান করে কর্তৃপক্ষ এসব খবর চেপে রাখার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল।

৩০. ৯/১১-এর বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে 'প্রজেক্ট ফর দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি' নামের এক সংস্থার ডকুমেন্ট প্রকাশের ঠিক এক বছর পর, যে সংস্থার স্রষ্টাদের মধ্যে অনেকেই পরে বুশ প্রশাসনের কেন্দ্রীয় চরিত্র হওয়ার সুযোগ পান।

৩১. ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার কারণে যে 'ইউনিফায়িং পার্ল হারবার সর্ট অব পার্পল আমেরিকান ফিউরি' ঘটে, প্রমাণিত হয়েছে তাতে বুশ প্রশাসন অনেকভাবে লাভবান হয়েছে।

৩২. বুশ প্রশাসনের মুখপাত্র ঘোষণা করেছিল আমেরিকা ২০০১-এর অক্টোবরের মাঝামাঝির আগে; তুষারপাত শুরু হওয়ার আগে আফগানিস্তানে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করছে। এ রিপোর্ট ৯/১১-এর হামলার বাস্তবতার সাথে সহাবস্থান করে, কারণ ওই ঘটনার পর আমেরিকান বাহিনী প্রায় এক মাস সময় পায় আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়ার এবং ৭ অক্টোবর ৯/১১-এর অজুহাত দেখিয়ে সে দেশে বোমা বর্ষণ শুরু করে।

৩৩. আফগানিস্তানে নর্দার্ন অ্যালায়েন্স নেতা আহমেদ মাসুদের উপস্থিতির কারণে আমেরিকান পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটতে থাকার প্রেক্ষিতে ওয়াশিংটনে সিআইএ চিফ, জর্জ টেনেটের সাথে আইএসআই চিফের বৈঠক হয়। তার পরপরই আইএসআই এজেন্টরা মাসুদকে হত্যা করে।

৩৪. রেকর্ডিঙের হোয়াইট হাউস ভার্শনে কন্ডোলিৎসা রাইসের ১৬ মে তারিখের প্রেস কনফারেন্সে যে অংশটা অস্পষ্ট ছিল বলে শোনা যায়নি, সেখানে আইএসআই চিফের কথা বলা হয়েছিল।

৩৫. জেনারেল আহমাদের ওয়াশিংটনে উপস্থিত থাকার সাথে সহাবস্থান করে এই রিপোর্ট, যাতে প্রকাশ পায় তিনি মোহাম্মদ আতার অ্যাকাউন্টে ১,৩০,০০০ ডলার ট্রান্সফার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার ফলে আমেরিকা চাপ দেয় জেনারেলকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দিতে।

৩৬. জেনারেল আহমাদের ৯/১১-এর সাথে জড়িত থাকার খবর চেপে যাওয়ার চেষ্টার খবর সহাবস্থান করে এফবিআই ও অন্যান্য ফেডারাল এজেন্সির সাঈদ শেখের পরিচয় চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টার রিপোর্টের সাথে। সে যে আইএসআই-এর এজেন্ট এবং

BanglaBook.org

সে-ই মোহাম্মদ আতার অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করেছিল, তা চেপে রাখতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল তারা।

৩৭. এফবিআই-এর হেডকোয়ার্টার্সের যে সমস্ত এজেন্টের ব্যর্থতার কারণে ৯/১১ ঘটে; যাকে পার্ল হারবারের পর আমেরিকার সবচেয়ে বড় ইন্টেলিজেন্স ব্যর্থতা বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে, তাদেরকে বরখাস্ত বা অন্য শাস্তি দেয়ার বদলে উল্টে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে খবরের সাথে এই রিপোর্ট সহাবস্থান করে, অন্যান্য ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতেও একই কাজ হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের কয়েকজনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে, কিন্তু অযোগ্যতার জন্য কাউকে শাস্তি পেতে হয়নি।

৩৮. এতবড় অযোগ্যতার জন্য কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি, এমন খবরের সাথে সহাবস্থান করে যে সমস্ত ইন্টেলিজেন্স অফিসার ৯/১১-এর ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে তদন্ত চালিয়ে যেতে চেয়েছিল, তাদের সাথে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উল্টে খারাপ আচরণ করেছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সমালোচকদের অনেকে যেটাকে *অযোগ্যতার থিয়োরি* বলে দাবি করছেন, সেটা আসলে বৃহত্তর *দৈব-সংযোগ থিয়োরির* একটা অংশ। কারণ এর সাথে অনেক এফএএ এজেন্ট, এনএমসিসি-নোরাড আর ইমিগ্রেশন অফিসার, পাইলট, আফগানিস্তানে দায়িত্ব পালনকারী আমেরিকান সমরনেতা এবং অনেক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির এজেন্ট জড়িত ছিল। তারা প্রত্যেকে ৯/১১ সম্পর্কিত বিষয়ে দৈব-সংযোগবশে চূড়ান্ত এবং অস্বাভাবিক অযোগ্যতার সাথে কাজ করে গেছে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিষয়টা দৈব-সংযোগ ছিল, এমন থিয়োরি বিশ্বাস করাতে হলে অনেক বড় সরল বিশ্বাসীর প্রয়োজন হবে। কারণ ওপরে দেখানো এতগুলো ঘটনাকে দৈব-সংযোগ দাবি করাটাই আসলে বিশাল এক *দৈব-সংযোগ*। অন্যদিকে সংশোধনবাদীরাও সবগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না। তারা এটাকে পুরোপুরি মীমাংসিত বলে দাবি করতেও পারবেন না। তারা তা করছেনও না। মেইসান তাঁর সমস্ত যুক্তি-তর্ক পাঠকদেরকে 'নিশ্চিত সত্য' বলে মেনে নিতে বলছেন না। তবে তিনি আশা করেন, তাঁরা এখানে তুলে ধরা রেফারেন্স ও প্রমাণগুলো নিজেরা যাচাই করে দেখবেন। নাফিজ আহমেদেরও একই মত।

'এ বই কোনোকিছুর নিশ্চিত প্রমাণ নয়,' বলেন তিনি। 'এটায় কেবল ৯/১১-এর ঘটনাবলীর বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরা হয়েছে।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

একটা পূর্ণ তদন্ত প্রয়োজন

আমি চেয়েছিলাম এ বইয়ে উপস্থাপন করা তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ৯/১১-এর যাবতীয় ঘটনার পিছনের সত্যতা জানতে আমাদের ফোর্থ এস্টেট বা প্রেস একটা বিস্তারিত তদন্ত চালাবে। প্রেস যখন প্রশাসনকে পথ দেখাতে এগিয়ে আসে, তখনই অফিশিয়াল তদন্ত শুরু হয়। সাধারণত এরকমটাই ঘটে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত সরকারী তদন্তের ফলাফলই চূড়ান্ত হয়। আলোচিত বিষয় নিয়ে এখন যে বিস্তারিত ধরনের তদন্তের প্রয়োজন, সেটা করা সম্ভব হলে বোঝা যাবে আগের তদন্তের সময় কোথায় কি সমস্যা হয়েছিল। কোথায় কোথায় বুশ প্রশাসনের বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল অফিশিয়াল তদন্ত কারীদের।

যৌথ তদন্ত

আমরা দেখেছি, ২০০২ সালে ইউএস সিনেটের সবগুলো ইন্টেলিজেন্স কমিটি এবং হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য একটা যৌথ তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। আমরা এটাও জেনেছি, নানা কারণে সেই কমিটির পেশ করা রিপোর্ট যথার্থ হয়নি। তার একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। সে রিপোর্টের সমাপ্তি টানা হয়েছে এই বলে যে, ইউএস ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর কাছে আসন্ন সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কিত কোনো তথ্যই ছিল না। এবং হামলা যে দেশের ভেতরেই ঘটতে পারে, সে বিষয়েও কোনো ধারণা ছিল না।

অর্থাৎ তাতে প্রকারান্তরে স্বীকার করেই নেয়া হয়েছে ফেডারাল এজেন্সিগুলোর মধ্যে বড় ধরনের গলদ আছে।

সেই রিপোর্টকে কেন্দ্র করে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোকে 'কঠোর ভাষায় নিন্দা' করেছে প্রেস। কিন্তু যে সমস্ত সমস্যার কথা তাতে উঠে এসেছে—সেসবের মধ্যে আছে এজেন্সিগুলোর মধ্যে পরস্পরের সাথে যোগাযোগের অভাব, যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অভাব, প্রতিকূল পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবে অনুধাবন বা উপলব্ধি করা এবং পাল্টা

BanglaBook.org

সতর্কতা অবলম্বন করতে না পারা—এর সবই অযোগ্যতা আর দৈব-সংযোগ থিয়োরির মধ্যে পড়ে।

যে সমস্ত প্রমাণ এ বইয়ে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে প্রায় নিশ্চিতভাবেই যৌথ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে অনেক দুর্বলতা উঠে এসেছে। তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় কমিটির সদস্যরা নিজেদের ধারণা প্রকাশ করেছেন ৯/১১-এর ঘটনার সাথে কোনো ইচ্ছেকৃত দুষ্কর্ম জড়িত ছিল, সে ধরনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সাক্ষীদের কার কত মর্যাদা আর গুরুত্ব, কমিটি সেই অনুযায়ী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে।

যেমন, এনএসএ-র অফিশিয়ালরা বলেছেন, তারা ৮ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত আল-কায়েদার সন্ত্রাসীদের হামলা সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বার্তা ইন্টারসেপ্ট করার পরও ৯/১১-এর আগে পর্যন্ত সেসব অনুবাদ করেননি। যৌথ কমিটি সেটাকে সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। এফবিআই হেডকোয়ার্টার্সের এজেন্টরা বলেছেন, তারা ফিসা (FISA)-এর বার্তার গুরুত্ব বুঝতে না পেরে ওয়ারেন্ট ইসু করেননি। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছেকৃত স্যাবোটাজের প্রমাণ থাকার পরও সেটাকে কমিটি সত্যি ধরে নিয়েছে। যৌথ তদন্ত কমিটির কাজের এরকম আরও নমুনা দেয়া যেতে পারে। এছাড়াও একটা অত্যন্ত সহজ বিষয় হলো, সমালোচকরা সরকারী ব্যাখ্যার বিপরীতে যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছেন, সেগুলোর তদন্ত খুব দ্রুত শেষ করেছে তারা। যেখানে বিষয়টা উল্টো হওয়ার কথা ছিল। তদন্তে মোট নয়টা শুনানি করেছে তারা, এবং রুদ্ধদ্বার সেশন করেছে তেরোটা।

এর সঙ্গে ভয়-ভীতি দেখানোর বিষয়টাও আছে। অভিযোগ আছে, তদন্ত কমিটির অনেক সদস্যকে নানান ভয় দেখিয়ে এমন অবস্থা করা হয়েছে, যাতে তারা কাজ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এ প্রসঙ্গটি নিয়ে পল থম্পসন অবাক করার মত একটা রিপোর্ট করেছিলেন। তাতে বলা হয়, ২০০২ সালের আগস্ট মাসে এফবিআই-এর এজেন্টরা সিনেট ও হাউস ইন্টেলিজেন্স কমিটিগুলোর আনুমানিক ৩৭ জন সদস্যকে ৯/১১-এর বিষয়ক খবরাখবর 'লিক' করার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে তারা নাকি এমন দাবিও করে যে, সিনেটর ও রিপ্রেজেন্টেটিভদেরকে 'লাই ডিটেক্টর' বা মিথ্যা সনাক্তকারী মেশিনের সাহায্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক, যাতে বোঝা যায় তারা মিথ্যে বলছেন কি না। তাঁদের টেলিফোন রেকর্ড আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যালেন্ডার চেক করা হোক।

এ প্রসঙ্গে এক আইনের প্রফেসর মন্তব্য করেছিলেন 'সাক্ষী দিতে আগ্রহীদের মনের ওপর একটা ভীতিকর চাপ সৃষ্টি করেছিল এফবিআই এজেন্টদের এই বাড়াবাড়ি।' তাদের আইন তোয়াক্কা না করার এই প্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান অনেক সিনেটর ও রিপ্রেজেন্টেটিভ। সিনেটর ম্যাককেইন বলেন 'এই সংস্থাটি এমন সব মানুষের ডোশিয়ে বা জীবন বৃত্তান্তের স্তূপ তৈরি করছে, যারা সেই সংস্থাটির বিরুদ্ধেই তদন্ত করছে।'

উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০০৮ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বারাক ওবামার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এই সিনেটর। একই প্রসঙ্গে আরেক সিনেটর মন্তব্য

BanglaBook.org

করেছিলেন, 'এসব করার মাধ্যমে এফবিআই আমাদেরকে নিরুৎসাহিত করতে চাইছে এবং আমার মনে হয় এটা চলতে থাকলে তারা নিজেদের মিশনে সফল হবে।'

যৌথ তদন্ত কমিটির এত সমস্যা ও সত্যি রিপোর্ট প্রকাশের ক্ষেত্রে নানান অন্তরায় ছাড়া আরও বড় প্রশ্ন উঠেছে সন্ত্রাসী হামলা ঘটে যাওয়ার পরপরই কংগ্রেস কেন এ বিষয়ে ফুল-স্কেল তদন্ত শুরু করল না? সে দায়িত্ব ইন্টেলিজেন্স কমিটিগুলোর হাতে তুলে দেয়ার বিষয়টা প্রমাণ করে, ততক্ষণে জানাজানি হতে বাকি ছিল না যে ৯/১১-এর হামলার সাফল্যের কারণই হচ্ছে তাদের ব্যর্থতা। জানা গেছে, এ নিয়ে আরও ব্যাপক আকারে তদন্ত চালানোর উদ্যোগ নেয়া হয়নি কারণ, হোয়াইট হাউজের তরফ থেকে কংগ্রেসম্যানদের ওপর চাপ ছিল—তাঁরা যেন তদন্তের সময়ের ব্যাপ্তি সীমিত রাখেন।

আরও জানা গেছে, প্রেসিডেন্ট বুশ ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনি, দু'জনেই সিনেট মেজরিটি লিডার, টম ডাচলের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন ফেডারাল এজেন্সিগুলোর মধ্যে এই ব্রেক ডাউন বা সমন্বয়হীনতা কেন ঘটল; যে জন্য ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলা সফল হলো, তা তদন্ত করে দেখার ভার যেন সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির ওপরই ন্যস্ত রাখা হয়। কিছু কিছু আইনপ্রণেতা এ বিষয়ে যেমন আরও বৃহত্তর তদন্তের দাবি তুলেছেন, তা যেন করা না হয়। বুশ আর চেইনি এ আবেদন জানিয়েছেন কারণ বৃহত্তর তদন্ত হলে তা নাকি দেশের সম্পদ ও পার্সোনেলদেরকে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

এই সত্যের আলোকে এটা একদম স্পষ্ট যে, জর্জ বুশ ও ডিক চেইনি অবশ্যই ৯/১১-এর মূল সন্দেহভাজনদের অন্যতম। কাজেই তাঁরাই যদি তদন্তের গতিপথ নির্দিষ্ট করে দেয়ার সুযোগ পান, তাহলে 'দুষ্কর্মে সহযোগিতার' কারণে হামলা হয়েছে নাকি 'ব্রেক ডাউনের' কারণে হয়েছে, সেটাও যেমন তাঁরাই ঠিক করে দেবেন, তেমনি তদন্তের ব্যাপ্তি কেমন হবে, সেটাও। যাঁরা আসল সন্দেহভাজন, তাঁদেরকে আমরা এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকায় মেনে নিতে পারি না।

তারপরও বলতে হয়, এত সমস্যা থাকার পরও ইউএস সিনেটের ইন্টেলিজেন্স কমিটি ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর যৌথ কমিশনের তদন্তের ফল একেবারে বৃথা যায়নি। বুশের জন্য ক্ষতিকর অনেক ধারণা, উপলব্ধি প্রভৃতি বেরিয়ে এসেছে সেই তদন্ত থেকে। তাই প্রথম থেকে ৯/১১ সম্পর্কিত কোনো ধরনের স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিং কমিটি গঠন করার প্রবল বিরোধীতা করে আসার পরও শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে তাঁকে।

বলতে গেলে এ রকম নিরুপায় হয়েই এর ওপর গঠিত দ্য ন্যাশনাল কমিশন অন টেররিস্ট অ্যাটাক; যার আরেক নাম ৯/১১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন, তাকে সমর্থন জানাতে হয়েছে।

দ্য নাইন/ইলেভেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন

শেষ পর্যন্ত নাইন/ইলেভেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন গঠিত হলেও সমস্যার অন্ত নেই সেটার বেলায়ও। নানান সমস্যায় জর্জরিত সেটা। প্রথম ও প্রধান সমস্যা হলো, কমিশনের

BanglaBook.org

কাজের ব্যাপারে প্রথম থেকেই বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে বুশ প্রশাসন। কমিশনের সামনে তাৎক্ষণিক বাধা ছিল কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম টাকা বরাদ্দ করা। ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে এ খাতে মাত্র ৩ মিলিয়ন ডলার অনুমোদন দেয়া হয় কমিশনকে। অথচ ১৯৯৬ সালে অনেক ছোটো একটা কাজ; অনুমোদিত গ্যাম্বলিং সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল ফেডারাল কমিশনকে। ২০০৩-এর মার্চ মাসে নাইন/ইলেভেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন বুশ প্রশাসনের কাজে তদন্তের স্বার্থে আরও ১১ মিলিয়ন ডলারের অনুমোদন চেয়েছিল। কিন্তু সে আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়।

একজন কমিশনার এ প্রসঙ্গে বলেন, কাজের তুলনায় এই পরিমাণ টাকা বরাদ্দের দাবি মোটেই অতিরিক্ত ছিল না। কারণ কলম্বিয়া শাটল বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ তদন্ত করতে গঠিত কমিশনকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল ৫০ মিলিয়ন। ৯/১১-এর হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সংগঠনের এক নেতা স্টিফেন পুশ বলেন, 'বাড়তি টাকা বরাদ্দ দেয়ার দাবি অগ্রাহ্য করার কারণ, বুশ প্রশাসন চাইছিল নাইন/ইলেভেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন ব্যর্থ হোক। তারা কখনই চায়নি এই কমিশন গঠিত হোক। আমার ধারণা হোয়াইট হাউজ সব সময় চেয়েছে কমিশন যাতে ধুঁকে ধুঁকে মরে। অপরাধীদের দিকে আঙুল নির্দেশ করতে না পারে।

অনেক সময় নষ্ট করার পর অবশেষে বাড়তি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এরপর নতুন এক সমস্যায় পড়ে কমিশন। ২০০৪ সালের মে মাসের মধ্যে তাদেরকে কাজ অবশ্যই শেষ করতে হবে, এরকম সময়সীমা বেঁধে দেয় বুশ প্রশাসন। তারপর কমিশন যাঁরা পরিচালনা করবেন, সেইসব পার্সোনেলদের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ইসু করার ব্যাপারেও অনর্থক সময় নষ্ট করতে থাকে তারা। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে একজন সাবেক রিপাবলিকান সিনেটর, স্লেড গর্টন ইন্টেলিজেন্স সংক্রান্ত কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। ২০০৩ সালের ১২ মার্চ পর্যন্ত তাঁর সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ইসু করা হয়নি।

৯/১১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন সাবেক ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসম্যান লি হ্যামিলটন। এ জন্য তিনি বলেন, 'স্লেড গর্টনের মতো মানুষকেও সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের জন্য কাজ বন্ধ করে বসে থাকতে হয়, এটা ভারি অদ্ভুত কথা।'

বুশ প্রশাসন এভাবে নানান কারণ দেখিয়ে সময় নষ্ট করতে থাকায় কমিশনকে কাজ শুরু করতে ২০০৩ সালের মে মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। আগেই কমিশনের সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছিল, ২০০৪ সালের মে মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে। সেই হিসেবে কাজ শেষ করার জন্য তখন এক বছরেরও কম সময় ছিল তাদের হাতে।

কমিশনের সামনে আরেক সমস্যা ছিল প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও সাক্ষী জোগাড়ে প্রশাসনের বাধা দেয়া। এছাড়া যৌথ তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্টকে কমিশনের 'পয়েন্ট অব ডিপারচার' হিসেবে ব্যবহারের কথা থাকলেও বুশ প্রশাসন সে রিপোর্ট প্রকাশ করতে ২০০৩ সালের জুলাই মাসের শেষদিক পর্যন্ত সময় নেয়। তার ওপর, রিপোর্ট প্রকাশ করার কিছুদিন আগে কমিশনের চেয়ারম্যান, টমাস এইচ. কিন অভিযোগ করেন, জাস্টিস ডিপার্টমেন্টসহ অন্যান্য ফেডারাল এজেন্সিগুলো ডকুমেন্ট আটকে

BanglaBook.org

রেখেছে। এসব সত্যি হলে বুঝতে হবে হোয়াইট হাউজের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ না থাকলে তারা এ কাজ করত না।

এছাড়া কিন আরও অভিযোগ করেন, ফেডারাল এজেন্সিগুলো দাবি করতে থাকে যে, যখনই তাদের কোনো কর্মচারীকে কমিশনের সামনে সাক্ষী দিতে ডাকা হবে, তখন 'মাইন্ডার' বা যে তাকে সনাক্ত করেছে, তাকেও সেখানে হাজির রাখতে হবে। যেটাকে কিন স্বভাবতই ধরে নিয়েছেন সনাক্তকারীদের ভয়-ভীতি দেখানোর জন্যই এ দাবি করেছে তারা। হোয়াইট হাউজ এমন আভাসও দিয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট কোনো সাক্ষী দেবেন না। অন্তত শপথ গ্রহণ করে নয়।

৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপারে যে হাজারো সন্দেহ আর প্রশ্ন উঠেছে, তার আলোকে বলা যায়, এত সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ডিঙিয়ে নাইন/ইলেভেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশনকে সঠিক জবাবটি খুঁজে বের করতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নানান সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে, যদি কমিশন তার জন্য বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েও থাকে।

২০০৩ সালের অক্টোবরে কমিশনের এক সদস্য, সাবেক ডেমোক্র্যাট সিনেটর ম্যাক্স ক্লিল্যান্ড *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর রিপোর্টার ফিলিপ শেননকে বলেন, কমিশন নির্ধারিত সময় ২০০৪ সালের মে মাসের মধ্যে তার কাজ শেষ করতে পারবে না। তিনি অভিযোগ করেন, 'কোনো সন্দেহ নেই হোয়াইট হাউজ চাইছে আমাদের সময় ফুরিয়ে যাক... আমাদেরকে হোয়াইট হাউজের অ্যাসিসটেন্টদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট আদায় করতে তাদের পিছনে লেগে থাকতে হচ্ছে। এসব অত্যন্ত বিরক্তিকর।' ক্লিল্যান্ড একজন ডেমোক্র্যাট হয়েও কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত সহযোগিতা পাচ্ছেন না। ওদিকে স্লেড গর্টন অভিযোগ করেছেন, সহযোগিতার অভাবের জন্য কমিশনের সময়মতো কাজ শেষ করা খুব কঠিন হবে।

এ ক্ষেত্রে একমাত্র বুশ প্রশাসনই বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিল, ব্যাপারটা সেরকমও নয়। আরও একটা সন্দেহের কারণ ছিল। তা হলো কমিশনের রিপোর্টে অনেক প্রশ্নের জবাব থাকবে, যাতে বোঝা যাবে এর নেতাদের কমিশনের কাজ সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত সীমিত। 'কমিশনের দৃষ্টি থাকবে ভবিষ্যতের দিকে,' বলেছেন কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান, হ্যামিলটন। 'আমরা অভিযোগ পরিমাপ করার ব্যাপারে আগ্রহী নই। কারণ আমরা মনে করি না ওটা কমিশনের দায়িত্ব।'

এ ঘটনায় অযোগ্যতার প্রশ্নে যে সমস্ত সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, যৌথ কমিশন সেগুলো নিয়েই এগিয়েছে। যাতে অফিশিয়াল দুষ্কর্মের অভিযোগ নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করার বিশেষ সুযোগ না থাকে। হ্যামিলটনের এ কথায় বোঝা যায় কমিশন অযোগ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অভিযোগ মূল্যায়ন করবে না। তাঁর মতে, 'কমিশনের দৃষ্টি থাকবে ভবিষ্যতের দিকে।' এতে হ্যামিলটন সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছেন ৯/১১-এর নয়, ভবিষ্যতে যাতে আর কখনও 'ব্রেক ডাউন' না ঘটে, তাঁরা সেটাই নিশ্চিত করতে বেশি আগ্রহী।

আমাদের সামনে অফিশিয়াল ব্যাখ্যার সমালোচকদের তোলা বিভিন্ন প্রশ্ন আছে, তার

BanglaBoi.org

সাথে অন্তর্নিহিত বিকল্প থিয়োরিও আছে। কাজেই সে ক্ষেত্রে কমিশনের এই সীমিত উদ্যোগ যে হাস্যকর হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ৯/১১ কিভাবে সংঘটিত হয়েছে, তার যে কোনো ব্যাখ্যাতেই উঠে আসবে হয় আমেরিকান সরকারের সর্বোচ্চ মহলের দুষ্কর্মে সহযোগিতার কারণে হয়েছে, নয়তো অভাবিতপূর্ব কোনো সিস্টেম ব্রেক ডাউনের কারণে হয়েছে। যার ফলে এমন এক প্রকাশ্য হামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আমেরিকা ব্যর্থ হয়েছে—অথচ দেশটির 'প্রতিরক্ষা' আর 'ইন্টেলিজেন্স' খাতে প্রতি বছর ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়।

কমিশন যদি এই দুই ব্যাখ্যার একটাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়, যদি অভিযোগের গুরুত্ব পরিমাপ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেটা হবে কর্তব্যে গুরুতর অবহেলার শামিল। আমরা এমন এক তদন্ত চাই, যাতে যার দায় তার ঘাড়েই চাপে। আমরা এমন এক তদন্ত কমিশন চাই, যেটা ৯/১১ অফিশিয়ালদের দুষ্কর্মের ফল, নাকি ভয়াবহ অযোগ্যতার ফল, এ প্রশ্ন তুলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। হ্যামিলটন ও কমিশনের অন্যান্যদের ওপর দোষ চাপানো ঠিক হবে না। কারণ তাদেরকে তদন্তের উদ্যোগ সীমিত রাখতে হয়তো বাধ্য করা হয়েছে।

আমি রিপোর্ট পড়ে জানতে পেরেছি, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ৯/১১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশনকে কাজ করার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন একমাত্র এই শর্তে যে, আগামীতে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে তা প্রতিহত করতে কর্তৃপক্ষকে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে, কমিশন তদন্ত করে তা নির্ধারণ করবে। আরেক কথায় এর অর্থ হলো, কমিশন কেবল নামেই স্বাধীন হবে, তদন্তের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সেটার কিছুই করার থাকবে না।

যা হোক, কমিশনের ম্যান্ডেটের ব্যাপারে সত্যি যেটাই হোক না কেন, এক শর্তে সেটাকে অনুমোদন দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বুশ। সেটা হলো, কমিশনের চেয়ারম্যান তিনি নিজে নিয়োগ দেবেন। এ ক্ষেত্রে বুশের প্রথম পছন্দ ছিলেন আমেরিকার এক সময়কার পররাষ্ট্র মন্ত্রি, হেনরি কিসিঞ্জার। তাঁর এই পছন্দ নিয়ে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্বাধীন কমিশনকে নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে কিসিঞ্জার কতখানি সক্ষম, তা নিয়ে ব্যাপক সন্দেহ ছিল সবার মনে।

নিউ ইয়র্ক টাইমস এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে যে হোয়াইট হাউজ ৯/১১ প্রসঙ্গে তদন্ত চালাতে প্রথম থেকেই নারাজ ছিল, সেই হোয়াইট হাউজ মিস্টার কিসিঞ্জারের ইচ্ছাকেই কায়দা করে এ ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে চেয়েছিল কি না, সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। কিসিঞ্জারের নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারা নিয়ে সন্দেহ থাকার কারণ হলো সম্ভাব্য স্বার্থের দ্বন্দ্ব। সউদি আরবে বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করা আমেরিকান কর্পোরেশনগুলোর কাছ থেকে প্রচুর কনসালটিং ফি পেয়ে থাকেন হেনরি কিসিঞ্জার। সেই সউদি আরব আল-কায়েদার প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং সেই দেশের বিরুদ্ধেই ৯/১১-এর হাইজ্যাকারদের সরবরাহ করার অভিযোগ উঠেছে। তাছাড়া আফগানিস্তান ও পাকিস্তান হয়ে যে কোম্পানির তেল ও গ্যাস পাইপ লাইন আরব সাগর পর্যন্ত যাওয়ার কথা ছিল, সেই ইউনোকালের সাথে তাঁর সখ্যতার কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

এখানে নিশ্চিত সমস্যা ছিল, ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলা আফগানিস্তানে আমেরিকান হামলার কারণ নয়, আর কিছু ছিল। আমরা এ নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি। হামলা করার পর ইউনোকালের এক প্রাক্তন কর্মচারী, হামিদ কারজাই-এর নেতৃত্বে একটা পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসায় আমেরিকা এবং প্রস্তাবিত পাইপ লাইন রুট বরাবর অনেকগুলো মিলিটারি ঘাঁটি বসায়।

তাই জর্জ বুশ ৯/১১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশনের চেয়ারম্যান পদে এমন একজনকে বসাতে চেয়েছিলেন, যার সাথে ইউনোকালের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত আছে। এবং চেয়ারম্যানের নিরপেক্ষ কাজ করা নিয়ে তার বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা ছিল না। জানা যায়, সউদি আরবও নাকি সেরকম প্রস্তাবই দিয়েছিল। বুশ ঘোষণা দিয়েছিলেন কিসিঞ্জারকে তাঁর মক্কেলদের পরিচয় প্রকাশ করতে হবে না। কিন্তু কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিস মত দেয় উল্টো। পরে কিসিঞ্জার রিজাইন করেন।

এই টানা-হ্যাঁচড়ার মধ্য দিয়ে টমাস কিন কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পান। এক সময় তিনি নিউ জার্সির গভর্নর ছিলেন। চেয়ারম্যান পদে যখন নিয়োগ পান, তখন ছিলেন ড্রিউ ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট। যেহেতু তাঁকে ইউনিভার্সিটির সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করতে হয়, সেহেতু কমিশনের পিছনে বেশি সময় দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। টমাস কিনেরও স্বার্থের দ্বন্দ্বের অভিযোগ তোলেন সমালোচকরা। কারণ তিনি ছিলেন আরেক তেল কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর সদস্য। আমেরাডা হেস (Amerada Hess) নাম সেটার।

সেন্ট্রাল এশিয়ায় আমেরাডা হেসও বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল। সউদি তেল কোম্পানি, ডেল্টা অয়েল-এর সাথে মিলে হেস-ডেল্টা কোম্পানি গঠন করে তারা। সেন্টগ্যাস (CentGas) কনসোর্টিয়ামের অন্যতম কোম্পানি ছিল আমেরাডা হেস। কনসোর্টিয়ামের আরও যে সমস্ত সদস্য ছিল, তাদের সবার সাথেই সবার স্বার্থের দ্বন্দ্ব ছিল বলে জানা গেছে।

এখানে আরও এক সমস্যা ছিল। কমিটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ফিলিপ জেলিকো-কে ৯/১১ তদন্ত কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট বুশ। তাঁর প্রশাসনের সাথে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল ফিলিপ জেলিকো-র। ৯/১১-এর কিছুদিন পর জর্জ বুশের ফরেন ইন্টেলিজেন্স অ্যাডভাইজরি বোর্ডে নিয়োগ পেয়েছিলেন তিনি। তার আগে সিনিয়র জর্জ বুশ যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে কন্ডোলিৎসা রাইসের সাথে কাজ করার সুযোগ হয় তাঁর। পরে রাইসের সাথে যৌথভাবে একটা বইও লেখেন।

এঁদের সমন্বয়ে গঠিত স্বাধীন কমিশন নিয়ে হামলার শিকার পরিবারগুলোর সংগঠন, ফ্যামিলিজ অব সেপ্টেম্বর ১১-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, স্টিফেন পুশ মন্তব্য করেছিলেন, 'সত্যিকার অর্থে স্বাধীন, এমন কোনো কমিশনার বা স্টাফকে কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।' পরে নিজের অস্বস্তির কথা উল্লেখ করে তিনি ইঙ্গিত করেন কন্ডোলিৎসা রাইসের সাথে এই ফিলিপ জেলিকো-র সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ। কমিশনের অন্যসব তদন্ত কারীর সাথেও ঘনিষ্ঠতা আছে। পরে দ্য ফ্যামিলি স্টিয়ারিং কমিটি ফর দ্য ৯/১১

BanglaBook.org

ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন জেলিকোকে পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বানও জানিয়েছিল।

পরে কমিশনের গঠন-প্রকৃতি দেখে সাধারণ মানুষের মনে সঙ্গত কারণেই সন্দেহ জাগতে শুরু করে যে, ৯/১১-এর সাথে বুশ প্রশাসনের জড়িত থাকার প্রমাণ অন্তত এই 'স্বাধীন' কমিশনের মাধ্যমে কখনোই নিরপেক্ষভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে খতিয়ে দেখা হবে না এবং আসল রিপোর্ট আলোর মুখ দেখবে না। কমিশনে কিছু কিছু ভালো ও সৎ মানুষকেও নিয়োগ দেয়া হয়, নানান ইসু তদন্তে অনেকগুলো কমিটিও গঠন করা হয়। হ্যামিলটনের বক্তব্যে জানা যায়, টমাস কিনের নেতৃত্বে কমিটিগুলো তাঁর বেঁধে দেয়া গণ্ডির বাইরেও কাজ করতে থাকে। তবে বেশিদূর যেতে পারেনি তারা। তারপরও ২০০৩ সালের অক্টোবরের শেষদিকে জানা যায়, কমিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে 'ভবিষ্যতের জন্য কর্মপন্থা ঠিক করা।'

হোয়াইট হাউজসহ বিভিন্ন এজেন্সির বাধার মুখে এক সময় কিনের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেয়া হয় বুশ প্রশাসন ও অন্যান্য এজেন্সি যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ চেপে রাখার চেষ্টা করছে, তিনি সেগুলো হাতে পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। একই মাসে টমাস কিন ফেডারাল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FAA)-এর উদ্দেশে একটা তলবনামা বা সমন জারি করেন। যাতে বলা হয় 'এফএএসহ যে এজেন্সির কাছেই স্বাধীন তদন্ত কমিশন ৯/১১ সম্পর্কিত ডকুমেন্ট চেয়ে পাঠাবে, সেটাকে অবশ্যই কোর্টের সমনের মতো গুরুত্ব দিতে হবে তাদেরকে।'

এক সাক্ষাৎকারে কিন এ কথাও বলেন যদি দেখা যায় হোয়াইট হাউসকে সমন পাঠানো প্রয়োজন, তাহলে তিনি তাই করবেন। তিনি দৃঢ় ভাষায় বলেন, 'এই তদন্তের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ডকুমেন্টই আমাদের নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। আমি কোনো ধরনের বাধা সহ্য করব না। আমাদের প্রয়োজনীয় প্রতিটা ডকুমেন্ট হাতে পেতে আমরা সব ধরনের পদক্ষেপ নেবো... ৯/১১ নিয়ে অনেক ধরনের থিয়োরি চালু আছে। যদি কোনো ডকুমেন্টে সেসবের সংশ্লিষ্টতা আছে বোঝা যায়, আমরা সেগুলোও চেক করব। প্রতিটা প্রশ্নের জবাব চাই আমরা।'

এসব শুনে সংশ্লিষ্টদের ধারণা জন্মায়, ৯/১১ যে অযোগ্যতার কারণে নয়, উঁচু পর্যায়ের দুষ্কর্মের ফলে ঘটেছে, সেদিকে ইঙ্গিত করতেই তিনি পরোক্ষে এসব বলেছেন—কমিশন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য-প্রমাণ হাতে পেতে আগ্রহী। এ সম্ভাবনার কথা ম্যাক্স ক্লিল্যান্ডও এক বিবৃতিতে এভাবে বলেছিলেন 'যত দিন গড়াতে থাকে, ততই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে, ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে এই সরকার যতখানি জানে বলে এতদিন স্বীকার করে এসেছে, তারচেয়ে আসলে অনেক বেশি জানে।'

কিন্তু সেখানে এমন সম্ভাবনাও ছিল যে, এসব আসলে কথার কারসাজি। কারণ কেনের চারিত্রিক সততা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে যে ধারণাই থাকুক না কেন, এ পদে তাঁকে নিয়োগ দিয়েছিলেন স্বয়ং জর্জ বুশ। যখন এ কমিশন গঠন করা হয়, তখন খুব কম লোকই জানত যে ঘটনার পিছনে বুশ প্রশাসনের দুষ্কর্ম থাকতে পারে। ওই সময় জর্জ বুশের চাপাচাপিতে কমিশনের চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার

BanglaBook.org

কিছু থাকবে না। কিন্তু পরে দেখা যায় যারা বিষয়টা জানত, তাদের মনে ব্যাপক সন্দেহ জাগে যে কিসিঞ্জারের মতো তাঁকেও সত্যি ঘটনা চেপে যাওয়ার জন্যই এ পদে বসিয়েছেন বুশ।

সন্দেহটা হয়তো একেবারে বৃথা যেত না, যদি টমাস কিন তাঁর পার্টি ও প্রেসিডেন্টের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের স্বার্থে কমিশনের উদঘাটিত দুষ্কর্মের তথ্য-প্রমাণ চেপে যেতেন। কেননা জর্জ বুশের মতো কিনও একজন রিপাবলিকান। এবং তিনি স্বাধীনচেতা হিসেবেই পরিচিত। প্রেসিডেন্ট তাঁকে কিসিঞ্জারের পরিবর্তে বেছে নিয়েছিলেন সম্ভবত তিনি কমিশনের চেয়ারম্যান হলে জর্জ বুশ নিরাপদ থাকবেন বলে নয়, প্রশাসন আর কোনো বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে চাইছিল না বলে।

যা হোক, জেলিকোর মতো কিনকেও প্রেসিডেন্টই নিয়োগ দিয়েছিলেন। কাজেই তিনি যদি প্রেসিডেন্ট ও তাঁর প্রশাসনের সমস্ত দোষ চেপে যেতেন, তাহলে মানুষ অবশ্যই সন্দেহ করত। বিশেষ করে যাদের জানা ছিল কি ধরনের অভিযোগ উঠেছে প্রশাসনের বিরুদ্ধে। তারা সেটাকে 'চেপে যাওয়া' বলে ধরে নিত, যদি তা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিও হতো।

এ ধরনের ব্যর্থতা নিয়ে কথা ওঠে নভেম্বর, ২০০৩-এ। প্রেসিডেন্টের প্রতিদিন সকালের পিডিবি বা প্রেসিডেনশিয়াল ডেইলি ব্রিফস তদন্তের নামে প্রকাশ করে দেয়ার ব্যাপারে কিনের কাছে বিধিনিষেধ আরোপ করার দাবি জানায় হোয়াইট হাউজ। কিন তাতে মত দেন। এখানে একটা পিডিবি-র কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেটা ছিল ২০০১ সালের ৬ আগস্ট সকালের পিডিবি (অধ্যায় ৫ দেখুন)। তাতে প্রেসিডেন্ট বুশকে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের পাঠানো এক মেমো ছিল। যাতে বলা হয় সন্ত্রাসীরা হাইজ্যাক করা এয়ারপ্লেনকে মিসাইলের মত ব্যবহার করে আমেরিকার বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

হোয়াইট হাউজ এ ব্যাপারে কিনের সাথে একটা মৌখিক চুক্তি করে। সেটা হলো এই ব্রিফ কমিশনের কাছে পাঠানোর আগে তাদেরকে সম্পাদনা (এডিটিং) করতে দিতে হবে। কিন তাতে রাজি হন। স্থির হয়, কমিশনের অল্প কয়েকজন সদস্যকে সেই সম্পাদনা করা ব্রিফ দেখার অনুমতি দেয়া হবে। ক্লিল্যান্ডের বর্ণনা অনুযায়ী চুক্তিটা ছিল এরকম

কমিশনারদের কয়েকজন সেই পিডিবি-র খানিকটা দেখতে পাবেন, যেটাকে হোয়াইট হাউজ প্রাসঙ্গিক বলে দাবি করেছে। তারপর যারা সেটা দেখবেন, তারা অন্য কমিশনারদের বোঝাবেন, হোয়াইট হাউজ সেখানে কোন কথা থাকলে উপযুক্ত হবে ভাবছে... কিন্তু তার আগে প্রথম দলের কমিশনারদেরকে হোয়াইট হাউজে রিপোর্ট করে জানাতে হবে যে, তারা দ্বিতীয় দলটিকে কি জানাতে যাচ্ছেন।

ক্লিল্যান্ড বলেন এই চুক্তির অর্থ হলো, 'কংগ্রেস ও আমেরিকান জনগণের প্রতি কমিশনারদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য, তারা তা পালন করতে পারবেন না।' স্বাধীন তদন্ত কমিশনের কমিশনারদের যেখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিটা ডকুমেন্ট দেখার ও পড়ার অধিকার রয়েছে, সেখানে প্রেসিডেন্ট বুশ তাদেরকে কোন তথ্য দেখাবেন আর কোনটা দেখাবেন না, তা নিয়ে বাগান থেকে চেরি ফল আহরণ (চেরি-পিকিং) করছেন বলে একে 'হাস্যকর'

BanglaBook.org

মন্তব্য করেন ডেমোক্র্যাট ক্লিল্যান্ড।

হোয়াইট হাউজের এই সিদ্ধান্তের ফলে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে বিভক্তি দেখা দিলে তিনি এটাকে 'ব্যাড ডিল' আখ্যা দিয়ে দাবি করেন, স্বাধীন কমিশনকে অবশ্যই স্বাধীন থাকতে দেয়া উচিত। কারও সাথে তার চুক্তি করার প্রয়োজন নেই। ... আমি মনে করি, একটা স্বাধীন তদন্ত কমিশনকে কোনো এজেন্সি বা হোয়াইট হাউজ কোন পথে চলতে হবে, তা বলে দিতে পারে না। নির্দেশ দিতে পারে না সেটার কমিশনাররা কোন ডকুমেন্ট দেখবেন, কতটুকু দেখবেন। কোনটা নিয়ে আমরা ডিল করব কি করব না। যদি কেউ এ ধরনের চুক্তি করতে চায়, আমরা সমন জারি করব।

কঠোর ভাষার এই অভিযোগে ক্লিল্যান্ড বলেন, 'ওই সিদ্ধান্ত সোজা কথায় ৯/১১ মিশনের গন্তব্য নির্ধারণ করে দেয়।' অন্য এক ডেমোক্র্যাট কমিশনার, টিমোথি রোমারও এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে পাল্টা অভিযোগ করেন, 'একটা নয় পাতার রিপোর্টকে হোয়াইট হাউজ হয়তো মাত্র দুই কি তিন প্যারাগ্রাফে নামিয়ে আনবে। কোনো "স্মোকিং গান" থাকলে তা আড়ালে পড়ে যাবে।'

৯/১১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশনের ফ্যামিলি স্টিয়ারিং কমিটি 'অগ্রহণযোগ্য' বলে প্রত্যাখ্যান করে হোয়াইট হাউজের এই সিদ্ধান্তকে। ঘোষণা করে কমিশনের উচিত এ ব্যাপারে একটা বিবৃতি প্রকাশ করে আমেরিকান জনগণকে বিস্তারিত খুলে জানানো যে, কেন তাদেরকে সিআইএ বা নির্বাহী শাখার বিরুদ্ধে সমন জারি করার পরিবর্তে এই শর্ত মেনে নিতে হয়েছে।' স্পোকসপার্সন ক্রিস্টেন ব্রিয়ারওয়েইজার এর সাথে যোগ করেন 'এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন এবং এটার কাজকর্ম স্বচ্ছ হওয়া উচিত।'

যারা প্রেসিডেন্ট বুশ ও তাঁর প্রশাসনকে ৯/১১ ঘটনাবলীর সাথে জড়িত থাকার সন্দেহ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য আন্তরিকভাবে দেন-দরবার করছিলেন, এসব ঘটনা জানার পর তাদের উচিত হবে এ ব্যাপারে একটা পূর্ণ তদন্ত চালানোর আয়োজন করা। সেটা হতে পারে একজন স্পেশাল প্রসিকিউটরের অধীনে, যাঁর কাজ নিয়ে কারও মনে সন্দেহ জাগবে না। ৯/১১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশনের তদন্তের সিদ্ধান্ত যা-ই হোক না কেন, সবারই সেটাকে সমর্থন জানানো উচিত।

অর্থাৎ, যদি কমিশনের তদন্তের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে এ ঘটনার সাথে বুশ প্রশাসনের কোনোরকম দুষ্কর্ম জড়িত ছিল, অথবা জড়িত থাকার কোনোরকম সম্ভাবনা ছিল, তাহলে নতুন করে তদন্ত চালানোর জন্য একজন স্পেশাল প্রসিকিউটর নিয়োগ করার প্রয়োজন পড়বে। স্বাধীন তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান ও এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পদে নিজের পছন্দের লোক বসিয়ে জর্জ বুশ সত্য প্রকাশ হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন বলে যে ব্যাপক অভিযোগ উঠেছিল, তার সত্যতা আরেকবার যাচাই করে দেখার জন্য।

পরের ঘটনাবলী

এই বইয়ের পাণ্ডুলিপির কাজ মোটামুটি শেষ হওয়ার পর বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় ঢিল জায়গামতোই লেগেছে। এখন এটা আরও পরিষ্কার যে বিষয়টা নতুন করে তদন্ত করা উচিত। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর মধ্যে আছে কিছু পাবলিকেশন বা

BanglaBook.org

ছাপা হওয়া বিষয়, দু'জন প্রেসিডেনশিয়াল পদপ্রার্থী, একটা মামলা, এবং ৯/১১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন প্রসঙ্গ।

ছাপা হওয়া বিষয় এ বইয়ে যে সব অস্বস্তিকর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সাম্প্রতিক কিছু লেখালেখিতে সেগুলোরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তার ধরন দেখে বোঝা যায় সহজে মানুষের মন থেকে বিষয়টা মুছে যাওয়ার নয়। বরং যতদিন এসব প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব না পাওয়া যাবে, ততদিন বারবার করে আলোচনায় উঠে আসবে ৯/১১। এরকম একটা লেখা ছাপা হয় ২০০৩-এর সেপ্টেম্বরে, লন্ডনের *গার্ডিয়ান* পত্রিকায়। লিখেছেন ব্রিটিশ পরিবেশ মন্ত্রি, মাইকেল মিচার।

তিনি লিখেছিলেন ২০০০ সালে প্রকাশ হওয়া প্রজেক্ট ফর দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি (PNAC)-এর ডকুমেন্টে সুস্পষ্টভাবেই বলা আছে, 'নতুন একটা পার্ল হারবার' সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের এজেন্ডা কার্যকর করা কঠিন হবে। মিচারের মতে, 'ওই দলিলেই পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা আছে ৯/১১-এর আগে, সেই দিন, এবং তার পরে কি ঘটেছে। ওই ঘটনা আমেরিকার গ্লোবাল ওয়ার অন টেররিজম-এ জড়িয়ে পড়ার মতো কিছু ছিল কি না।'

সেদিনের আগের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে মাইকেল মিচার বলেন, আমেরিকা হামলা ঠেকানোর জন্য বলতে গেলে কিছুই করেনি, বা করে থাকলেও খুব সামান্যই করেছে। যদিও ১১ টা দেশের পক্ষ থেকে ৯/১১-এর আসন্ন সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে ওয়াশিংটনকে বারবার সতর্ক করা হয়েছিল। তারপরও দেশটির এই ধীর প্রতিক্রিয়া সত্যিই 'বিস্ময়কর।' ওয়াশিংটনের দশ মাইলের মধ্যে অ্যান্ড্রুজ এয়ার ফোর্স বেজ। অথচ তৃতীয় হাইজ্যাক হওয়া প্লেন ৯:৩৮ মিনিটে পেন্টাগনে হামলা না চালানো পর্যন্ত সেখান থেকে একটা ফাইটার প্লেনও আকাশে উড়ল না। কেন উড়ল না? হাইজ্যাক হওয়া প্লেন ইন্টারসেপ্ট করার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে। কোনো প্লেন তার নির্ধারিত রুট থেকে সরে গেলে ফাইটার প্লেন পাঠাতে হবে কারণ তদন্ত করে দেখতে। এফএএ সেদিন তা অনুসরণ করেনি কেন?

এরপর একটি মোক্ষম প্রশ্ন করেন মিচার 'কর্তৃপক্ষের এই হাত গুটিয়ে বসে থাকার কারণ কি? ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা? নাকি আমেরিকার এয়ার সিকিউরিটি অপারেশনস সেদিনের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে "স্টুড ডাউন" ছিল? তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে কেন? কার নির্দেশে? এর সাথে মিচার যোগ করেন সে দেশের সাবেক ফেডারাল ক্রাইমস প্রসিকিউটর, জন লোফটাসের একটা মন্তব্য। তিনি বলেছিলেন ঘটনার আগে ইওরোপিয়ান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসগুলো ৯/১১ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাঠিয়েছে। কাজেই এরপর সিআইএ বা এফবিআই, কারও 'অযোগ্যতা' বা আর কিছুর আড়ালে আশ্রয় নেয়ার উপায় নেই।'

আমেরিকার ৯/১১ পরবর্তী কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে মাইকেল মিচার বলেন প্রজেক্ট ফর দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরির কার্যক্রম শুরু করার চমৎকার একটা সুযোগ এনে দিয়েছে ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলা।

BanglaBook.org

মিচারের সেই আর্টিকল যথেষ্ট ঝড় তোলে ইওরোপ-আমেরিকায়। তার কিছুটা প্রতিফলিত হয় একই পত্রিকার ডিপ্লোম্যাটিক বা কূটনৈতিক এডিটর, ইউয়েন ম্যাকআসকিলের লেখা 'ফিউরি ওভার মিচার ক্লেইমস' আর্টিকলে। তিনি লেখেন, মিচারের বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে লন্ডনের আমেরিকান দূতাবাসের এক মুখপাত্র তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। বলেছেন : মিস্টার মিচারের এই সমস্ত 'ফ্যান্টাস্টিক' অভিযোগ; বিশেষ করে যেখানে নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভানিয়া এবং ভার্জিনিয়ায় ৩ হাজার নিরীহ, সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসীদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে আর আমেরিকা চুপচাপ দেখে গেছে, এমন অভিযোগ একেবারেই অর্থহীন। অবিশ্বাস্য। আক্রমণাত্মক। যদি সেসব কোনো গুরুত্বপূর্ণ মহল থেকে উঠে থাকে।'

এসব 'ফ্যান্টাস্টিক অভিযোগ' হলে মিচারকে গুরুত্বহীন বলে সহজেই উড়িয়ে দেয়া যেতে পারত। কিন্তু তারপরও কয়েক বছর আগের পদেই বহাল ছিলেন ব্রিটিশ পরিবেশ মন্ত্রি, মাইকেল মিচার। তিনি 'আসন্ন তেল সঙ্কট' নিয়ে অভ্যন্তরীণ কিছু আলাপ-আলোচনা সম্পর্কেও জানতেন। এছাড়া লন্ডনের *সানডে টাইমস*-এ তাঁকে সমর্থন জানিয়ে একটা আর্টিকলও লেখা হয়। সেটার শিরোনাম ছিল মিচার লার্চড ইন টু দ্য টোয়াইলাইট জোন, মিচার আলোকিত ভুবনে বেরিয়ে এসেছেন।

অন্যদিকে মিচারের আর্টিকল বিশ্বে যথেষ্ট সাড়া ফেলে দেয়। আমেরিকার এক পাঠক *গার্ডিয়ান*-এর সম্পাদককে চিঠিতে যা লিখেছেন, তার বাংলা অনেকটা এরকম দাঁড়ায় এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই যে, মিস্টার মিচারের উপলব্ধির করাত তাদের হাড় কাটতে উদ্যত হওয়ায় আমাদের সরকারের 'ফিউরি' হয়েছে। আরেক আমেরিকান লেখেন 'প্লিজ, মিস্টার মিচারকে জানিয়ে দেবেন, সঠিক বিশ্লেষণ শুনে কে রাগে গর্জন করল আর কে অভিযোগ অস্বীকার করল, সেদিকে কান দেয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর মতো একই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আরও অনেকেই আছে। তাঁর বক্তব্য ছাপানোর দুঃসাহস দেখানোর জন্য *গার্ডিয়ান*-এর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।'

ইংল্যান্ডের এক লেখক লিখেছেন: প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ রাজনীতিক হিসেবে মিস্টার মিচারকে প্রশংসা জানাই অনেকের জানা পুরনো একটা সত্যের ব্যাপারে মুখ খোলার জন্য। কিন্তু বাকি সব সিনিয়র লেবার পার্টি সদস্যদের তাঁকে সমর্থন জানানোর সাহস কখন হবে?

এর এক সপ্তাহ পর, হয়তো পাঠকদের বিপুল সমর্থন ও সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করতে আরেকটা চিঠি লেখেন মিচার। বলেন পাঠকদের কেউ কেউ আমার লেখার কিছু অংশের যে ইচ্ছেকৃত ভুল ব্যাখ্যা করেছেন, তার জবাবে বলছি ওই চিঠির কোথাও আমি এমন কথা বলিনি যে আমেরিকান সরকার ৯/১১-এর হামলার ব্যাপারে না জানার ভান করেছে, বা ইচ্ছেকৃতভাবে হামলা ঘটতে দিয়েছে। বরং আমি বলতে চেয়েছি, কোনো সরকার এরকম জঘন্য ষড়যন্ত্র করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া আরও বলতে চেয়েছি, আমেরিকা ৯/১১-এর ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে আগেই নির্ধারণ করে রাখা পরিকল্পনা অনুযায়ী আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলা চালিয়েছে।

হাত গুটিয়ে বসে থাকার কারণ কি? ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা? নাকি আমেরিকার

BanglaBook.org

এয়ার সিকিউরিটি অপারেশনস সেদিনের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে "স্টুড ডাউন" ছিল?' এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। সাথে এক সাবেক প্রসিকিউটরের মন্তব্যও কোট করেন তিনি—'ঘটনার আগে ইওরোপের ১১ টা দেশের পক্ষ থেকে ওয়াশিংটনকে বারবার সতর্ক করা হয়েছিল। তারপরও দেশটির এই ধীর প্রতিক্রিয়া সত্যিই 'বিস্ময়কর।' কাজেই এরপর সিআইএ বা এফবিআই, কারও 'অযোগ্যতা' বা... ইত্যাদি ইত্যাদি।'

এরপরও মিচার যে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছেন, তাতে যদি ষড়যন্ত্রের থিয়োরির অভিযোগ না-ও থাকে, তবু তাঁর মূল অভিযোগ কিন্তু অপরিবর্তিতই থাকে। সেটা হলো সেদিনের ঘটনা নিয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠেছে, তার সন্তোষজনক জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে বুশ প্রশাসনের ব্যর্থতা। মাইকেল মিচারের এই চপেটাঘাতের পরই আরেকটা আর্টিকল ছাপা হয় ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রথম পাতায়। সেটার শিরোনাম ছিল কন্সপিরেসি থিয়োরিস অ্যাবাউট সেপ্টেম্বর ১১ গেট হিয়ারিং ইন জার্মানি। তাতে বলা হয়, যে সমস্ত বইয়ে এ ধরনের থিয়োরি আছে, সেগুলো ফ্রান্স, ইটালি ও স্পেন প্রভৃতি দেশে বেস্ট সেলার হচ্ছে। এবং এসব বই বিশেষ করে জার্মানির পাঠকরা সাগ্রহে কিনছে। জার্মানিতে কিছুদিন আগে চালানো এক মতামত জরিপে দেখা গেছে ২০ শতাংশ মানুষ মনে করে, 'আমেরিকান সরকারই ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল।' সেই আর্টিকলে মূলত আঁদ্রিয়াস ভন বিউলো-র একটা বেস্ট সেলিং বই নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিউলো দীর্ঘদিন যাবৎ সে দেশের পার্লামেন্ট মেম্বার ছিলেন। তার আগে ছিলেন পশ্চিম জার্মান প্রতিরক্ষা বিভাগের অন্যতম হাই অফিশিয়াল। আর্টিকলে বলা হয়, দেশের সবচেয়ে মর্যাদাশীল প্রকাশনা সংস্থা তাঁর বই ছাপে। 'কন্সপিরেসি থিয়োরিস অ্যাবাউট সেপ্টেম্বর ১১ গেট হিয়ারিং ইন জার্মানি' আর্টিকলটি লিখেছেন ইয়ান জনসন। তিনি বলেন জার্মানি বিশেষভাবে বিশ্বাস করে যে, এই ষড়যন্ত্রের পিছনে আমেরিকার হাত রয়েছে। আর্টিকলে বলা হয়, ৯/১১-এর হামলার পিছনে যে আমেরিকান প্রশাসনের উঁচু স্তরের 'দুষ্কর্ম' জড়িত, সে কথাটা জার্মানির এক সর্বজনশ্রদ্ধেয়, আস্থাভাজন পাবলিক ফিগারের মুখ থেকে বেরিয়েছে এবং লোকে তাঁর কথা বিশ্বাসও করেছে।

মাইকেল মিচারের প্রথম আর্টিকল প্রকাশ হওয়ার এক মাস পর যে সমস্ত সাংবাদিক তাঁকে আক্রমণ করে লিখেছিলেন, পল ডোনোভান নামে এক ফ্রিলান্স সাংবাদিক তাদের তীব্র সমালোচনা করে এক আর্টিকল লেখেন। তিনি অভিযোগে তোলেন, অনেক সাংবাদিক মনে হয় ক্ষমতার মোহে পথভ্রষ্ট হয়েছেন। 'যেখানে সাংবাদিকদের মূল ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল গোটা বিষয়টা তদন্ত করে মুখ খোলা, তা না করে তারা বরং 'অফিশিয়াল ট্রুথ' তোতাপাখির মত মুখস্থ বলে যাচ্ছেন।'

তিনি কড়া ভাষায় অভিযোগ করেন 'বুশ প্রশাসনের সেদিনকার আচরণ নিয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। তাদের কোনো পদক্ষেপই আমলে আনা হয়নি। অথচ ৯/১১-এর দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুশ তাঁর অস্ত্র এবং তেল ইন্ডাস্ট্রির দোসরদের মুনাফা লোটার সুযোগ ঠিকই করে দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট নিজেকে যুদ্ধকালীন নেতা হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এসবই ছিল আসল কাহিনি, যার ভেতরের আরও

BanglaBook.org

সব কথা এতদিনে সাংবাদিকদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করা উচিত ছিল। মিচারদের মতো সৎ সাহসওয়ালা মানুষদের বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করা নয়, যাদের বুকে বল আছে এবং অনেকের সন্দেহ যারা মুখে বা কলমের সাহায্যে প্রকাশ করার সাহস রাখেন।'

মিচার, জনসন ও ডোনোভানের লেখা যে সময় প্রকাশিত হতে থাকে, মাইকেল মুর-এর একটা বই সেই সময় বাজারে আসে। বইটির নাম 'ডিউড, হয়্যার ইজ মাই কান্ট্রি?' মানুষটিকে যে যা-ই ভাবুন, তাঁর বই কিন্তু প্রচুর পাঠক আকৃষ্ট করে থাকে (তাঁর আগের বই, নন-ফিকশন 'স্টুপিড হোয়াইট মেন' ২০০২-২০০৩ সালের বেস্ট সেলিং বই ছিল)।

মুরের এই নতুন বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম ছিল 'জর্জ অব অ্যারাবিয়া।' সেই অধ্যায়ে মুর মোট সাতটা প্রশ্ন করেন জর্জ বুশকে। তার একটা ছিল ৯/১১-এর দিন বুশ যে অদ্ভুত আচরণ করেছেন, সেই বিষয়ে। তবে বেশিরভাগই ছিল তাঁর এবং সউদি রাজ পরিবার ও বিন লাদেন পরিবার, তালেবানদের মধ্যকার সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে। ৯/১১-এর দিন ঠিক কি ঘটেছিল, সে প্রসঙ্গে মুরের নিজের ধারণা প্রকাশ পায় প্রেসিডেন্ট বুশকে করা তৃতীয় প্রশ্নে।

সেটা ছিল এরকম '১১ সেপ্টেম্বর ইউনাইটেড স্টেটস-এর ওপর কে আক্রমণ চালিয়েছিল? সেই লোক, আফগানিস্তানের এক গুহায় যার ডায়ালিসিস চলছে? নাকি আপনার বন্ধু, সউদি আরব?' হোয়াইট হাউজ কেন ৯/১১ স্বাধীন কমিশন গঠন করা নিয়ে গড়িমসি করছিল এবং কেন আমেরিকান প্রেস ও সাধারণ মানুষ সবকিছু মুখ বুজে মেনে নিয়েছিল, মুরের কঠোর ভাষার বিবৃতির মধ্যেই হয়তো পাওয়া যাবে সেসবের জবাব।

'বুশ কেন ভেতরের খবর বেরিয়ে আসা প্রতিহত করলেন না?' প্রশ্নের জবাবে মুর বলেন 'হয়তো এই কারণে যে ওইদিন সকালে প্রয়োজনের সময় কেন জেট ফাইটার স্ক্র্যাম্বল করল না ইত্যাদি কারণসহ জর্জ অ্যান্ড কোম্পানির আরও বহু কিছু লুকানোর ছিল। এবং হয়তো আমরা, জনসাধারণ, আন্তরিকভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইনি। ভয় ছিল, আসল সত্য আমাদেরকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পারে, যেখানে আমরা যেতে চাই না।'

মুরের শেষের এই ধারণা ডান র‍্যাদারের বিবৃতির সাথে অনেকটাই মিলে যায়। আমাদের সরকার বাইরের শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে দেশের বুকে এতবড় একটা দুষ্কর্ম ঘটিয়েছে—এই আশঙ্কা থেকেই সম্ভবত প্রেস তা নিয়ে জটিল কোনো প্রশ্ন তোলেনি। ব্রিটিশ পরিবেশ মন্ত্রিও এরকম অভিযোগই তুলেছিলেন। এই ষড়যন্ত্রে এফবিআই, সিআইএ, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এবং পেন্টাগন জড়িত, জানাজানি হলে কি তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে, সেটাই সবচেয়ে বেশি ভয়ের কারণ ছিল। এ জন্যই হয়তো বুদ্ধি করে 'লেট স্লিপিং ডগস লাই' বা ঘুমন্ত কুকুরকে ঘুমাতে দাও নীতি অনুসরণ করা হয়। সন্দেহ যদি সত্যি হতো, তাহলে কুকুরগুলো আর ঘুমিয়ে থাকত না।

আমাদের দেশে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে ৯/১১ কে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ষড়যন্ত্র ঘটেছে, সেসব ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয় থাকত। তাছাড়া ফাউল প্লে হয়েছে জেনেও মুখ বুজে থাকলে একটা লাভ ছিল—আমেরিকা ল্যান্ড অব ফ্রি অ্যান্ড দ্য হোম অব দ্য ব্রেভ,

BanglaBook.org

এই সুখ্যাতি হারানোর ভয় থাকে না। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের আমেরিকা গণতান্ত্রিক দেশ। তাই 'আসল সত্য আমাদেরকে যেখানে নিয়ে যেতে পারে, সেখানে আমরা যেতে চাই না।'

আমেরিকান প্রেসের কিছু সদস্য সেদিন প্রশ্নগুলো তুলতে চেয়েছিলেন বলে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩-এর কিছু লেখালেখিতে বলা হয়েছে। সেদিনকার *ফিলাডেলফিয়া ডেইলি নিউজ*-এ 'হোয়াই ডোন্ট উই হ্যাভ আনসার্স টু দিজ ৯/১১ কোয়েশ্চেনস?' নামে এক অন লাইন আর্টিকলে উইলিয়াম বাঞ্চ-এ প্রশ্ন করেন। এই আর্টিকলের কথাই এ বইয়ের পরিচিতিতে আমি বলেছি। তাতে প্রশ্ন করা হয়েছিল ৭৩০ দিন চলে যাওয়ার পরও কেন আমরা সেই দিনের ঘটনা সম্পর্কে এত অল্প জানি? কত কিছু তখনও অজানা ছিল, সে প্রসঙ্গে উইলিয়াম বাঞ্চ মোট ২০টা প্রশ্ন তোলেন। যার অর্ধেক প্রশ্ন নিয়ে এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে তিনি প্রশ্ন করেন কেন মূলধারার মিডিয়া এসব প্রশ্নের জবাব দাবি করল না?

আমেরিকায় উইলিয়াম বাঞ্চ-এর প্রশ্ন, এবং ইংল্যান্ডে মাইকেল মিচারের প্রশ্নে মনে হয় মিডিয়া সহজে পোষ মানতে রাজি নয়।

এ ক্যান্ডিডেট'স স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট অ্যান "ইনটারেস্টিং থিয়োরি": ২০০৩ সালের ১ ডিসেম্বর ন্যাশনাল পাবলিক রেডিওতে ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী, হাওয়ার্ড ডিনকে প্রশ্ন করা হয় 'আপনার কি মনে হয়? প্রেসিডেন্ট বুশ ১১ সেপ্টেম্বরের রিপোর্ট কেন চেপে রাখছেন?'

ডিন জবাব দেন 'আমি জানি না। এ নিয়ে অনেক থিয়োরি চালু আছে। তবে আমার শোনা থিয়োরিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মজার থিয়োরি হচ্ছে... সউদি আরব আগেই বুশকে সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপারে সতর্ক করেছিল। আসলে ভেতরে যে কি আছে কে জানে?'

এই ঘটনার পর ডিনকে সঠিক পথে আনার এবং অন্যদের এ ধরনের বেফাঁস মন্তব্য না করার বিষয়ে সতর্ক করার দায়িত্ব দেয়া হয় চার্লস ক্রাউটহামারকে। তিনি *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ 'ডিলিউশনাল ডিন' বা মতিভ্রম ঘটা ডিন নামে এক নিবন্ধে লেখেন, ডিনের বক্তব্য—'সবচেয়ে মজার থিয়োরি,' যে বুশ আগে থেকে জানতেন ১১ সেপ্টেম্বরের ব্যাপারে...' প্রমাণ করে নতুন এক সাইকিয়াট্রিক কন্ডিশন দ্বারা তাড়িত হয়ে কথাটা বলেছেন হাওয়ার্ড ডিন, যা এ দেশে বিদেশী।

ক্রাউটহামার এই অবস্থাকে বুশ ডিরেঞ্জমেন্ট সিনড্রোম (বিডিএস) বা বুশ বৈকল্যের লক্ষণ আখ্যা দিয়ে তাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে 'the acute onset of paranoia in otherwise normal people in reaction to the policies, the precidency—nay—the very existence of George W. Bush.'

যার বাংলা করলে দাঁড়ায় স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে ক্ষণিকের সন্দেহ বাতিক দেখা দেয়া—নীতির প্রতি, প্রেসিডেন্সির প্রতি, এমনকি জর্জ ডাব্লিউ বুশের অস্তিত্বের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠা।

BanglaBook.org

ক্রাউটহামার যেভাবে, যে ভাষায় হাওয়ার্ড ডিনকে আক্রমণ করেছেন, ৯/১১-এর ব্যাপারে বুশ প্রশাসনের ব্যাখ্যার সমালোচনা যারা করেছেন, তাদের সবাইকে মোটামুটি এভাবেই মোকাবেলা করা হয়েছে। সোজাভাবে তাদের প্রশ্নের বা অভিযোগের জবাব না দিয়ে এমন কৌশলে কাজটা সারা হয়েছে, যাতে মনে হবে সমালোচনাকারীরা সবাই কোনো কঠিন মানসিক রোগে আক্রান্ত। অফিশিয়াল ব্যাখ্যার বিপরীতে কোনো প্রশ্ন তোলা হলে; যেমন প্রশাসন হামলা সম্পর্কে আগে থেকেই সবকিছু জানত দাবি করলেই তা এক কথায় নাকচ করে দেয়া হতো। অন্যদের সতর্ক করে দেয়া হতো এ নিয়ে প্রশ্ন না তুলতে।

ক্রাউটহামার তাঁর আর্টিকলে যদিও বিষয়টির মধ্যে চটুল হাস্যরসের আবেশ দেয়ার চেষ্টা করেছেন কৌশলে, কিন্তু পরের অংশে বক্তব্যের ধারাল দিকটা ধরা পড়ে। ২০০২ সালের প্রাথমিক নির্বাচনের আগে রিপ্রেজেন্টেটিভ সিনথিয়া ম্যাককিনি দাবি করেছিলেন বুশ আগে থেকেই হামলার কথা জানতেন। তখন বিষয়টিকে সোজা কথায় 'পাগলামী' ধরে নিয়ে এমন কিছু আয়াজন করা হয়, যাতে সিনথিয়া বর্তমান থেকে হয়ে যান *সাবেক* রিপ্রেজেন্টেটিভ। ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেনশিয়াল ফ্রন্ট-রানার কিছুদিন পর একই অভিযোগ করেন, ৯/১১-এর হামলা সম্পর্কে সউদি আরব আগেই আমেরিকাকে সতর্ক করলেও প্রশাসন গা করেনি।

হাওয়ার্ড ডিনের মন্তব্যের কিছুদিন পর তার জবাব লিখতে বসে ক্রাউটহামার লক্ষ করেন, এর আগে জর্জিয়ার কংগ্রেসউওম্যান সিনথিয়া ম্যাককিনির মন্তব্যে মানুষের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, ডিনের মন্তব্যে তেমন কিছু হয়নি। আগেরবার প্রেস ও সাধারণ মানুষ সিনথিয়াকে মানসিক রোগী আখ্যা দিয়ে তিনি কংগ্রেসে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন বলে রায় দিয়েছিল। ক্রাউটহামার সেই পথেই এগোবার চেষ্টা করেন। দাবি করেন, হাওয়ার্ড ডিনও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। কাজেই তাঁরও পাবলিক অফিসে থাকার অধিকার নেই।

২০০২ সালে ম্যাককিনির পরাজয় থেকে ক্রাউটহামার ঠিক করেন, এই ফলাফলকে নিজেদের কাজে লাগাতে হবে। সবাইকে বোঝাতে হবে ৯/১১-এর হামলার কথা প্রেসিডেন্ট বুশ 'আগে থেকে জানতেন' ধরনের কথা বলার অর্থ হবে রাজনৈতিক আত্মহত্যা করা। সে ডেমোক্র্যাট হলেও একই পরিণতি হবে। অবশ্য পরে পরিস্থিতি দেখে বোঝা গেছে ম্যাককিনির পরাজয় সম্ভবত সেই কারণে হয়নি। এর কারণ হিসেবে তিনটা বিষয়কে বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

প্রথমত, ৯/১১ সম্পর্কে ম্যাককিনি যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, প্রেস সেটাকে পরের আফগান ও ইরাক যুদ্ধের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। ফলে বেশিরভাগ পাঠকের মনে ধারণা জন্মেছে বুশ আগে থেকেই হামলার কথা জানতেন বলেই কেবল অভিযোগ তোলেননি সিনথিয়া, তিনি বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে তা প্রতিহত করার চেষ্টাও নেননি। *অরল্যান্ডো সেন্টিনেল* পত্রিকার এক আর্টিকলে বলা হয়, ম্যাককিনি জোর দিয়ে দাবি করেছেন, 'জর্জ বুশ আগে থেকেই ৯/১১-এর হামলার কথা জানতেন, তারপরও তা ঠেকানোর ব্যবস্থা নেননি। কেন? কারণ পরবর্তী মিলিটারি বিল্ড-আপে তার বন্ধুদের পকেট ভারী হবে।

BanglaBook.org

নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর এক লেখায়ও একই মন্তব্য করা হয়। পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়, সতীর্থদের পকেট ভারি করার স্বার্থেই জর্জ বুশ হামলা ঠেকানোর কোনো ব্যবস্থা নেননি। গ্রেগ প্যালাস্ট ও অন্যরাও একই বিতর্ক হাজির করে দাবি করেছেন, ম্যাককিনি ও তাদের তোলা অভিযোগের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বুশ প্রশাসনকে বিভিন্ন দিক থেকে বারবার সতর্ক করা হয়েছিল। তারপরও যদি বলা হয় হামলার শঙ্কা ছিল না, তাহলে সেটাকে ইন্টেলিজেন্সের ব্যর্থতা বলতে হবে। এর কিছুটা দায়-দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের ঘাড়েও পড়ে। ম্যাককিনির অভিযোগের উদ্দেশ্য যা-ই হোক, একা তিনিই এ অভিযোগ তোলেননি। বুশ প্রশাসন আগে থেকে ৯/১১-এর হামলার কথা জানত কি জানত না, তা যাচাই করে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করার প্রয়োজনের ব্যাপারে তিনি কোনো পরামর্শ দেননি। কাজেই ওই কারণেই তিনি হেরেছেন, এ কথা বলার উপায় নেই।

দ্বিতীয় কারণ, নির্বাচনে হেরে যাওয়া মানেই যে বুশের বিরুদ্ধে মুখ খোলার কারণে তার 'রাজনৈতিক আত্মহত্যা' হয়েছে, এর পক্ষেও যুক্তি নেই। জর্জিয়ায় প্রাইমারি নির্বাচনের ভোটারদের 'ক্রস ওভার' করার সুযোগ ছিল। অর্থাৎ রেজিস্টার্ড রিপাবলিকানরা ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতেও ভোট দিতে পারেন। এখানেই হার হয়েছে ম্যাককিনির। প্রচুর রিপাবলিকান ভোটার 'ক্রস ওভার' করে এক নিগ্রো মহিলাকে ভোট দেয়ায় তিনি হেরে যান।

'ক্রস ওভার' করতে কেউ তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল কি না বা ভয়-ভীতি দেখানো হয়েছিল কি না, সে আলাদা বিতর্ক। তাছাড়া জর্জিয়ার কড়া ভোটার আইন অনুযায়ী জানার উপায় ছিল না ম্যাককিনি কত ভোটে হেরেছেন। এর প্রতিবাদে ম্যাককিনি যে দাবি তোলেন, আটলান্টার এক সাপ্তাহিক পত্রিকার সিনিয়র এডিটর, জন সাগ তা অনুমোদন করেন এই বলে রিপাবলিকানরা দলে দলে 'ক্রস ওভার' করে ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে ভোট দিয়েছে।

তৃতীয় কারণ, ১৭ এপ্রিল *আটলান্টা জার্নাল কন্সটিটিউশন* এক অন লাইন জরিপের আয়োজন করে। সেটার প্রশ্ন ছিল, কংগ্রেসউওম্যান ম্যাককিনি প্রেসিডেন্ট বুশের ৯/১১-এর সংশ্লিষ্টতা নিয়ে যে অভিযোগ তুলেছেন, আপনি কি তাতে দ্বিমত পোষণ করেন? এখানে বলে রাখা ভালো যে পত্রিকাটি এই জরিপ আহ্বান করেছিল ম্যাককিনির বিরোধীতার জন্য। তিনি যে ভুল মন্তব্য করেছেন, তাঁর প্রতি যে সাধারণ মানুষের সমর্থন নেই, জনমত জরিপে তার প্রতিফলন ঘটানোই ছিল সেটার উদ্দেশ্য।

কিন্তু জরিপের ফলাফল তাদের মনমতো হয়নি। ম্যাককিনির প্রতি একই রকম বিরূপ একটি ওয়েব সাইট NewsMax.Com সূত্রে জানা গেছে, ৫২ পার সেন্ট মানুষ সেই জরিপে 'হ্যাঁ' বাচক ভোট দেয়। ৪৬ পার সেন্ট জবাব দেয়: 'আমার ধারণা অফিশিয়ালরা জানত হামলা আসছে।' ২ পার সেন্ট বলেছে 'আমি নিশ্চিত নই। কংগ্রেসের তদন্ত করে দেখা উচিত।'

সেই আর্টিকলের নাম ছিল 'পোল শকার—৯/১১ ষড়যন্ত্র থিয়োরি প্রশ্নে অর্ধেক মানুষই ম্যাককিনিকে সমর্থন করে।'

BanglaBook.org

আর্টিকলটির লেখক সবশেষে যোগ করেন 'এই জনমত *আটলান্টা জার্নাল কন্সটিটিউশন*-এর ২৩ হাজার পাঠকের দুপুরের মধ্যে পাঠানো মতামতের ফল। পরে রহস্যজনকভাবে পত্রিকার ওয়েব সাইট থেকে জরিপ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।' এ জাতীয় জরিপ অবশ্যই বৈজ্ঞানিক নয়। তবে স্বীকার করতেই হবে এই বিশেষ জরিপ একটা মজার প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে—আমেরিকায় এরকম কিছু করা হলে তার ফলাফল কি দাঁড়াবে। তবে ভাগ্য ভালো যে ৯/১১-এর প্রশ্নে তেমন কোনো আয়োজন করা হয়নি।

সম্ভবত পুরনো একটা পরামর্শের কথা মনে রেখেই—যদি অপ্রীতিকর জবাব শুনতে না চাও, তাহলে প্রশ্ন কোরো না।

যদি এই প্রশ্নের ওপর ব্যাপক জনমত যাচাইয়ের আয়োজন করা হতো, তাহলে হয়তো দেখা যেত জার্মানদের মত বেশিরভাগ আমেরিকানও বুশ প্রশাসনের ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার সাথে জড়িত থাকার পক্ষেই মত দিত। বিষয়টা মজার হতো সন্দেহ নেই। পরখ করে দেখা যেতে পারত। সে যা হোক, এই তিনটি বিষয় প্রমাণ করে যে, কংগ্রেসউওম্যান সিনথিয়া ম্যাককিনির বিরুদ্ধে চার্লস ক্রাউটহামারের তোলা 'অভিযোগ' মোটেই সঠিক নয়। জর্জিয়ার 'ক্রস ওভার' ভোটের ফাঁদে না পড়লে তিনি হয়তো পরাজিত হতেন না।

তাছাড়া আটলান্টা অঞ্চলের অধিবাসীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ২০০২-এর ১৭ এপ্রিলের জরিপে যেভাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, অফিশিয়ালরা জানত হামলা আসছে,'—তাতে বোঝা যায় ক্রাউটহামার আরও একটা বড় ভুল করে বসেছেন। সেটা হলো, 'বুশ প্রশাসন হামলা সম্পর্কে আগে থেকে জানত' বলার জন্য পরাজিত হননি কংগ্রেসউওম্যান, সিনথিয়া ম্যাককিনি। অথবা এর ফলে তাঁর রাজনৈতিক আত্মহত্যাও করা হয়নি।

তবে এ ক্ষেত্রে যেহেতু একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীও 'প্রশাসন আগে থেকে জানত' বলে অভিযোগ তুলেছেন, এবং যাঁর প্রশ্নটিকে একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, সেহেতু সত্য উদ্ধারের জন্য এর একটা তদন্ত অবশ্যই হওয়া উচিত ছিল।

এলিন মারিয়ানির অভিযোগ : অন্য এক ঘটনায় প্রশাসনের জড়িত থাকার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। ২০০৩-এর ২৬ নভেম্বর ফিলাডেলফিয়ায় অ্যাটর্নি ফিলিপ জে. বার্গ এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে অভিযোগ করেন, তাঁর মক্কেল এলিন মারিনি ওরফে প্লেইনটিফের স্বামী, লুই নিল মারিনি পাইলট ছিলেন। ৯/১১-এর দিন তাঁর ইউনাইটেড এয়ারলাইনস-এর ফ্লাইট ১৭৫ বোস্টন থেকে সকাল ৮:১৪ মিনিটের সময় আকাশে ওঠে এবং ৯:০৩ মিনিটে সেটা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দক্ষিণ টাওয়ারে ভেঙে পড়ে।

এলিন মারিনি ফেডারাল কোর্টে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং তাঁর কেবিনেটের কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন রিকো (RICO = Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) আইনের অধীনে। অভিযোগে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ (GWB) ও রাষ্ট্রের অন্যান্য নির্বাহী কর্মকর্তা যেমন, অ্যাটর্নি

BanglaBook.org

জেনারেল জন অ্যাশক্রফট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনি, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর কন্ডোলিৎসা রাইস, ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফেল্ড এবং সিআইএ ডিরেক্টর জর্জ টেনেট—এরা সবাই তার স্বামী, লুই নিল মারিনিকে আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এবং ঘটনার পর তারা 'এই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিচারে বাধা' সৃষ্টি করেছেন।

অভিযোগ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ৯/১১-এর সেই প্রতিরোধযোগ্য সন্ত্রাসী হামলা থেকে শুধু তার স্বামীকেই নয়, আরও যে সমস্ত নিরীহ আমেরিকান সেদিন করুণ মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের সবাইকে সুরক্ষা করার দায়িত্ব ছিল প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের। কারণ সে হামলা সম্পর্কে তার প্রশাসন আগেই জানত। কিন্তু হামলা প্রতিহত করার ব্যবস্থা না নেয়ায় তার স্বামীসহ কয়েক হাজার নিরীহ মানুষ মারা যায়। অভিযুক্ত জর্জ বুশ সম্ভাব্য ঘটনা সম্পর্কে আগে থেকে জানতেন না বলে যা দাবি করছেন, তা সত্যি নয় এবং তিনি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সৎ ছিলেন না।

প্লেইনটিফ কোর্টের কাছে দাবি জানান, কোর্ট যেন জর্জ বুশকে ৯/১১-এর দিন পাইলট, লুই নিল মারিনিকে কেন মরতে হলো, তা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে বাধ্য করে। এই মামলার প্রমাণাদি উদঘাটন সাপেক্ষে উপস্থাপন করা হবে... এই বিচার একটা অভ্রান্ত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে, অভিযুক্ত, জর্জ ডাব্লিউ বুশ ৯/১১ প্রতিহত করায় তৎপর হতে ব্যর্থ হয়েছেন, কেননা তিনি জানতেন এতে দেশ আন্তর্জাতিক ওয়ার অন টেরর-এ জড়িয়ে পড়তে। যার ফলে মামলার বাদিগণ আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে লাভবান হবেন।

প্লেইনটিফ বিশ্বাস করেন, অভিযুক্ত জিডাব্লিউবি (জর্জ বুশ) এবং তাঁর সতীর্থরা এই সন্ত্রাসী হামলা ইচ্ছে করেই সফল হতে দেন। কারণ এতে মানুষের মনে যে ক্রোধ আর ক্ষোভের সঞ্চার হবে, তাকে পুঁজি করে জাতি এবং আমাদের সামরিক বাহিনীর পুরুষ ও নারী সদস্যরা বাধ্য হবে একটা আন্তর্জাতিক ওয়ার অন টেরর-এ জড়িয়ে পড়তে। ব্যক্তিগত মুনাফা ও এজেন্ডা পূরণে... স্পেশাল এজেন্ট রবার্ট রাইট ২০০১ সালের ৯ জুন তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে একটা মেমো দিয়েছিলেন অভিযুক্ত ডিওজে/এফবিআইকে, যাতে প্লেন হাইজ্যাক করে বাইরের সন্ত্রাসীদের আমেরিকায় আক্রমণ চালানো সম্পর্কে হুঁশিয়ারি ছিল। তার দুই মাস পর, ২০০১-এর ৬ আগস্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর কন্ডোলিৎসা রাইস অভিযুক্ত জিডাব্লিউবি-এর টেক্সাস র‍্যাঞ্চে একটা লিখিত ব্রিফ পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেই ব্রিফে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল, ওবিএল (ওসামা বিন লাদেন) প্লেন হাইজ্যাকের চেষ্টা করতে পারে। প্লেইনটিফের 'জানার অধিকার আছে,' কেন অভিযুক্ত জিডাব্লিউবিকে সরবরাহ করা এইসব রিপোর্টের ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। কেন আমাদের দেশের ওপর পার্ল হারবারের পর এবারই প্রথম চালিত এত ভয়াবহ এক সন্ত্রাসী হামলা প্রতিহত করা হলো না। পার্ল হারবারের হামলা আমাদেরকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল, আর এই হামলা বাধ্য করল আরেক ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে যে যুদ্ধ কোনোদিন শেষ হবে কি না সন্দেহ। এতকিছুর পরও 'গোপনীয়তার' কারণ দেখিয়ে অভিযুক্ত জিডাব্লিউবি-এর ৯/১১ কমিশনকে সহযোগিতা করতে না চাওয়ার ফলে প্লেইনটিফ এই মামলা রিকো

BanglaBook.org

অ্যাক্ট সিভিল অ্যাকশনের অধীনে রুজু করেছেন। তিনি এই মামলায় ন্যায়বিচার ও দেশবাসীর সামনে 'সত্য' প্রকাশ করার দাবি জানান, জাতি যাতে জানতে পারে অভিযুক্তদের এই চরম বিশ্বাসঘাতকতায় ৯/১১-এর সময় ও পরে উদয় হওয়া নানান অপরাধকর্ম এ দেশের প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের মনের ওপর কি ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

অ্যাটর্নি ফিলিপ জে. বার্গ এই অভিযোগের অনুলিপি আর এলিন মারিনির লেখা একটা খোলা চিঠি প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে পৌঁছে দেন। চিঠিতে মারিনি লেখেন ৯/১১ নিয়ে যদি আপনার গোপন করার মতো কিছু না থাকে, যদি আপনি ৯/১১ প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ না হয়ে থাকেন, তাহলে ইনভেস্টিগেশন কমিশন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ ও ডকুমেন্ট ইত্যাদি আবিষ্কার করেছে, সেগুলো সংগ্রহে বাধা দেয়া বন্ধ করুন। আপনি 'জাতীয় নিরাপত্তার' অজুহাত দেখিয়ে কমিশনকে সেসব সংগ্রহ করতে বাধা দিচ্ছেন... কিন্তু আসলে আপনি নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা আর নিরাপত্তা নিয়েই বেশি চিন্তিত...

এই মামলা, হাওয়ার্ড ডিন ও চার্লস ক্রাউটহামার বিতর্কসহ সাম্প্রতিক আরও কিছু প্রকাশনা থেকে বোঝা যায়, এসব প্রশ্ন দিন দিন জোরালো থেকে জোরালোতর হবে, আরও তীব্র হবে। অফিশিয়াল ব্যাখ্যা যে মিথ্যা ছিল, সাধারণ মানুষের মধ্যে সে বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে বাড়বে। এর একমাত্র সমাধান হলো, ৯/১১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন তদন্তে নেমে এরমধ্যে যে সমস্ত বিতর্কিত তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছে, তার আলোকে দেশের মানুষের সামনে বিশ্বাসযোগ্যভাবে একটা তদন্ত রিপোর্ট তুলে ধরা। সাধারণ মানুষকে জানানো, সেদিন আসলে কি ঘটেছিল।

৯/১১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন: তদন্ত শুরু করার পর থেকে কমিশন এ পর্যন্ত নানান সমস্যায় পড়া সত্ত্বেও অনেকে; বিশেষ করে ফ্যামিলি স্টিয়ারিং কমিটির নেতাদের মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছে যে, সেদিনকার আসল ঘটনা সম্পর্কে ওঠা কিছু অজানা প্রশ্নের জবাব অন্তত এ থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু পরের ঘটনাবলীতে সে আশার অনেকটাই বিলীন হয়ে গেছে।

কারণ প্রথমত, হোয়াইট হাউজের সাথে কমিশনের সমন জারি না করার ভিত্তিতে মতৈক্য হয় বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তার ভিত্তিতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন নিজের নাম পাল্টে ৯/১১ কভার আপ কমিশন করার প্রশ্নে সায় দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, কমিশন তার সবচেয়ে স্পষ্টবাদী সদস্য, ম্যাক্স ক্লিল্যান্ডকে হারিয়েছে। তদন্ত শুরু হওয়ার এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে কমিশন থেকে পদত্যাগ করে ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যাংকের বোর্ডে যোগ দেন তিনি।

তৃতীয়ত, *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী 'কনফ্লিক্টস অব ইন্টারেস্ট' বা স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কমিশন তার দুজন নির্বাহী পরিচালক ফিলিপ জেলিকো এবং কমিশনার জেমি গোরলিক (ক্লিনটন প্রশাসনের জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র সদস্য)-কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। প্রশ্ন ওঠার বিশেষ কারণ হলো, কেবল এই

BanglaBook.org

দুই কমিশন অফিশিয়ালকে হোয়াইট হাউজের হাইলি ক্লাসিফায়েড বা অত্যন্ত গোপনীয় দলিলপত্র দেখতে দেয়া হয়। আর কাউকে সে সুযোগ দেয়া হয় না। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কেন?

ফিলিপ জেলিকোকে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিয়ে ক্রিস্টেন ব্রেটওয়েইজার বলেন, 'তাঁর অনেক বড় স্বার্থের বিষয় আছে এর মধ্যে। এ বিষয়ে আমরা প্রথম দিন থেকেই অবহিত ছিলাম।' মহিলা এ প্রশ্নে শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন 'কমিশনের রিপোর্ট হোয়াইট ওয়াশ হয়ে জনসমক্ষে আসবে।'

এরপর চতুর্থ আঘাত হয়ে দেখা দেয়, সেটা হলো কিছু গুরুতর প্রশ্নের জবাব উদঘাটনের স্বার্থে কমিশনকে আরও কিছু সময় দেয়ার আবেদন নাকচ হয়ে যাওয়া। আমরা প্রথম থেকেই লক্ষ করেছি কমিশনের সদস্যরা ভেবে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাদের প্রতি পদে হোয়াইট হাউজ যেভাবে বাধা সৃষ্টি করছে, তাতে আসল কাজ কতদূর এগোবে, তাই নিয়ে। পরে ফ্যামিলি স্টিয়ারিং কমিটির তদন্তের জন্য কয়েক মাস সময় চাওয়া হয়।

কিন্তু সে ক্ষেত্রেও নেতিবাচক জবাব আসে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'কমিশনকে ডেডলাইনের মধ্যেই কাজ শেষ করতে হবে। কেননা প্রশাসন তাদেরকে এ কাজে "অভূতপূর্ব" সহযোগিতা করছে।'

প্রশাসনের এই জবাবের প্রেক্ষিতে জো কোনাসন 'জর্জ বুশ ৯/১১ কমিশনের কাছে কি লুকাতে চান?' শিরোনামে এক রিপোর্টে লেখেন। তাতে তিনি মন্তব্য করেন, 'মিস্টার বুশ এই কমিশন ও তার কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সাথে মোকাবেলা করেছেন। ক্রমাগতভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন কমিশনকে খাটো করতে, তাদের কাজে বাধা দিতে এবং তাঁর প্রেসিডেন্সির আওতাধীন ৯/১১ সম্পর্কিত বেশিরভাগ কাজের তদন্ত সেন্সর করতে। মিস্টার বুশ চান যে বিপর্যয়ের কারণে জাতির ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেয়া হয়েছে, তাঁর প্রেসিডেন্সির নতুন আকার পেয়েছে, কমিশনের বিচারের রায়ে তা যাতে কোনোভাবেই প্রভাবিত হতে না পারে।

যে সময় *দ্য নিউ পার্ল হারবার* ছাপার প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে, তখনও পর্যন্ত ৯/১১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশনের কাজের তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেইনি, ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফেল্ড, প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজর কন্ডোলিৎসা রাইস অথবা প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য কারও নামেই কমিশন তলবনামা জারি করেনি। হাজির হয়ে শপথ নিয়ে সাক্ষী দেয়ার জন্য ডাকেনি। আর কারও জন্য না হোক, অন্তত ফ্যামিলি স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের জন্য এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা।

ওয়াশিংটন পোস্ট-এর এক রিপোর্টে জানা গেছে, ৯/১১ কমিশন আপ কমিশন ডেডলাইন নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করেনি বলে তাদের অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাদের দাবি, কমিশনের প্যানেল তেমন জোর দিয়ে সময় বাড়ানোর জন্য কিছু করেনি। বুশ প্রশাসনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ইত্যাদিও সংগ্রহ করতে পারেনি।

ক্ষুব্ধ ক্রিস্টেন ব্রেটওয়েইজার বলেছেন 'আমরা জবাব পেয়ে গিয়েছি... সেদিনের হতাহতদের পরিবারগুলোর মুখে এই আচরণ প্রচণ্ড এক চড়ের মতো লেগেছে। নিজেদের

BanglaBook.org

দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের মাধ্যমে মৃতদের আত্মাকেও তারা অসম্মান করছে।' তাঁর বক্তব্যের উপসংহারে প্রশাসনের 'দুষ্কর্মের' ইঙ্গিতটি একেবারেই পরিষ্কার। এরপরও যদি ৯/১১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশনের আচরণ ও কৌশলের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন না ঘটানো হয়, তাহলে সত্য উদঘাটনে নতুন করে তদন্ত চালানোর প্রয়োজন পড়বে।

৯/১১ সত্যবাদী প্রার্থী

এক প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর কথায় ৯/১১-এর ঘটনার নতুন করে পূর্ণ তদন্তের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই প্রার্থী একজন রিপাবলিকান। নাম, জন বুকানন। এক জ্বালাময়ী বক্তৃতায় তিনি বলেন 'আমি এখানে যা বলব, তাকে আপনারা একমাত্র ইসুওয়ালা প্রার্থীর আবোল-তাবোল কথা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। সঙ্কীর্ণ চিন্তায় কথাটা একেবারে বেঠিকও হবে না। কিন্তু যদি আপনারা বিচার করেন ৯/১১ আমাদেরকে আর্থিকভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে, অনন্তকালব্যাপী যুদ্ধ আর সাংবিধানিক সঙ্কটের মাঝে ফেলে দিয়ে গেছে, তাহলে আমার ইসুই কিন্তু এই সময়ের শ্রেষ্ঠ ইসু। আমরা সবাই ৯/১১-এর ঘটনা নিয়ে মিথ্যে কথা বলেছি।' এ প্রসঙ্গে বুকানন আমার এই বইয়ের উল্লেখযোগ্য অনেক তত্ত্ব-উপাত্ত তুলে ধরেন শ্রোতাদের সামনে।

ভাষণ শেষ করার আগে জন বুকানন সবার প্রতি অনুরোধ করেন 'এই যুদ্ধের এক নায়ক,' এলিন মারিনিকে সমর্থন জানাতে, এবং নাফিজ আহমেদের *দ্য ওয়ার অন ফ্রিডম* ও পল থম্পসনের *৯/১১ টাইমলাইন* পড়তে।

জন বুকানন ৯/১১ সম্পর্কে প্রশাসনের মিথ্যা ও পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের বিপরীতে সময়মতো উপযুক্ত প্রশ্ন না তোলার এবং দেশের মানুষকে 'আরও প্রশ্নের উত্তর জানা বাকি রয়ে গেছে' ধরনের কিছু না বলার জন্য মেইনলাইন প্রেসের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এরকম কঠোর সমালোচনায় অনভ্যস্ত মেইনলাইন প্রেস হয়তো জন বুকাননকে এড়িয়ে চলবে। কিন্তু মিলিয়ন মিলিয়ন আমেরিকান তাঁকে মনে রাখবে। তাঁকে চেনা-জানার চেষ্টা করবে। কারণ তিনি তাদের মনের কথাটিই সোচ্চার কণ্ঠে জাহির করেছেন।

হয়তো তাদের সম্মিলিত চাপে একদিন আবার গতি পাবে এই তদন্ত। ৯/১১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশনের নতুন, নিরপেক্ষ এবং পূর্ণ তদন্ত শেষে একদিন বুশ প্রশাসনের অফিশিয়াল দুষ্কর্মের প্রমাণ বেরিয়ে আসবে। ইনডিয়ায় যেমন হয়েছে। বাবরি মসজিদ ভাঙা নিয়ে লিবারহান কমিশনের রিপোর্ট দীর্ঘ সতেরো বছরের তদন্তের পর অবশেষে আলোর মুখ দেখেছে। বিচারের ফলাফল যা-ই হোক, মেঘের আড়াল থেকে আসল সত্য অন্তত বেরিয়ে এসেছে অমোঘ নিয়তির মত।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org